সপ্তর্ষি

"বনফুল"

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫২

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—২৫. ২. ৪৬

ভূমিকা

এই গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র কাল্পনিক, জীবন্ত রূপ দেবার জন্য সমসাময়িক ইতিহাসের পরিবেশে সন্নিবিষ্ট করেছি। এদের মুখ দিয়ে যে সব নৈতিক বা রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা-ও এদের নিজের, আমার নয়। সমসাময়িক ইতিহাস প্রমাণ্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সে সবের যাথার্থ্য যাচাই করবার যোগ্যতা আমার নেই, প্রয়োজনও বোধ করি নি। কারও যদি কোনও বিষয়ে সন্দেহ হয়, আমাকে জানালে আমি গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের নাম তাঁকে জানিয়ে দেব।

শ্রীযুক্ত হংস-শুভ্র মুখোপাধ্যায় চিঠিখানা পেয়ে একটু বিরক্তই হয়েছিলেন। বিরক্ত হ'লে তিনি গম্ভীর হবার চেষ্টা করেন। বিরক্তি প্রকাশ করাটা, তাঁর মতে, হার-স্বীকার করারই নামান্তর। কার সাধ্য তাঁকে বিচলিত করতে পারে? তাঁকে, যাঁকে মহাকালের নিষ্ঠুর প্রহার পর্য্যন্ত একচুল বিচলিত করতে পারে নি, তিন-তিনজন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু যিনি গম্ভীরভাবে সহ্য করেছেন—এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে, এত বড় পরিবারের এত বিভিন্ন রকম বিপর্য্যয় যিনি অবিচলিত হয়ে সহ্য করছেন, ধৈর্য্য হারান নি ক্ষণকালের জন্য, সারা জীবনের আদর্শ চোখের সামনে ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েও যাঁকে কাবু করতে পারে নি— হঠাৎ কুন্দর মুখখানা মনে পড়ল তাঁর, গড়গড়ার ডাক হয়ে গেল, গম্ভীরভাবে হাঁটু দোলাতে লাগলেন তিনি।

সত্যি, বেশ বড় পরিবার তাঁর—এ অঞ্চলে শুভ্র-পরিবার নামে খ্যাত। প্রপিতামহ যোগীশ্বর মুখোপাধ্যায় শুদ্ধ শান্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন সেইজন্যই বোধ হয় একমাত্র পুত্রের নাম রেখেছিলেন শিব-শুভ্র। তারপর থেকেই এ বংশে সকলের নামের সঙ্গে 'শুভ্র' শব্দটি যুক্ত হয়ে আসছে, এমন কি মেয়েদের নামের সঙ্গেও আ-কার যোগ দিয়ে—কুন্দ-শুভ্রা, ইন্দু-শুভ্রা, শুক্তি-শুভ্রা, জ্যোৎস্না-শুভ্রা ইত্যাদি।

শিব-শুভ্র ভদ্রলোক ছিলেন যদিও, কিন্তু ঠিক শিব-প্রকৃতির ছিলেন না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি মৃত্যুকালে নগদ বিশ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি তাঁর দুই পুত্র—হংস-শুভ্র ও সোম-শুভ্রকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক

যোগীশ্বরের পুত্র কি উপায়ে এত বড় সম্পত্তি হস্তগত করলেন তার ইতিহাস এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর, এইটুকু শুধু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, ইংরেজ-শাসনের প্রথম আমলে যেসব কৃতী পুরুষ এ দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ইংরেজ-শাসনের যোগ স্থাপনের মধ্যবর্ত্তিতা ক'রে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র, হংস এবং সোম, সে-যুগের লক্ষ্মী-সরস্বতীর সে-যুগীয় প্রভাব পেয়েছিলেন পূর্ণমাত্রায়। সাহেব মাস্টারের কাছে সাহেবী কেতায় কেবল ইংরেজী লেখাপড়াই শেখেন নি, পণ্ডিতের কাছে শিখেছিলেন সংস্কৃত, ওস্তাদের কাছে শিখেছিলেন গান-বাজনা, পালোয়ানের কাছে শিখেছিলেন কুস্তি, গুরুজনদের কাছে শিখেছিলেন সহবৎ এবং সে-যুগের 'ইয়ংবেঙ্গল'দের সাহচর্য্যে শিখেছিলেন সে-যুগের রাজনীতি-চর্চ্চা। এই শেষোক্ত ব্যাপারটা হংস-শুভ্রকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তখনকার কৃষ্ণদাস পাল, আনন্দমোহন বসু, সুরেন বাঁড়ুজ্যেরা যে রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রভাব হংস-শুভ্র এড়াতে পারেন নি। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর মন এসব ব্যাপারে সাড়া দিত। আই. সি. এস. সুরেন বাঁড়ুজ্যের যখন চাকরি গেল (আইনত যদিও সেটা তাঁর নিজের ক্রটির জন্যই), তখন নিয়ে শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে যে বিক্ষোভ মথিত হয়ে উঠেছিল, কিশোর হংস-শুভ্রের মনেও ছাপ পড়েছিল তার। সেই অল্প বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন যে, যে অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের চাকরি গেল সে অপরাধ হামেশাই সকলে থাকে, তিনি শাস্তি পেলেন স্বাধীনচেতা বাঙালী ব'লে। কিন্তু এ নিয়ে আ সঙ্গত আন্দোলন ক'রেও যখন কোন ফল হ'ল না, তখন হংস-শুভ্রের মনে হয়েছিল যে, দোষটা বোধ হয় সুরেনবাবুরই বেশি, কারণ বিলেতের সাহেবরাও যখন সব শুনে এর কোন প্রতিকার করলেন না, এমন কি ব্যারিস্টারি পড়বারও অনুমতি দিলেন না তাঁকে, তখন অপরাধটা লঘু নয় নিশ্চয়ই। সাহেবদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কল্পনাই কেউ করত না তখন। পরে এই সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে এসে—(তাঁর কাছে ফ্রী চার্চ কলেজে

প'ড়েইছিলেন তিনি)—তাঁর বাগ্মিতা-বিদ্যাবত্তা-স্বদেশপ্রাণতার যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তা আজও যদিও তাঁর জীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে, কিন্তু একজন খাঁটি সাহেবের তুলনায় যে তিনি নিম্নতর স্তরের জীব এ বোধের জন্য লজ্জিত হন নি তিনি তখন, কারণ দেবতার সঙ্গে মানুষের তুলনায় দেবতাকে উচ্চতর স্থান দিতে কারও লজ্জা হয় না। সদ্য-আগত পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে সকলেই মুগ্ধ তখন। তখন রামগোপাল, রাধানাথ, রসিকমোহনরাই সকলের আদর্শ। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মত লোকেরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগানে পঞ্চমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রদীপ্ত প্রতিভায় জ্বলছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উদীয়মান। রাধাকান্ত দেব, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের দল শিক্ষিত-সমাজে উপহাসেরই খোরাক যোগাতেন তখন। স্বয়ং সুরেনবাবুই মনে-প্রাণে সাহেব ছিলেন, তাঁর বন্ধু রমেশ দত্ত, আনন্দমোহন বসুও। তখনকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সমাজের উন্মুখ মনোবৃত্তিকে রূপ দেবার জন্যে সুরেন্দ্রনাথ যে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত করেছিলেন, তাতেও যেসব বক্তৃতা হ'ত তা ইংরেজী কেতায় ইংরেজী ভাষায়। তখনকার দেশ-প্রেমের নিদর্শন ছিলেন রাণা প্রতাপ নয়, ম্যাৎসিনি। তাঁর বিপ্লববাদকে গ্রহণ করবার কল্পনাও কেউ করত না অবশ্য—তাঁর স্বদেশ-প্রেম, তাঁর আত্মত্যাগ নিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তখন সবাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন ব'লেই তাঁরা যে প্রত্যেকে ইংরেজের দাসখৎ-লেখা গোলাম ছিলেন, ঠিক তা নয়। বস্তুত একটা জাগরণের সাড়াই জেগেছিল তখন দেশে—প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের আতপ্ত আবহাওয়ায় একটা অস্পষ্ট অধীরতাই যেন অনুভব করছিল সকলে এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশও ক'রে ফেলছিল তা। সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলের উত্তেজনাটা আজও ভোলেন নি হংস-শুভ্র। মারকুইস্ অব স্যালিস্‌বেরি আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার বয়স রাইশ থেকে কমিয়ে উনিশ ক'রে দিয়েছিলেন কেবল ভারতীয়দের জন্য। তখনকার কালে প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনই ছিল—রাজসরকারে

অধিক-সংখ্যক চাকরি পাবার জন্যে আবেদন-নিবেদন করা। স্যালিস্‌বেরির এই ব্যবহারে দেশের লোক ক্ষেপে উঠলেন যেন। সিভিল-সার্ভিস-বিতাড়িত সুরেন্দ্রনাথ এই সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলকে দেশব্যাপী আন্দোলন ক'রে তুললেন। কংগ্রেস হবার বহুপূর্ব্বে এই আন্দোলনেই সর্ব্বপ্রথম নিখিল-ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায়। সেই সূত্রে হংস-শুভ্র প্রথমে নাম শুনেছিলেন পাঞ্জাবের দয়াল সিং মাঝিটিয়ার, পণ্ডিত রামনারায়ণের, ডাক্তার সুরযবলের, উকিল কালীপ্রসন্ন রায়ের। সেদিনকার সার্ সৈয়দ আহমদ, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, রাজা আমীর হোসেন, বাবু ঐশ্বর্য্যনারায়ণ, বাবু হরিশ্চন্দ্র, রামকালী চৌধুরী, বিশ্বনারায়ণ মাণ্ডলিক, কাশীনাথ তেলাং, ফিরোজ শা মেটা, রাণাডেকে এখনও দেশের লোক মনে ক'রে রেখেছে কি না হংস-শুভ্র জানেন না, কিন্তু তখন এঁরাই ছিলেন দেশের অগ্রণী এবং এঁরা সবাই সেদিন বাঙালী সুরেন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে যে ভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, তা হংস-শুভ্রের অন্তরে আজও স্পন্দন তোলে। আজকালকার বাঙালী-বেহারী হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মত কুৎসিত জিনিস তখনকার দিনে ছিল না—সার্ সৈয়দ আহমদ যদিও মুসলমান-সম্প্রদায়েরই মুখপাত্র ছিলেন এবং বিশেষ ক'রে মুসলমানদেরই উন্নতির জন্যে চেষ্টা করতেন, তবু তিনি সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলে সই করেছিলেন। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই প্রতিবাদ করেছিল ভারতীয়দের প্রতি এই অবিচারের। এই সিভিল সার্ভিস আন্দোলন ভারতেই নিবদ্ধ থাকে নি কেবল। লালমোহন ঘোষ এ নিয়ে বিলেত পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। টাকা দিয়েছিলেন মহারাণী স্বর্ণময়ী। বৃটিশ গভর্মেণ্ট দেশের দাবি মেনে নিয়ে উনিশ বছর কেটে যখন বাইশ বছর করলেন, তখন ইংরেজদের ন্যায়পরতার ওপর বিশ্বাস আরও অগাধ হয়ে উঠল সকলের। ভারতবর্ষের সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষিত-সমাজের প্রথম বাঙ্ময় বিদ্রোহ যে কর্ত্তৃপক্ষের ভাল লাগে নি, তার প্রমাণ মিলল অবশ্য কিছুদিন পরেই। স্যালিস্‌বেরি কিছুদিন পরেই পাঠালেন লর্ড লিটনকে,

দুটি সংঘাতিক 'অ্যাক্ট' তাঁর হাতে দিয়ে—ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এবং আর্ম্‌স অ্যাক্ট। 'সাধারণী' 'সমাজ দর্পণ' 'সোমপ্রকাশ' 'হিন্দু হিতৈষিণী' উঠে গেল। পুলিস সবার হাত থেকে হাতিয়ার কেড়ে নিলে। হংস-শুভ্রের বাড়িতে যতগুলো বন্দুক, সড়কি, বল্লম ছিল সমস্ত বাজেয়াপ্ত হ'ল। দেশী ইংরেজী কাগজগুলোতে কড়া-মিঠে মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। হতভম্ব হয়ে পড়ল যেন সবাই। কিন্তু দেশের শিক্ষিত-সমাজের মনে ইংরেজ-ভক্তি তখনও অটুট। হংস-শুভ্রেরও মনে হ'ল যে, যে-ইংরেজ সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে ওয়ারেন হেস্টিংসকে প্রকাশ্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করে নি, তারা নিশ্চয়ই অকারণে ভারতবাসীকে এমন নিরস্ত্র ও নির্ব্বাক ক'রে রাখবে না। নিশ্চয়ই ভেতরে কোন একটা কারণ আছে, হয়তো আফগান যুদ্ধ, হয়তো দাক্ষিণাত্যের কৃষক-বিদ্রোহ বা ওই রকম একটা কিছু। ওপরে 'মুভ' করলেই যথাকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। 'মুভ' করাও হ'ল। এই সময়ে একটা বিষয়ে তাঁর খটকা লেগেছিল, দেশের জমিদার-সম্প্রদায় এ বিষয়ে কেউ টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলেন না। জমিদারদের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন একেবারে চুপ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গভর্মেন্টের পক্ষে ভোট দিয়ে এলেন। কাউন্সিলে তখন জনসাধারণের ভোট নিয়ে সভ্য নির্ব্বাচিত হ'ত না, গভর্মেণ্ট যাঁকে মনোনীত করতেন তিনিই সভ্য হতেন। এ রকম সভ্য যে কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধিতা করবেন, এ আশা দুরাশা হ'লেও, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ব্যবহারে দুঃখিত হয়েছিলেন তিনি। বিরোধিতা করেছিলেন রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জি। হংস-শুভ্রের কাছে ওই খ্রীষ্টান ভদ্রলোকটি আজও পূজ্য হয়ে আছেন। তাঁর মত ইংরেজী-নবিস অথচ ভারতীয়, তাঁর মত স্পষ্টবক্তা অথচ মিষ্টভাষী, তাঁর মত বিধর্ম্মী অথচ ধর্ম্মপ্রাণ লোক আজকাল বড় একটা চোখে পড়ে না হংস-শুভ্রের। তখন যদিও পলিটিকাল সভা রাজদ্রোহসূচক ব'লে গণ্য হ'ত না, তবু ইনি এবং রেভারেণ্ড ম্যাকৃডোনাল্ড থাকাতে সবাই যেন নির্ভয় হয়েছিল—তা ছাড়া এই দুজন গণ্যমান্য খ্রীষ্টান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবাদ-সভায় যোগ

দেওয়াতে প্রতিবাদের মূল্যও ঢের বেড়ে গিয়েছিল। টাউন হলে যে সভা হয়েছিল, তার ছবিটা এখনও মনে পড়ে হংস-শুভ্রের। তিলধারণের স্থান ছিল না। তখন সবাই, এমন কি রাজকর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন। সি-আই-ডি ব'লে কিছু ছিল না। সেদিনকার সভার ভিড়ে আর উত্তেজনায় হংস-শুভ্র সোনার ঘড়ি ঘড়ির-চেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে চিঠি লেখা হয়েছিল গ্ল্যাড্‌স্টোনকে। চিঠি মুসাবিদা করেছিলেন সুরেন ব্যানার্জি, সংশোধন করেছিলেন কে. এম. ব্যানার্জি। স্বয়ং গ্ল্যাড্‌স্টোনকে চিঠি লিখতে পারাটাই মস্ত বড় একটা পৌরুষ ব'লে মনে হয়েছিল সেদিন এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে সমস্ত দেশে যে উত্তেজনা জেগেছিল, আজকালকার সস্তা ওপেন লেটারের ছড়াছড়ির দিনে সে উত্তেজনার মূল্য কেউ বুঝবে না। ফল ফলেছিল সে চিঠির, কিন্তু আংশিকভাবে। গ্ল্যাড্‌স্টোন তাঁর 'মিড্‌লোথিয়ান ক্যাম্পেনে' দুটো অ্যাক্টের বিরুদ্ধেই যদিও বক্তৃতা করেছিলেন, কার্য্যকালে কিন্তু দেখা গেল, প্রাইম মিনিস্টার গ্ল্যাড্‌স্টোন একটা অ্যাক্টকেই বাতিল করেছেন। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট উঠে গেল, আর্ম্‌স অ্যাক্ট উঠল না। রিপন সাহেব এই শুভবার্ত্তাটি নিয়ে এলেন। এই উপলক্ষ্যে যেসব কৃতজ্ঞতা-গদগদ সভাসমিতি হ'ল, তাতে হংস-শুভ্র খুব প্রসন্নচিত্তে যোগ দিতে পারেন নি। আর্ম্‌স অ্যাক্টটা থেকে যাওয়াতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তিনি। ক্ষোভ কিন্তু বেশিদিন রইল না। লর্ড রিপনের মত বড়লাটকে বেশিদিন অগ্রাহ্য ক'রে থাকা সম্ভব ছিল না। সত্যিই তিনি ভারতের বন্ধু ছিলেন। তাঁর আমলেই স্থাপিত হয়েছিল লোকাল সেল্‌ফ-গভর্মেণ্ট। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি গড়বার ধুম প'ড়ে গেল। সুরেনবাবু এই নিয়ে মেতে উঠলেন একেবারে। স্বায়ত্তশাসনের কিঞ্চিৎ অধিকার পেয়ে শিক্ষিত-সমাজ আকাশের চাঁদই হাতে পেলে যেন। হংস-শুভ্রকেও এই সময় একটা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানগিরি করতে হ'ল দিনকতক। প্রথম প্রথম তাঁরও মনে হয়েছিল,

সত্যি সত্যি আমরা স্বাধীনতার পথে কিছুটা এগোলাম বুঝি। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। লোকাল সেল্‌ফ-গভর্মেন্টের ওপর নয়, দেশের লোকের ওপর। মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র ক'রে যে জঘন্য দলাদলি স্বার্থপরতা নীচতা শঠতা অসাধুতা কুৎসিত আকারে আত্মপ্রকাশ করল, তা আরও বেশি ক'রে তাঁর ইংরেজ-ভক্তিকে বাড়িয়ে তুলল যেন। ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা ক'রে নেটিভদের অযোগ্যতাই যেন তিনি দেখতে পেলেন প্রতি পদে। বিরক্ত হয়ে শেষে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির সম্পর্ক ত্যাগই করলেন। তাঁর ধারণা হ'ল, এমন একটা সুযোগ পেয়েও যখন দেশের লোক কিছু করতে পারলে না, তখন এদের আর কোন আশা নেই। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন ইংরেজ হবার। মাঝে মাঝে দু-একটা বদখত ইংরেজ তাঁর মেজাজ বিগড়ে দিত অবশ্য। একটা নীলকর সাহেব এবং দুর্দ্দান্ত ম্যাজিস্ট্রেটের জ্বালাতেই নিজের জমিদারি বিক্রি ক'রে দিয়ে কলকাতায় চ'লে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ইংরেজ-ভক্তি কমে নি তাঁর। কারণ আদালতে মকদ্দমা ক'রে উক্ত নীলকর সাহেবের কাছে তিনি খেসারৎ আদায় করেছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকেও বদলি করিয়েছিলেন। ব্রিটিশ জাস্টিসের ওপর ভক্তি অচলা ছিল তাঁর। সে ভক্তিও অবশ্য কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছিল সুরেন বাঁড়ুজ্যের কোর্ট-কন্‌টেম্‌প্‌ট কেসে। কিন্তু সেটাকেও একটা ব্যক্তিবিশেষের দোষ ব'লেই মনে হয়েছিল—ইংরেজ-জাতের ওপর চটবার কোন কারণ ঘটে নি। বরং এ নিয়ে আন্দোলন করলে যে ফল হবে, এও তাঁর আশা ছিল। আন্দোলন হয়েওছিল খুব। শালগ্রামশিলার ওপর যে খুব একটা ভক্তি ছিল তা নয়, কিন্তু জাস্টিস নরিস সেটাকে আদালতে নিতে বাধ্য করাতে সকলের আত্মসম্মানে যেন ঘা লেগেছিল। সুরেনবাবু তা নিয়ে তাঁর 'বেঙ্গলী'তে যখন বেশ কড়ারকম একটা 'লিডারেট' লিখলেন, তখন সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। এই অপরাধে তাঁর দু মাস জেল হয়ে গেল। সমস্ত দেশে যেন ঝড় উঠল একটা। যেদিন তাঁর বিচার হয়, আদালত-প্রাঙ্গণে হাজার

হাজার লোক জমা হয়েছিল সেদিন। কলেজের সমস্ত ছেলেরা গিয়েছিল, হংস-শুভ্রও ছিলেন সে ভিড়ের মধ্যে। যখন রায় বার হ'ল, তখন সে কি উদ্দাম উত্তেজনা! আদালতের জানলার একটি কাচও অক্ষত থাকে নি। শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। শুধু কলকাতায় নয়, ভারতবর্ষের অন্যত্রও সাড়া জেগেছিল। সুরেনবাবুর অপমান সারা ভারতেরই অপমান ব'লে গণ্য হয়েছিল সেদিন। জাতীয়তা-বোধ জাগছিল ধীরে ধীরে। জেল থেকে বেরিয়ে সুরেন্দ্রনাথ আরও জাগিয়ে তুললেন সেটাকে। কিছুদিন আগে থেকে ইল্‌বার্ট বিল নিয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী একটা গাত্রদাহ ছিলই—এ সম্পর্কে অ্যালবার্ট হলে সুরেনবাবুর বক্তৃতা ভোলবার নয়—এই সুরেনবাবুর অপমানে সারা দেশ যেন জেগে উঠল। সুরেনবাবু আর একবার ঘুরে এলেন ভারতের নানা স্থানে, ন্যাশনাল ফাণ্ডের জন্যে টাকা উঠল। জাস্টিস নরিসের বিশেষ কিছু হ'ল না যদিও, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে দেশের লোকের আত্মসম্মান-বোধ প্রবুদ্ধ হ'ল যেন। ঠিক এর পরই বসল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স। সভাপতিত্ব করলেন আনন্দমোহন বসু। এ ঠিক বিদ্রোহীর সভা নয়, উপযুক্ত পুত্র পিতার কাছে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে বৈষয়িক ব্যাপারে অধিকার দাবি করে যে ভাষায়, ভারতবাসীরাও ঠিক তেমনই ক'রে অধিকার দাবি করেছিলেন ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের কাছে। দাবি করেছিলেন—শাসন-পরিষদে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাবার, স্বায়ত্তশাসনের, শিক্ষাবিস্তারের, শাসনকর্ত্তা ও বিচারকের কর্ত্তব্য পৃথক পৃথক লোকের হাতে দেওয়ার এবং অধিক-সংখ্যক ভারতবাসীকে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করবার। এর কিছুদিন পরে যা ঘটল, তাতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন সবাই। ইংরেজরা সত্যিই যে এই অধঃপতিত দেশকে উদ্ধার করতে এসেছেন, তাতে আর সন্দেহ রইল না কারও। কিছুদিন আগে রিপন সাহেব চ'লে গেছেন, এসেছেন লর্ড ডাফ্‌রিন। তাঁর আনুকূল্যে এবং হিউম সাহেবের প্রেরণায় বম্বেতে বসল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। ডব্লিউ. সি. বনার্জি

হলেন তার সভাপতি এবং ইংরেজী ভাষায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য-বিষয়ে যা বললেন, তাই তখনকার দিনে কাম্য ছিল—ইংরেজ গভর্মেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে ভারতকে সভ্য করা। এইই সকলে তখন চাইত এবং হবে ব'লে বিশ্বাস করত। হংস-শুভ্রেরও ধারণা ছিল, ভারতের উন্নতি-সৌধ উঠবে রাজ-ভক্তির বনিয়াদের ওপর এবং সে সৌধ অলঙ্কৃত হবে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে। হোয়াইট ম্যান্স বার্ডেনের আন্তরিকতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না তাঁর। তাই কংগ্রেসের প্রথম কয়েক বছর তিনিও নিষ্ঠাভরে দেশের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে এই বার্ষিক পিক্‌নিকে যোগ দিতে যেতেন এবং রাজ-ভক্তির সঙ্গে দেশ-ভক্তি 'পাঞ্চ' ক'রে যে বক্তৃতা-সুরা প্রস্তুত হ'ত তারই নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন সারাটা বছর। এ নেশাও কিন্তু ছুটে যেতে লাগল মাঝে মাঝে। লর্ড ডাফ্‌রিন যাবার সময় কংগ্রেসকে ঠাট্টাই ক'রে গেলেন, শিক্ষিত-সমাজকে ব'লে গেলেন—'মাইক্রস্‌কপিক মাইনরিটি'! দিনকতক পরে এক সার্কুলারে গভর্মেণ্ট-অফিসারদের কংগ্রেসে যোগ দিতে মানা করা হ'ল। এলাহাবাদে কংগ্রেস করাই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল প্রায়—তাঁবু গাড়বার জায়গাই পাওয়া যাচ্ছিল না। তবু এঁরা ভগ্নোদ্যম হলেন না। ইংরেজদের ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠার ওপর আস্থা রেখে তাঁদের কন্‌স্টিট্যুশনাল আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন মোলায়েম ভাষায় এবং এর ফলেই সম্ভবত শাসন-পরিষদে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত জনকয়েক দেশী সভ্যের স্থান হ'ল, শিক্ষারও বিস্তার হ'ল কিছু। কিন্তু কিছুদিন পরেই এলেন লর্ড কার্জন, তারপর ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট এবং তারই পিঠোপিঠি বেঙ্গল পার্টিশন। হংস-শুভ্রের সব স্বপ্ন ভেঙে গেল যেন হঠাৎ। তিনি আরও হতাশ হলেন পরবর্ত্তী নেতাদের সুর শুনে। তিলক নিজেকে 'ন্যাশনাল' ব'লে ঘোষণা করলেন এবং যে 'নেটিভ' কুপ্রথাগুলোকে এতকাল তাঁরা বিদ্রূপ ক'রে এসেছেন, সেইগুলোকে আস্ফালন ক'রেই 'ন্যাশনালিজ্‌ম' জাগাতে চাইলেন সকলের। তিনি বাল্য-বিবাহের সপক্ষে দাঁড়িয়ে কন্‌সেণ্ট-বিলের বিরোধিতা করলেন,

গো-হত্যা-নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন, গণেশ-পূজো নিয়ে মাতলেন, এবং ম্যাৎসিনি, গ্যারিবলডি, নেলসন, নেপোলিয়নকে ছেড়ে শুরু করলেন শিবাজী-উৎসব। বাংলা দেশেও ধর্ম্ম-বাই জেগেছিল কিছুদিন আগে—ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছিল অনেকে, পরমহংসকে নিয়ে নরেন দত্তর দল হৈ-হৈ করছিল, শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনেরা সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করছিলেন। এসব জিনিস হাসিরই খোরাক যোগাত হংস-শুভ্রের বিলিতী মদের আড্ডায়। কিন্তু এই সব জিনিসেরই পলিটিকাল রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল, এই সব কুসংস্কারগুলোই যেন নূতন চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে অরন্ধন আর রাখীবন্ধনের হিড়িকে, কালীপূজো করবার আর 'সন্তান' হবার আগ্রহে। বঙ্গভঙ্গের জন্যে আন্দোলন করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি, সাময়িকভাবে বিদেশী জিনিস বয়কট করবার চেষ্টাও যে করেন নি তা নয়, কিন্তু বিদেশী সভ্যতাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে পিসীমা সাজতে প্রস্তুত ছিলেন না মোটেই। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে যে 'আর্য্যামি' আত্মপ্রকাশ করছিল, তা কিছুতেই মানতে পারছিলেন না তিনি। তখনকার স্বদেশী সভা, সে সভা ভেঙে দেবার জন্যে পুলিসের বলপ্রয়োগ, রাস্তায় রাস্তায় স্বদেশী গান, পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা, সেকালের 'সন্ধ্যা' 'যুগান্তর' 'বন্দেমাতরম্', ফুলার সাহেবের হুমকি, সুরেন বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা তাঁর দেশ-ভক্তিকে খুবই উদ্দীপ্ত ক'রে তুলেছিল, যে স্বদেশী তখন বাংলা দেশের আকাশে-বাতাসে, যে স্বদেশীতে তাঁর নিজের বন্ধুরা মেতেছেন, সে স্বদেশীকে তিনিও অস্বীকার করতে পারেন নি—কিন্তু প্রথম যৌবনে যে কব্‌ডেন ডিজ্‌রেলি বার্ক শেরিডন, যে শেক্‌স্‌পিয়র মিল্টন স্কট ডিকেন্স, যে ম্যাল্‌থস মিল কাণ্ট হেগেল, যে নিউটন ডার্‌বিন ওয়াট কেল্‌ভিন তাঁর চিত্তকে আলোকিত করেছিল, এই নতুন ঝড়ের ঝাপটায় তাদের শিখা নিবে যাবে এ কিছুতেই তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। মাইকেলের কাব্য পড়ার পর হেমচন্দ্রের 'বাজ রে শিঙ্গা'ও যেমন তাঁর ভাল লাগল না, দেবেন ঠাকুরের ছেলের

মহিসুরের ছড়াও তেমনই কানে লাগল না। ঝড় এলে লোকে যেমন ঘরদোর ামলাতে ব্যস্ত হয়, তিনিও তেমনই নিজের আদর্শ বাঁচাতে ব্যস্ত হলেন। ভক্টোরীয় সভ্যতার যে উদাত্ত গম্ভীর আদর্শে তিনি মানুষ, কোন কারণেই া যে বর্জ্জন করা সম্ভব, এ কথা ভাবতেই পারলেন না তিনি। মুখে স্বীকার রতে না পারলেও মনে মনে সাহেবই তখনও তাঁর কাছে দেবতা ছিল। ম্ভিত হয়ে গেলেন যখন 'বম' পড়ল মজঃফরপুরে। কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে াগল না—মারা গেলেন দুজন নিরীহ মেমসাহেব। এর পর আর কংগ্রেসের ঙ্গে প্রাণের যোগ রাখা সম্ভব হ'ল না তাঁর পক্ষে। কংগ্রেসের খাতায় অবশ্য াম রইল, কিন্তু 'মডারেট' দলে। এই মডারেটরাও কিছুদিন পরে কংগ্রেসের ঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজেদের নতুন দল গড়লেন—গোখলের সঙ্গে তিলকের বনল না। তাতে যোগ দেবার আর উৎসাহ পান নি হংস-শুভ্র। নজের আদর্শ নিয়ে একান্তভাবে নিজের পারিবারিক জীবনেই নিবদ্ধ হয়ে াইলেন তিনি। দেশে আন্দোলন অবশ্য চলছিলই এবং তার ফলাফলও পেতে পাচ্ছিলেন তিনি। বয়সও বাড়ছিল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর ইংরেজ-প্রীতি অনেকটা ক'মে গেছে যেন। ইংরেজ-ভক্তির য দুর্গে তিনি আত্মরক্ষা করছিলেন, ইংরেজরা নিজেরাই একটার পর একটা গালা ছুঁড়ে সে দুর্গকে ভূশায়ী ক'রে ফেললেন ক্রমে। সিডিশাস মীটিং ম্যাক্ট, প্রেস অ্যাক্ট, মলি-মিণ্টো বিলের কৃপণতা, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের সেই মাইনটার জোরে বিনা-বিচারে দেশের লোককে আটক রাখা—প্রত্যেকটি এক-একটি গোলা। খবরের কাগজে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্যে তিলকের ই বছর জেল হয়ে গেল—ম্যাণ্ডালেতে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল তাঁকে। বাংলা দশের কৃষ্ণকুমার মিত্র, পুলিনবিহারী দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, অশ্বিনীকুমার 'গু, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুবোধ মল্লিক, শচীন বোস, সতীশ চাটুজ্যে, ভূপেন নাগ, অরবিন্দ ঘোষ সবাই জেলে। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্' সব উঠে গেল। দেশ ছেয়ে গেল সি-আই-ডির গুপ্তচরে। কিছুদিন পরে হঠাৎ

আর একটা জিনিসও আবিষ্কার করলেন। তাঁর সমসাময়িক যেসব নেতারা বড় বড় স্বদেশী ছিলেন, এখন তাঁদের অধিকাংশই বড় বড় চাকরে হয়েছেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার থেকে শুরু ক'রে মাদ্রাজের যত আয়ার এবং নায়ারের দল, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, এ. চৌধুরী, এস. পি. সিন্‌হা, প্রভাস মিত্তির, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, হাসান ইমাম সকলেই গভর্মেণ্টের বড় বড় কর্ম্মচারী। মনে হ'ল, এই মোক্ষ-লাভের জন্যেই যেন এঁরা এতদিন আন্দোলন করছিলেন। ফিরোজ শা মেটাও 'সার্' হলেন। হলেন না কিছু কেবল গোখলে। তিনিই শুধু গোপালকৃষ্ণ গোখলে থেকে গেলেন। কিন্তু গোখলে কটা আছে? গোখলের সগোত্র যাঁরা, গভর্মেণ্টের বিরোধিতা করেছিলেন ব'লে তাঁরা সবাই জেলে। এর কিছুদিন পরে উপর্য্যুপরি কয়েকখানা বই তাঁর হাতে এসে পড়ল। ওয়েডারবার্নের লেখা হিউমের জীবনী, ডব্লিউ. সি. বনার্জির লেখা 'ইন্‌ট্রোডাক্‌শন টু ইণ্ডিয়ান পলিটিক্‌স', লায়ালের লেখা 'লর্ড ডাফ্‌রিনের জীবনচরিত'। প'ড়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন, আমাদের দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে নয়, আমাদের দেশের উদীয়মান স্বাধীনতা-স্পৃহাকে একটা ভদ্র গণ্ডিতে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখবার জন্যেই হিউম সাহেব লর্ড ডাফ্‌রিনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কংগ্রেস সৃষ্টি করেছিলেন। এর পর ইংরেজদের ওপরও আর ভক্তি রাখা গেল না। কিন্তু কংগ্রেসেও আর ফিরতে পারলেন না তিনি—তাঁর কাছে সমস্তই যেন বাজে হুজুক ব'লে মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল, এরা সব সুবিধাবাদীর দল, চাকরি বা বকশিশ পেলেই সব লম্ফঝম্ফ থেমে যাবে এদেরও।

ইংরেজ এবং দেশের লোক দুয়েরই ওপর আস্থা হারিয়ে হংস-শুভ্রের অবলম্বনহীন মন যখন আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখন হঠাৎ একদিন নজর পড়ল বুড়ো দরোয়ানটার ওপর। দেশের বড়লাট কে হ'ল, না হ'ল, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই ওর। ও ঠিক ভোরবেলা উঠে গঙ্গাস্নান করে, তুলসী-তলায় জল ঢালে, পূজোপাঠ করে, রামায়ণ পড়ে, তিলক কাটে, ভজন গায়।

বড়লাট রিপনই হোক বা মিণ্টোই হোক, ওর স্বাধীনতা হরণ করতে পারে নি কেউ। বাইরের উত্তেজনার অভাবে আমাদের মন যেমন ক্ষণে ক্ষণে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে, ওর তেমন হয় না। ওর দিনচর্য্যা ঠিক আছে—কার্জনের আমলেও যেমন ছিল, হার্ডিঞ্জের আমলেও তেমনই আছে। অথচ মানুষ হিসেবে ও কারও চেয়ে ছোট নয়। হংস-শুভ্র ওকে যত বিশ্বাস করেন, নিজের ছেলে শশাঙ্ককে তত করেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, ভুল করেছি, এতদিন তিলকই ঠিক বলেছিল। হিন্দুধর্ম্মই আমাদের সনাতন আশ্রয়—ওই আমাদের 'ন্যাশনালিজ্‌ম'—বাদ বাকি "সব ঝুটা হ্যায়"। গীতা মহাভারত প'ড়ে সে মত আরও দৃঢ় হ'ল। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের সনাতন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে অবশেষে তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। যেগুলোকে আগে কুসংস্কার ব'লে মনে হ'ত, সেইগুলোরই নূতন নূতন অর্থ যেন প্রতিভাত হতে লাগল তাঁর মানসচক্ষে। উগ্র সাহেব ছিলেন যিনি একদিন—খানসামা-বাবুর্চ্চী-ডিনার-লাঞ্চ-স্যুট-সিগারেট-সর্ব্বস্ব সাহেবই নয়, মনে-প্রাণে সাহেব, স্ত্রী কাঞ্চনমালাকে মেম মাস্টারনী রেখে মেমসাহেব করবার চেষ্টা পর্য্যন্ত যিনি করেছিলেন (সফল হন নি যদিও, কাঞ্চনমালা পানের বাটা ত্যাগ করতে রাজি হলেন না কিছুতে), ছেলেদের বিলেত পাঠিয়েছিলেন, মেয়েদের কলেজে পড়িয়েছিলেন, কোর্টশিপ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন, বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে পর্য্যন্ত ত্রুটি করেন নি, তিনি শেষ বয়সে একেবারে উলটে গেলেন। এখন পাঁজি ছাড়া এক মুহূর্ত্ত চলে না। নামাবলী গায়ে, কানে খড়কে গোঁজা, তর্জ্জনীতে অষ্ট-ধাতুর আংটি অলঙ্কৃত এই লোকটির মধ্যে প্রাক্তন মিস্টার এইচ. এস. মোকার্জিকে খুঁজে বার করা সত্যিই অসম্ভব এখন।

একই শিক্ষার ফলে এবং এক রকম আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে দু ভাই কিন্তু ঠিক এক রকম হন নি। সোম-শুভ্রের ওপর এই শিক্ষার ফল ফলেছিল একটু ভিন্ন রকমের। তিনি ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সে-যুগে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণের যে দুর্ভোগ, তা সবই ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। পিতা বেঁচে থাকলে হয়তো

ত্যাজ্যপুত্রই করতেন, বিষয় থেকেও বঞ্চিত হতে হ'ত, কিন্তু সে লাঞ্ছনাটা সইতে হয় নি, বিষয়ের অর্দ্ধেক ভাগ ঠিকই তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য তাঁকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়েছিল। উগ্র সাহেব হংস-শুভ্র ব্রাহ্মদের দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না, বিশেষ ক'রে কেশব সেনের মেয়ের বিয়ের পর থেকে। তাঁর কেমন যেন ধারণা জন্মেছিল, ওরা সবাই ভণ্ড। দাড়ি রেখে চশমা প'রে বেদ-উপনিষদের মুখস্থ বুলি আওড়ায় কেবল, মনের এতটুকু প্রসারতা নেই, স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনী-শক্তি নেই, চিবিয়ে চিবিয়ে গুছিয়ে গুছিয়ে চারদিক বাঁচিয়ে ওজন-করা কথা বলার প্রয়াসেই ওদের জীবনী-শক্তি নিঃশেষ হয়েছে। হয়তো হংস-শুভ্রের ধারণাটা ভুল, কিন্তু সেটা তাঁর বদ্ধ ধারণা হওয়াতে কিছুতেই তিনি সোম-শুভ্রের আকস্মিক ধর্ম্মান্তর-গ্রহণকে ক্ষমার চক্ষে দেখেন নি। সোম-শুভ্রকে পারিবারিক বন্ধন বিচ্ছিন্নই করতে হয়েছিল। তাঁর নিজের পরিবারও গ'ড়ে ওঠে নি, কারণ তিনি বিবাহই করেন নি। বিহার-অঞ্চলে খানিকটা জমি কিনে কৃষি-কর্ম্ম ক'রেই কাটিয়ে দিয়েছেন প্রায় সারা জীবনটাই। তাঁর এক কলেজী বন্ধু সুরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পরিবারের সঙ্গেই সোম-শুভ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সুরেশ্বরও ব্রাহ্ম। প্রায় বছর দশেক আগে তিনি মারা গেছেন একটিমাত্র ছেলে রেখে। ছেলেটির মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। কৃষিকর্ম্ম এবং এই পিতৃমাতৃহীন পরমানন্দই সোম-শুভ্রের মনের আশ্রয় ছিল। পরমানন্দকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে সে এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন একটি মনোমত পাত্রীর সঙ্গে তার বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন। পাত্রী অনামিকা তাঁর এক বন্ধুরই মেয়ে। এদের কেন্দ্র ক'রে সোম-শুভ্রের জীবন এক রকম কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নিজের ভাইপো-ভাইঝিদের খবর তিনি নিতেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। শশাঙ্ক-শুভ্র, মৃগাঙ্ক-শুভ্র এবং কুন্দ-শুভ্রাকে তিনি কোলে করেছেন, কিন্তু বাকি কজনের—সিতাংশু-শুভ্র, হিমাংশু-শুভ্র, সুধাংশু-শুভ্র, ইন্দু-শুভ্রা—এদের সংস্পর্শ

পান নি তিনি। সিতাংশুর জন্ম হবার আগেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তার পর থেকেই ছাড়াছাড়ি। দেখা হয়েছে অবশ্য বহুবার। সেদিনও শশাঙ্ক তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেল। হিমাংশু যেবার ডি. এস-সি. হ'ল, সেবার সে নিজেই এসে কাকামণির সঙ্গে দেখা ক'রে গিয়েছিল। সিতাংশু ব্যারিস্টারি পাস ক'রে কলকাতায় এসে নামল যেদিন, সেদিন তিনি নিজেই স্টেশনে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। সুধাংশুও অক্সফোর্ড থেকে বরাবর চিঠি লিখত তাঁকে। হিমাংশু, সিতাংশু কেউ নেই আজ, সব অকালে মারা গেছে। কুন্দও নেই—হয়তো সেও মরেছে, বেঁচে থাকলেও ভদ্রসমাজে তার অস্তিত্ব আর স্বীকার করা সম্ভব নয়। কুন্দর চিঠিখানা কিন্তু সোম-শুভ্রের কাছে এখনও আছে। মাঝে মাঝে চিঠিখানা এখনও খুলে দেখেন তিনি। ছোট চিঠি, দুটি ছত্র মাত্র লেখা—"কাকামণি, চললুম। আপনার বিদ্রোহ সমাজ মেনে নিয়েছে—আমার বিদ্রোহও যেদিন নেবে সেদিন ফিরে আসব, যদি বেঁচে থাকি।" যদিও তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে নীতিবাগীশ ব'লে বিখ্যাত, তবু কুন্দর জন্যে অন্তরের নিভৃত কন্দরে তিনি বেশ একটু দুর্ব্বলতা পোষণ করেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়—আহা, মেয়েটার ঠিকানাটা যদি পেতাম, দেখা ক'রে আসতাম গিয়ে। তার কচি সুন্দর মুখটা মনের ওপর ভেসে ওঠে। তাকে যখন তিনি শেষবার দূর থেকে দেখেছিলেন, তখন তার বয়স বছর দুই হবে। দূর থেকেই তিনি এতকাল দাদার পরিবারের খবর নিয়েছেন এবং ভেবেছিলেন, চিরকালই তাই হয়তো নিতে হবে, কিন্তু বছর দুই আগে হঠাৎ একদিন হংস-শুভ্রের এক চিঠি পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। একটু পুলকিতও যে না হলেন তা নয়, কিন্তু একটু দুঃখও হ'ল। যে সংসার থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছেন, সে সংসার তো আর নেই। সে সংসারের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের বস্তু ছিলেন যিনি, সেই বউদিদিই নেই, হঠাৎ মারা গেছেন সেদিন।… হংস-শুভ্র রীতিমত সনাতন পদ্ধতিতে পত্র লিখেছিলেন।—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

আশীর্ব্বাদভাজন শ্রীমান্ সোম-শুভ্র মুখোপাধ্যায়

পরমকল্যাণবরেষু,

গতকল্য আমার আশী বৎসর পূর্ণ হইল। অতীত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম, জীবনে অনেক ভুল করিয়াছি। তোমার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাও একটা ভুল। ইহার জন্য অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু কখনও অনুতপ্ত হই নাই। কারণ মনে একটি সান্ত্বনা ছিল, যাহা করিয়াছি তাহা উচিত বলিয়াই করিয়াছি। আজ কিন্তু আর সে সান্ত্বনা নাই, তাই অনুতপ্তচিত্তে ভুল সংশোধন করিতে বসিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এতকাল যাহা ঠিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আজ তাহাই বেঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। হিন্দু কখনও পরমত-অসহিষ্ণু নয়। হিন্দুধর্ম্মে যত মত তত পথ এবং সব পথই এক লক্ষ্যাভিমুখী। হিন্দুধর্ম্মে মতের বিভিন্নতা আছে, অভিনবত্বের প্রতি শ্রদ্ধা আছে—কলহ নাই। বাস্তবধর্ম্মী পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পড়িয়া তোমার সহিত মনোমালিন্য করিয়াছিলাম। সে মোহ কাটিয়াছে। তুমি আবার ফিরিয়া এস, আমি অনুতপ্তচিত্তে আমার নিষেধ প্রত্যাহার করিতেছি। তুমি সত্যই ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা অবশ্য তোমার বিচার্য্য। বলা বাহুল্য, আসিলে আমি অতিশয় সুখী হইব।

সংসারে কাহারও সহিত মতের মিল হয় না। ছেলেরা এবং নাতিরা যাহার যাহা খুশি করিতেছে। সৎ পরামর্শ দিলে কেহ শোনে না। নিজের মতামত আস্ফালন করিয়া অপরের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন জন্মাইবারও প্রবৃত্তি নাই। তাই আমি দমদমের বাড়িতে তারাপদকে লইয়া একাই থাকি। ইন্দুও আমার কাছে থাকে। কেন যে থাকে, বুঝি না। বার বার তাহাকে বলি, তুমি একাই যদি থাকিতে চাও, পার্ক স্ট্রীটে তোমার আলাদা একটা বাড়ি আছে, সেইখানেই যাও না, আমার কাছে কেন? সে কোন উত্তর দেয় না, যায়ও না, আমার বকুনি শুনিবার জন্য আমার কাছে পড়িয়া থাকে।

তুমি যদি এ অঞ্চলে আস, আমার সহিত দেখা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। সঙ্কোচের কোনই কারণ নাই। আমার আশীর্ব্বাদ লও। আশা করি ভাল আছ। ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীহংস-শুভ্র মুখোপাধ্যায়

এ বছর দুই আগের ঘটনা।

তার পর থেকে সোম-শুভ্র মাঝে মাঝে দাদার কাছে যান। গেলে দাদা মনে মনে আনন্দিতই হন নিশ্চয়ই, অন্তত সোম-শুভ্রের তাই ধারণা, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ বা প্রমাণ বড় একটা পান নি তিনি। হংস-শুভ্র তাঁর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন, তাঁর যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। ঠিক ভাইয়ের মত নয়, সম্মানিত অতিথির মত আলাপ করেন তাঁর সঙ্গে। সোম-শুভ্রের মনে হয়, ঠিক সুর যেন মিলছে না, কোথায় কিসের যেন একটা অভাব থেকে যাচ্ছে। তবু তিনি যান মাঝে মাঝে।

বাসন্তীর চিঠিখানা আর একবার প'ড়ে, হংস-শুভ্র অনুচ্চ কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন, ছেলেটাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—

পাশের ঘরেই ইন্দু ছিল। বাবার অনুচ্চ কণ্ঠস্বরও তার কর্ণ এড়ায় না, সে বেরিয়ে এল।

কিছু বলছ বাবা?

না।—একটু হাসবার চেষ্টা করলেন হংস-শুভ্র।

ডাক এল নাকি? কার চিঠি ওখানা?

তোমার বড়বউদিদির।—মুখে হাসি ফুটিয়ে গড়গড়ার নলটা আবার মুখে তুলে নিলেন, এমন একটা ভাব করলেন যেন খুব কৌতুকজনক একটা সংবাদ আছে চিঠিখানাতে। স্মিত মুখে নীরবে হাঁটু দোলাতে লাগলেন। ইন্দুর বুঝতে বাকি রইল না যে, বাবা বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু সে চুপ ক'রে রইল।

বাবা যদি বুঝতে পারেন যে, সে তাঁর মনোভাব টের পেয়েছে, তা হ'লে আরও বিরক্ত হবেন তিনি। তাই সে হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হ'ল।

আজকের কাগজখানা দেখেছ? হিন্দু মহাসভা—

না, দেখি নি।

তারপর ইন্দুর মুখের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললেন, কোন দিনই দেখি না। দেশের লোক দুটো পয়সা পাবে ব'লে কিনি।

সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ইন্দুকে বলতে হ'ল, তা বটে, একটা খবরও সত্যি নয়।

কি করবে বেচারারা? পিঠের চামড়ার মায়া তো সবাই ত্যাগ করতে পারে না, মানুষের চামড়া গণ্ডারের চামড়ার মত শক্তও নয়, চাবকালে বেশ লাগে।

তোমার খড়মের ফিতেটা তারাপদ ঠিক ক'রে দেয় নি দেখছি এখনও।

ইন্দু একটু ঝুঁকে খড়মটা তুলে নিলে।

একটা ছোট পেরেক দিয়ে দিলেই তো হয়, আমিই দিচ্ছি,—তারাপদর অবসর হবে না কোনও কালে।

খড়মটা নিয়ে ইন্দু চ'লে গেল। হংস-শুভ্র হাসলেন একটু। মেয়েটা সর্ব্বদাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, ও অদরকারী নয়, খড়মের ফিতে থেকে আরম্ভ ক'রে বালিশের ওয়াড়ের ঝালর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নিজের প্রতিপত্তিটুকু জাহির ক'রে রাখা চাই সর্ব্বক্ষণ। সহসা হংস-শুভ্রের কাঞ্চনমালার কথা মনে পড়ল। সব সময়ে সুযোগ পেত না যদিও, কিন্তু সেও সর্ব্বদা নিজের আয়ত্তের মধ্যে সব জিনিস রাখতে চাইত। খাওয়া-শোওয়া আসবাব পোশাক-পরিচ্ছদ তো বটেই, গামছা-খড়মের দরকার হ'লেও তার শরণাপন্ন না হ'লে পাওয়া যেত না। পুরুষদের স্বাধীনতা-হরণের এ কৌশলটা আজকালকার মেয়েদের ঠিক জানা নেই বোধ হয়। অনেক বাড়িতেই পুরুষদের আলাদা আলমারি, আলাদা ওয়াড্রোব স্ত্রী-সংস্পর্শ-বর্জ্জিত হয়ে খানসামার তদারকে থাকে। শঙ্কর যেমন।

হঠাৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কথা মনে পড়ল। ভাবলেন, বিয়ে করলেই স্ত্রী-লাভ হয় না সকলের ভাগ্যে, কনকের মত অমন—

এই নাও। খড়মটা ঠিক ক'রে ইন্দু নিয়ে এল। হংস-শুভ্র পায়ে দিয়ে বললেন, বাঃ, বেশ হয়েছে! খড়মটা পরতে গিয়ে চিঠিখানা কোল থেকে মেঝেতে প'ড়ে গেল। সেটা তুলে নিয়ে পাশের তেপায়াতে রাখলেন, কোন মন্তব্য করলেন না।

কি লিখেছেন বউদিদি?

প'ড়ে দেখ।

ইন্দু চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল।—

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা, আগামী রবিবারে আমাদের ছোট্ট খোকনের মুখে ভাত দেব ঠিক করেছি। রবিবার ছাড়া অন্য দিনে হওয়ার অসুবিধে। কারও ছুটি নেই। সেদিন মনে করেছি সবাইকে বলব। ছোটঠাকুরপোর বম্বে চ'লে যাওয়ার কথা, কিন্তু তাকে ধ'রে রেখেছি। কাজলের বাবা দানাপুর থেকে এসে পৌছবেন—মানে, পৌছবার কথা—আগামী শুক্রবারে। কাল তাঁকে টেলিগ্রাফ করেছি, ঠিক যেন আসেন। বিয়ের পর থেকে তিনি তো আসেনই নি, হয়তো ভাবছেন, আমরা কিছু মনে করেছি, এই উপলক্ষ্যে এসে তাঁর সে ধারণাটা দূর হোক। কনককে অনেক ক'রে লিখেছিলাম আসবার জন্যে, কোন উত্তর পাই নি। মুক্তা আর শুক্তিকে বোর্ডিং থেকে আনিয়ে নেব সেদিন, সে দুদিন ওরা আমার কাছেই থাকবে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি পাওয়া গেছে, শুনলাম ঠাকুরপোর কাছে। ভারী কড়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আমি 'ফোন' করাতে বললেন যে, গার্জেনের চিঠি না পেলে ছুটি দিতে পারবেন না। ভাগ্যিস ঠাকুরপো এখানে ছিল। ঠাকুরপোকে কতবার বলেছি, আমাকে ওদের লোকাল গার্জেন ক'রে দাও, ওদের মাসীর চেয়ে তো আমি বেশি আপনার—ঠাকুরপো মুখে প্রত্যেক বারই বলে, আচ্ছা, তাই ক'রে

দেব, তোমরা ঝঞ্ঝাটে পড়বে ব'লেই করি নি। এতে ঝঞ্ঝাটটা কি বলুন তো? আর একটা কি মজা হয়েছে জানেন, কাকামণিও ঠিক সেই সময় এদিকে আসছেন। তিনি তো আমাদের পারিবারিক উৎসবে বড় একটা যোগ দেন নি কখনও, এবার আসবেন লিখেছেন। আমার বাবাকেও চিঠি লিখেছিলাম আসবার জন্যে। তিনি বুড়ো হয়েছেন, চোখে ভাল দেখতে পান না, তিনি যে আসতে পারবেন সে আশা অবশ্য করি নি, তবু লিখতে হয়, লিখেছিলাম। টুনি লিখেছে, তিনি নাকি আসবার জন্যে ক্ষেপেছিলেন, গাড়ি রিজার্ভ করতে লোক পর্য্যন্ত পাঠিয়েছিলেন নাকি, শেষে মণি কর্নেল হাউডকে ডেকে এনে থামায় তাঁকে। তিনি আসবেন না বটে, কিন্তু কত জিনিস যে পাঠিয়েছেন নাতির ব্যাটার জন্যে, তা এলে দেখতে পাবেন। দিল্লী শহরের যত মেওয়া ছিল সব ঝুড়ি ঝুড়ি, তা ছাড়া কত রকম টফি লজেন্‌জ বিস্কুট, কত হরেক ধরনের শিশি বাক্স কৌটো—একটা ঘর ভ'রে গেছে একেবারে। এর ওপর পাঁচশো টাকার চেকও পাঠিয়েছেন একখানা। চেকটা ভাগ্যে ওঁর হাতে পড়ে নি, পড়লেই ফুট-কড়াই হয়ে যেত। ও আমি খরচ করব না, খোকনের নামে জমা ক'রে দেব। উপহার আরও অনেক এসে জুটেছে। ওঁর বন্ধু মেজর চণ্ডা চমৎকার একটা দোলনা কিনে পাঠিয়েছেন। ঠাকুরপো একরাশ রেশমের খদ্দরি বিছানা এনে হাজির করেছে। বললাম, যা মুতুড়ে ছেলে হয়েছে, ওকে রেশম কেন, এক গাদা অয়েল-ক্লথ কিনে দাও বরং। শুক্তি-মুক্তা দুজনে মিলে একটা পেরাম্বুলেটার দেবে বলেছে। নবনী তো বড় একটা আসে না, সেও সেদিন সুন্দর একটা ঝারা কিনে দিয়ে গেছে। ছেলের পাওনা-ভাগ্য খুব। শঙ্খ বলছে, আমি কিচ্ছু দেব না। কেবল কান ম'লে দিচ্ছে ব্যাটার। বেশ জোরে জোরে ম'লে দেয়—সেদিন তো ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল। হিমু-ঠাকুরপো ঠিক অমনই ক'রে হীরুর কান ম'লে দিত—মনে আছে আপনার? কোথায় আজ হিমু-ঠাকুরপো, কোথায় বা হীরু! ভগবান যাদের নিয়ে নিয়েছেন, তাদের তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না, কিন্তু হীরু যে

আমার থেকেও নেই। কবে যে জেল থেকে ছাড়া পাবে, কে জানে! দাদার ছেলে হয়েছে শুনে কি আনন্দ তার, কি চমৎকার চিঠি লিখেছে! কি নামই রেখেছিলেন ওর আপনি—হীরকের মতই উজ্জ্বল, হীরকের মতই কঠিন! আপনার দেওয়া নামের মর্য্যাদাও রেখেছে। সবই বুঝি, তবু কষ্ট হয়—মনে হয়, ও যদি কঠিন না হয়ে আর একটু কোমল হ'ত, হয়তো ওকে ধ'রে রাখতে পারতাম। রজতের ব্যাপার তো জানেন, সে এখানে থেকেও নেই, কাজল মাঝে মাঝে আসে, সে কিন্তু ঘর থেকে আর বেরোয় না। সেদিন গিয়ে অনেক ক'রে ব'লে এসেছি, যা খামখেয়ালী ছেলে আসবে কি না জানি না।

আপনি ইন্দুকে নিয়ে নিশ্চয় আসবেন। আমি আগের দিন বিকেলে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। বিকেলে মানে দুপুরবেলাই পাঠাব, আপনি যাতে তিনটে নাগাদ এখানে এসে পৌঁছতে পারেন। পাশাপাশি আরও দুখানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি—অনেকে আসবে তো, একটা বাড়িতে কুলোবে না। আমাদের একতলার দক্ষিণ দিকের ঘরগুলো আপনার জন্যে ঠিক ক'রে রাখছি, ওপরে আপনার কষ্ট হবে। বেশি কিছু জিনিসপত্র আনতে হবে না, প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়গুলো আনবেন কেবল। পূজোর জিনিসপত্র আনবার দরকার নেই। আমি আপনার জন্যে এক সেট সব কিনে রেখেছি, এমন কি শ্বেতপাথরের বাসন পর্য্যন্ত। আপনাকে আসতেই হবে, অমত করবেন না। আপনার নাতির ছেলের অন্নপ্রাশনে আপনি না থাকলে চলে? ইন্দুকে আর আলাদা চিঠি লিখলাম না। আর তারাপদকেও আলাদা নিমন্ত্রণ-পত্র দিতে হবে না আশা করি।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইন্দুকে আশীর্ব্বাদ দেবেন। ইতি—প্রণতা বাসন্তী

চিঠিখানা পড়তে পড়তে ইন্দুর সুন্দর মুখখানাও অজ্ঞাতসারে যেন পাষাণের মত কঠোর হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হতে লাগল, তা

আর যাই হোক আনন্দ নয়। নিজের ব্যর্থ ব্যথিত জীবনের অনতিক্রম্য অভিশাপ বহন ক'রে সংসারের সমস্ত আনন্দ-উৎসব থেকে সে নিজেকে যথাসাধ্য দূরেই সরিয়ে রেখেছে, তার কারণ পাছে তার দুর্ভাগ্যের উত্তাপে আর কারও সৌভাগ্যের ফুল শুকিয়ে যায়, তা ঠিক নয়। নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই নিজেকে অবলুপ্ত ক'রে দিতে চায় সে। যে মহাকালের নিদারুণ বিধানে তার সমাজ-জীবনের আশা-আনন্দ-আকাঙ্ক্ষা একবার নয় দু-দুবার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সে মহাকালকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু পরাজয়-গ্লানি-লাঞ্ছিত এই ভাগ্য নিয়ে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে সেই সমাজ-জীবনে আর সে ফিরে যেতে চায় না। যেখানে গৌরবের আসন দাবি করেছিল, সেখানে সসঙ্কোচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না সে কিছুতেই। বড়বউদিদি কেন তাকে যেতে লিখেছেন, তিনি কি তাকে চেনেন না? তাকে এমন অপদস্থ করবার মানে কি?

হংস-শুভ্র আড়চোখে একবার কন্যার মুখের পানে চেয়ে দেখলেন। হাঁটুর আন্দোলন আরও বেড়ে গেল। কিছু বললেন না। গড়গড়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ রইল না খানিকক্ষণ। ইন্দু চিঠিখানা প'ড়ে সযত্নে সেখানা খামের মধ্যে পুরে তেপায়ার ওপরে রেখে চ'লে যাচ্ছিল, এমন সময় হংস-শুভ্র কথা কইলেন।

বড়বউ নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে শশাঙ্কটাকে নানা রকম হুজুকে ক্রমাগত। এদিকে ঋণে তো জেরবার হয়ে পড়েছে শুনছি।

ঋণ শোধ হয়ে গেছে বোধ হয়। নতুন একটা মিল কিনেছেন, শুনলাম সেদিন তারাপদর কাছে।

খুব শান্ত কণ্ঠে কথাগুলি বললে ইন্দু-শুভ্রা। মিল কেনার কথা হংস-শুভ্রও শুনেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর মনে একটা জ্বালাও ছিল। অতর্কিতে উত্তপ্ত কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল মুখ থেকে।

হ্যাঁ, কিনেছে—বড়বউয়ের নামে।

ইন্দু চুপ ক'রে রইল। তারপর অতিশয় নিরীহভাবে প্রশ্ন করলে, আপনার কি কি কাপড় গুছিয়ে দেব? যাবেন তো, বড়বউদি অত ক'রে অনুরোধ করেছেন যখন?

খানিকক্ষণ গড়গড়া টেনে অগ্নিবর্ষী চক্ষুর দৃষ্টি ইন্দুর মুখের ওপর স্থাপন ক'রে বললেন, যাব কেন?

ইন্দু নতমুখে নতদৃষ্টিতে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ইন্দুর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে খানিকক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে থেকে হংস-শুভ্রের দৃষ্টির জ্বালা স্নিগ্ধতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল—সবেদন স্নিগ্ধতায়। এই তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান—কনিষ্ঠ এবং প্রিয়তম। এর ওপরই বিধাতার যত আক্রোশ! আই. এ. পাস ক'রে নিজে পছন্দ ক'রে বিয়ে করেছিল মহীতোষকে, ছ মাসের মধ্যে বিধবা হ'ল। বছর দুই পরে আবার বিয়ে দিলেন—বীরেনও বাঁচল না। ওর জন্যে আলাদা বাড়ি ক'রে দিয়েছেন, আলাদা সম্পত্তি ক'রে দিয়েছেন। যথেচ্ছাচার জীবন যাপন করবার কোন সুযোগের অভাব নেই। এ যুগে সবাই ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, ওই বা দেবে না কেন—তিনি নিজেও তো কম কিছু করেন নি? পর পর কয়েকটা মুখ মানস-পটে ফুটে উঠল—জোহরা, স্বর্ণ, মিস এলিসন, মিসেস ঘোষ, মোক্ষদা, আরও কয়েকটা— কেউ তো একালে আত্ম-সম্বরণ ক'রে ব'সে নেই, পারুক না-পারুক দু হাতে জীবনটাকে আঁকড়ে ধরবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বিস্তার করেছে সবাই। কুন্দর মুখখানা আবার মনে পড়ল—ইন্দুই বা কৃচ্ছ্রসাধন করবে কেন, এর মধ্যেই সব সাধ-আহ্লাদ ফুরিয়ে যাবে কেন ওর? একটা ছেলে পর্য্যন্ত হ'ল না! কলকাতায় নিজের বাড়িতে গিয়ে বেশ জমজমাট হয়ে থাকুক না, কিন্তু না, তা থাকবে না ও, থান প'রে শুধু হাতে আমার চোখের সামনে হবিষ্যি ক'রে যাবে দিনের পর দিন। মাথার সিঁদুরটা একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলেছে। বাসন্তীর নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করবে ঠিক। হংস-শুভ্রের চোখের দৃষ্টি আবার প্রখর হয়ে উঠল।

আমি যাব কেন? আমার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক একটা ফরম্যুলা মাত্র,

একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার শুধু। আমি প্রাগৈতিহাসিক। শ্বেতপাথরের বাসন দিয়ে আমার যুগের সঙ্গে এ যুগের সেতু বাঁধবার চেষ্টা দুশ্চেষ্টা তোমাদের।

তবু আপনাকে যেতেই হবে শেষ পর্য্যন্ত।

তুমি যদি জোর ক'রে নিয়ে যাও, তা হ'লে যেতেই হবে।

কন্যার মুখের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে মৃদু হাসলেন হংস-শুভ্র। যে প্যাঁচটা কষেছেন, তা থেকে মুক্তি পাওয়া ইন্দুর পক্ষেও অসম্ভব হবে ভেবে বেশ একটু পুলকিতই হলেন তিনি। ইন্দু তবু চেষ্টা করতে ছাড়লে না।

আমি ভাবছি—

তুমি কি ভাবছ, তা জানি। তুমি ভাবছ, বুড়োটা ওই হুল্লোড়ের মধ্যে গিয়ে হোঁচট খেয়ে মরুক, আমি দিব্যি এখানে নিরিবিলিতে থাকি। তোমরা সবাই স্বার্থপর।

ক্ষণকাল নীরব থেকে ইন্দু বললে, বেশ, যাব তা হ'লে।

ব'লেই চ'লে যাচ্ছিল, হংস-শুভ্র ডাকলেন।

আজ সোম আসবে একটু পরেই। মনে আছে তো?

কাকামণির ঘরটাই ঠিক করতে যাচ্ছি।

পালংশাক আনতে দেওয়া হয়েছে?

তারাপদকে স্থক্তোর সব জিনিসই আনতে দিয়েছি, কিন্তু এখনও তার পাত্তা নেই। তুমি ওকে বড্ড আশকারা দাও বাবা।

এ আলোচনা আর বেশি দূর অগ্রসর হবার স্থযোগ পেল না, কারণ দ্বার-প্রান্তে ভট্টাচার্য্য মশাই দেখা দিলেন। এইবার মহাভারত-পাঠ শুরু হবে।

ইন্দু-শুভ্রা কাকামণির ঘর ঠিক করতে গেল।

খ
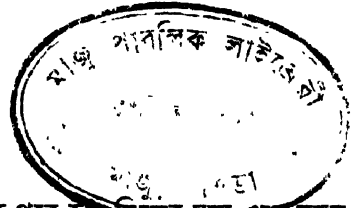
কাকামণির ঘর ঠিক ক'রে ঘণ্টাখানেক পরে ইন্দু নিজের ঘরে এসে ঢুকল। তার সমস্ত মন জুড়ে কি যে একটা হচ্ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত! ঠিক রাগ নয়, ঠিক বিরক্তিও নয়, কি যেন একটা কি! মাঝে মাঝে তার এ রকম হয়। দু-দুবার বিধবা হয়েছে ব'লে যে গ্লানি হওয়া স্বাভাবিক, সে গ্লানি একা ঘরে তার হয় না, সে গ্লানি সামাজিক। দুবার বিধবা হয়ে সমাজের কাছে সে যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, উপর্য্যুপরি দুবার ট্রেন মিস করলে আর পাঁচজনের কাছে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হয়। মহীতোষ কিংবা বীরেনের সম্বন্ধে তার যে কিছুমাত্র মমত্ববোধ নেই—এ কথা অবশ্য ঠিক নয়, কিন্তু সে মমত্ববোধটা তার সমস্ত সত্তাকে সর্ব্বক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে থাকে না। দুটি যুবক তার জীবনে অতি অল্পদিনের জন্য এসেই চ'লে গেছে—এদের মধ্যে কেউ একজন বেঁচে থাকলে হয়তো তার জীবন ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠত, এই সব স্মৃতি-সম্ভাবনা নিয়ে সারা-জীবন হা-হুতাশ ক'রে কাটিয়ে দেওয়ার মত নির্জ্জীব মন তার নয়। তার পরনে থান, মাথায় সিঁদুর নেই, অঙ্গ নিরাভরণ, এক বেলা হবিষ্যান্ন ভোজন ক'রে কম্বলে শুয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সে পালন করছে বটে, কিন্তু অন্তর তার নিরাসক্ত নয়, বৈরাগ্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে সে, মুক্তি তার কাম্য বটে, কিন্তু 'সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' সে মুক্তি। কিন্তু কোথায় সে সহস্র বন্ধন, যা তাকে মহানন্দময় মুক্তির সন্ধান দেবে? স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর যে বন্ধন, কোন এক বিশেষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্যে যে সব সামাজিক বন্ধনে জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বাঁধা পড়ে, তা কি সব সময়ে আনন্দময়? তা তো নয়। বাড়ির কার সঙ্গেই বা তার মনের সুর মেলে? যাদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তাদের সঙ্গেই বা মিলত কি না কে জানে।

মহীতোষের প্রেমে প'ড়েই তাকে বিয়ে করেছিল সে, মনে হয়েছিল যে, মনের সুর মিলেছে, কিন্তু দু দিনেই ভুল ভেঙেছিল। যে মহীতোষকে সঙ্গী ক'রে স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে এক আদর্শলোকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে আশা করেছিল, সেই মহীতোষ যখন বিয়ের পর খাকি হাফপ্যাণ্ট প'রে পুলিসে চাকরি নেবার জন্যে স্থানে-অস্থানে সেলাম ক'রে বেড়াতে লাগল, তখন তার স্বপ্ন-কাব্যে প্রথম ছন্দ-পতন ঘটল। পুলিসমাত্রেই যে খারাপ তা নয়, খাকি হাফপ্যাণ্ট অনেক ভদ্রলোকেও পরে, তবু যে কেন বেসুরো বাজল তা ঠিক জানা নেই তার, কিন্তু বেজেছিল। হয়তো আবার সুর জমত এসব সত্ত্বেও, হয়তো জমত না, কিন্তু মহীতোষ বাঁচল না। তারপর এল বীরেন। বীরেনকে সে আগে চিনত না। বাবা সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন। সে বিয়েতে মত দিয়েছিল মাত্র। অন্য কোন কারণে নয়, বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত—এই সুস্থ মতবাদকে সমর্থন করবার জন্যেই মত দিয়েছিল। অপরে যা করতে ভয় পায় সে যে তা অকুতোভয়ে করতে পারে, এইটে প্রমাণ করবার জন্যেই মত দিয়েছিল। আবার বিয়ে করবার দিকে বিশেষ একটা লোলুপতা তারও ছিল না। যৌন-সম্ভোগ-লালসা তার জীবনকে কোনদিনই নিয়ন্ত্রিত করে নি, অযৌন জীবন যাপন করলে যে নারী-জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবেই এই হাস্যকর উক্তিকে সে কোনদিনই যুক্তিযুক্ত মনে করে না, সে বিয়ে করেছিল বিধবা-বিবাহের প্রতি সমাজের অযৌক্তিক আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ। বিধবা-বিবাহ সমাজে সুপ্রচলিত থাকলে হয়তো সে বিয়ে করত না।...বীরেনও বাঁচল না। দু-দুটো বন্ধন খুলে গেল। কিন্তু তাই ব'লে সে কি দাদা-বউদিদিদের সংসারে ঢুকে সকলের অনুকম্পাভাজন হয়ে তাদের ছেলে-মেয়ে মানুষ ক'রে নারীজন্ম সার্থক করবে? যাদের সঙ্গে এতটুকু মতের মিল নেই, সারা-জীবন তাদের কথায় সায় দিয়ে দিয়ে গৃহলক্ষ্মী সেজে ব'সে থাকবে? পৃথিবীতে আর কাজ নেই? আর মানুষ নেই? আছে বইকি। অজস্র মানুষ আছে, সহস্র সহস্র মানুষ আছে, যাদের সে দেখে নি অথচ ভালবাসে, যাদের আদর্শকে সে

করে, যাদের মনের সুরের সঙ্গে তার মনের সুর ঠিক ঠিক মিলে যায়, তারাই তার আত্মীয়। তাদের জন্যেই বাঁচতে হবে, তাদের জন্যেই বৈধব্যের এই ছদ্মবেশ। তাদের জন্যেই দরকার হ'লে বিলাসিনীর ভূমিকাতেও সে অবতীর্ণ হবে তার পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে, কিন্তু এখনও তার প্রয়োজন হয় নি, প্রয়োজন হ'লে সে সব করবে, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেবে, কিন্তু এখন নয়। এখন তাকে দমদমের বাড়িতেই থাকতে হবে কিছুকাল।

ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে। যে কথাটা এতক্ষণ অস্পষ্টভাবে তার মনকে আকুল ক'রে তুলছিল, সহসা সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কথা নয়, বর্ণনা। মেদিনীপুরের একটা বর্ণনা। বর্ণনাটা তেমন কিছু নয়, কিন্তু এ বর্ণনার পেছনে যে ছবি প্রচ্ছন্ন আছে, তা ভয়ঙ্কর। সকালে যখন কাগজ পড়ছিল, সেই ছবিটা মুহূর্ত্তের জন্য ফুটে উঠেছিল তার মানস-পটে…তবু শঙ্খর ছেলের অন্নপ্রাশনে উৎসব করতে হবে, বউদিদির বাবা ঝুড়ি ঝুড়ি উপহার পাঠিয়েছেন—লজেন্‌জ, বিস্কুট, মেওয়া…হীরক জেলে—কম্‌রেড হীরক…হীরককে সে বুঝতে পারে না…নিজের দেশের চেয়ে রাশিয়া তার কাছে বড় হ'ল! বুঝতে পারে না ঠিক, কিন্তু হীরককেই সে এখনও শ্রদ্ধা করে বুড়ির মধ্যে। রজতকেও করত, কিন্তু রজত বিয়ে করেছে, আর কোন আশা নেই তার কাছে, সেতারের তারগুলো এবার ঢিলে হয়ে যাবে ক্রমশ, দীপক রাগিণী আর আলাপ করা চলবে না তাতে। নন-ভায়োলেন্ট নন-কো-অপারেটার ছোটদার কথা মনে প'ড়েই হঠাৎ অনঙ্গকে মনে পড়ল তার। অনঙ্গের অঙ্গ নাকি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে রোজ জেলে চাবুকের চোটে… অনঙ্গ জেলের আইন মেনে চলবে না কিছুতে…এ কি ছেলেমানুষি তার, বার বার মার খাবে, তবু মানবে না! হঠাৎ মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল ইন্দু, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের নীচের ড্রয়ারটা টেনে অনঙ্গের ফোটোখানা বার ক'রে নির্নিমেষে চেয়ে রইল সেটার দিকে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, শার্লমেন, তৈমুর, চেঙ্গিস, নাদির শা বেঁচে থাকবে,

ক্লাইবও থাকবে, কিন্তু অনঙ্গ থাকবে না, এই কচি কিশোর অনঙ্গ মহাকালের আবর্ত্তে কোথায় তলিয়ে যাবে, কেউ তাকে মনে রাখবে না—যাদের জন্যে সে প্রাণ দিচ্ছে, তারাও না। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে—জল নয়—বিদ্যুৎ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হতে লাগল যেন।

গ

বাইরের ঘরে তখনও মহাভারত-পাঠ চলছিল।

স্বর্গ থেকে পতনোন্মুখ যযাতিকে সম্বোধন ক'রে তাঁর মর্ত্ত্যবাসী দৌহিত্র অষ্টক প্রশ্ন করছিলেন, "উক্ত উভয়বিধ ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রে কাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে?" যযাতি উত্তর দিচ্ছিলেন, "যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও আশ্রম-বিবর্জ্জিত এবং কামাচার-পরাঙ্মুখ তিনিই অগ্রে মুক্তিলাভ করেন এবং যথার্থ জ্ঞানী হইয়া পাপাচরণ করিলেও ধারাবাহিক সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পণ্ডশ্রম মনে করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করে, তাহার সেই ধর্ম্মাচরণ বিফল; কেবল ক্রূরতা মাত্র··"

এমন সময় সোম-শুভ্র এসে পৌঁছলেন।

সোম-শুভ্রের বয়স ছিয়াত্তরের কাছাকাছি হ'লেও তিনি মোটেই অসমর্থ হয়ে পড়েন নি। এখনও বেশ খাড়া আছেন। মুখে প্রাজ্ঞতার ছাপ পড়েছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এমন একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যও ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে যে, দেখলে ভয় করে না, সম্ভ্রম হয়। মাথাটি যেন বড় একটি কদমফুল, ছোট-ক'রে-ছাঁটা ধপধপে সাদা চুলে ভরতি। এতটুকু টাক পড়ে নি। গোঁফ-দাড়ি কামানো নিটোল মুখে কোথাও জরার চিহ্ন নেই। চোখের দৃষ্টি বেশ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। পরনে থান, সাদা লংক্লথের 'চায়না' কোট, পায়েও ধপধপে ক্যাম্বিসের ফিতাহীন জুতো। জুতোটির বিশেষত্ব আছে, ফরমাশ দিয়ে তৈরি করানো। সোম-শুভ্রকে দেখলেই মনে হয়, শুভ্রতার মর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি

যেন বিশেষ রকম সচেতন। মলিনতার সামান্যতম গ্লানিও যেন তিনি নিজের ত্রিসীমানায় আসতে দেবেন না। আপাদমস্তক সব ধপধপ করছে।

ঘরে ঢুকেই সোম-শুভ্র হেঁট হয়ে দাদার পদধূলি নিলেন। ভট্টাচার্য্য মশাইকে নমস্কার করলেন।

তুমি এসে পড়লে? নটা বেজে গেল নাকি?

পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে সোম-শুভ্র বললেন, নটা কুড়ি।

স্টেশনে কাউকে পাঠাতে পারি নি, নেপালী চাকরটা পালিয়েছে—

তারাপদ স্টেশনে ছিল।

ও, ছিল বুঝি! তাই বাজার থেকে ফিরতে এত দেরি তার।

সঙ্গে সঙ্গেই তারাপদ কাঁধে সোম-শুভ্রের বিছানার বাণ্ডিল ও হাতে বাজারের থলি নিয়ে ঢুকল। হংস-শুভ্রের কথার জবাবস্বরূপই বোধ হয় বললে, একা আর ক দিক সামলাই, বল। এবং প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রেখে ভেতরের দিকে চ'লে গেল হনহন ক'রে।

তারাপদ ও হংস-শুভ্র সমবয়সী। শুধু তাই নয়, সহপাঠীও। সেকালে শিব-শুভ্রের বাড়িতে ছোটখাট একটা পাঠশালা ছিল। শিব-শুভ্রের বাড়িতে খেয়ে এবং শিব-শুভ্রের নিকট বেতন নিয়ে একজন পণ্ডিত, শুধু হংস-শুভ্র এবং সোম-শুভ্রকেই নয়, পাড়ার সব ছেলেদের বিনা বেতনে পড়াতেন। কাউকে কোন খরচ দিতে হ'ত না। সেই পাঠশালায় তারাপদ হংস-শুভ্র এবং সোম-শুভ্রের সঙ্গে কিছু দিন পড়েছিল। সদ্‌গোপের ছেলে তারাপদর পড়া অবশ্য বেশি দূর অগ্রসর হয় নি, কিন্তু এই সুবাদে সে হংস-শুভ্র ও সোম-শুভ্রকে 'তুমি' এবং পরিবারের বাকি সকলকে অসঙ্কোচে 'তুই' বলে। তখন থেকেই সে একাধারে হংস-শুভ্রের বন্ধু এবং ভৃত্য, পার্শ্বচর এবং অনুচর। হংস-শুভ্র তার সমস্ত খরচ বহন করেন, সমস্ত আবদার সহ্য করেন। তারাপদও কম সহ্য করে নি—তার স্ত্রী মোক্ষদার সঙ্গে হংস-শুভ্রের যে সম্পর্ক ঘটেছিল, তাও সে সহ্য করেছিল, কিছু বলে নি। হংস-শুভ্র অবশ্য আর একটি সুন্দরী

মেয়ের সঙ্গে তারাপদর বিবাহ দিয়েছিলেন এবং আজীবন তার পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন ক'রে এসেছেন, তবুও এতটা কে সহ্য করতে পারত? হংস-শুভ্রের এই ধরনের অত্যাচার, শুধু একটা নয়, তারাপদ অনেক সহ্য করেছে। সেই ছেলেবেলাতেই যখন পাঠশালায় পড়ত, একটা সুন্দর পেন্সিল কুড়িয়ে পেয়েছিল। হংসকেই দিতে হ'ল সেটা শেষ পর্য্যন্ত। না নিয়ে কিছুতেই ছাড়লে না। তার বদলে পাঁচটা নতুন পেন্সিল কিনে দিলে অবশ্য, কিন্তু চ্যাপ্টা গোছের ওই পেন্সিলটা সে নিলে। কলকাতার বাজারে ওরকম পেন্সিল তখন পাওয়া যেত না, কোন সায়েবসুবোর পকেট থেকে প'ড়ে গিয়েছিল বোধ হয়। তারাপদ জানে, হংসের স্বভাবই ওই রকম, যখন যেটা ধরে সহজে ছাড়ে না, একেবারে চূড়ান্ত ক'রে তবে ছাড়ে। এখন ধর্ম্ম নিয়ে পড়েছে। র‍্যাংকিনের বাড়ির স্যুট ছাড়া যে এককালে আর কোন কিছু পরত না, সে এখন নামাবলী আর পাটের কাপড় প'রে ব'সে আছে। হয়তো কোন্‌দিন কমণ্ডলু নিয়ে ছাই মেখে বলবে, চললাম সংসার ছেড়ে। কিছুই বিচিত্র নয়। তারাপদর ধারণা, ঝোঁক চেপে গেলে হংস না করতে পারে এমন জিনিস নেই।

ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে সোম-শুভ্র ভেতরে চ'লে গেলেন।

মহাভারত পাঠ-আবার শুরু হ'ল।

"রাজা যযাতির এবম্প্রকার ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনি যুবা, মাল্যধারী, তেজস্বী এবং দর্শনীয়; কোন্ ব্যক্তি আপনাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? এবং আপনি কোথা হইতে—"

আগামী রবিবার দিনটা কেমন দেখুন তো, এই পাঁজি নিন।

মহাভারতের সম্ভবপর্ব্ব থেকে হঠাৎ গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকায় নীত হওয়াতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মানসিক অবস্থাটাও অনেকটা যযাতির মত হ'ল। তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

আজ্ঞে, কি বলছেন?

আগামী রবিবার দিনটা শুভদিন কি না দেখুন, সেদিন অন্নপ্রাশন দেওয়া চলতে পারে কি না!

মিনিট পাঁচেক দেখে ভট্টাচার্য্য অভিমত প্রকাশ করলেন, না, অত্যন্ত অশুভ দিন আগামী রবিবার।

হংস-শুভ্রের চোখ দুটো জ্ব'লে উঠল। কিন্তু তিনি চুপ ক'রে রইলেন। ভট্টাচার্য্য আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে পঞ্জিকাটি সন্তর্পণে মুড়ে রেখে পুনরায় যযাতির উপাখ্যান আরম্ভ করতে যাবেন, এমন সময় হংস-শুভ্র বললেন, আজ আর থাক।

আচ্ছা।

ভট্টাচার্য্য ধীরে ধীরে উঠে গেলেন।

অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের মত স্থির হয়ে ব'সে রইলেন হংস-শুভ্র।

ক্ষণকাল পরেই একটা সাদা প্লেট ফরসা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে তারাপদ প্রবেশ করতেই তিনি বললেন, পণ্ডিত মশাই চ'লে যাচ্ছেন, ডাক তো। ভট্টাচার্য্য আবার ফিরে এলেন।

অন্নপ্রাশনের একটা ভাল দিন দেখে দিন তো পণ্ডিত মশাই।

ভট্টাচার্য্য আবার পঞ্জিকার পাতা ওলটাতে লাগলেন। তারাপদ প্লেটটা মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে সে হংস-শুভ্রের দিকে যে দৃষ্টিটা নিক্ষেপ ক'রে গেল, তার অর্থ—আবার কি নিয়ে মাতলে তুমি? ছেলেটার অন্নপ্রাশনে বাগড়া লাগাচ্ছ নাকি?

খানিকক্ষণ পাতা উলটে ভট্টাচার্য্য বললেন, এর পরের বৃহস্পতিটা খুব ভাল দিন।

এর পরই হংস-শুভ্র যে প্রশ্নটি করলেন, তার জন্যে ভট্টাচার্য্য প্রস্তুত ছিলেন না।

আপনি যজ্ঞ করতে পারবেন?

আজ্ঞে?

আমার নাতির ছেলের অন্নপ্রাশন-অনুষ্ঠান রীতিমত হিন্দু পদ্ধতিতে করতে চাই। তাতে যজ্ঞ হোম ঠিক বৈদিক নিয়ম অনুসারে করতে হবে। আপনি কি অধ্বর্য্যু কিংবা অন্য কোন ঋত্বিকের কাজ করতে পারবেন?

ইতিপূর্ব্বে কখনও করি নি। তবে সাধারণভাবে বৃদ্ধি-টৃদ্ধি—

না, সাধারণভাবে হবে না। শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে করতে হবে। ভট্টাচার্য্য হংস-শুভ্রকে চিনতেন। চুপ ক'রে রইলেন।

কাশীতে খবর পাঠাতে হবে দেখছি। জিনিসপত্র যা যা লাগবে, তার একটা ফর্দ্দ কোথা পাই—

আজ্ঞে, তা আমি ক'রে দিতে পারব, বই আছে আমার কাছে।

বইটা আনুন তা হ'লে।

ব'লেই তিনি উঠে অন্দরের দিকে চ'লে গেলেন।

যাচ্ছিলেন সোম-শুভ্রের কাছে। যেতে যেতে হঠাৎ ছবি-ঘরের কপাটটা তাঁর চোখে পড়ল। প্রকাণ্ড তালাটা ঝুলছে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ।

তারাপদ!

তারাপদ এল।

এ ঘরটা খোল।

প্রকাণ্ড চাবির গোছাটা এনে তালাটা খুলে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল তারাপদ, হংস-শুভ্র বললেন, পণ্ডিত মশাই একটা ফর্দ্দ দেবেন, সেটা তুমি টুকে নাও গিয়ে।

কিসের ফর্দ্দ?

যজ্ঞের।

হংস-শুভ্র ঘরের ভেতর ঢুকে কপাটটা বন্ধ ক'রে দিলেন। বন্ধ দ্বারের দিকে চেয়ে তারাপদ সবিস্ময়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর চ'লে গেল।

ছবি-ঘরে অনেক দিন ঢোকেন নি হংস-শুভ্র। একটা ঘরকে 'ছবি-ঘর' নাম দিয়ে সেটাকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দান তিনিই করেছিলেন একদিন, বহুকাল পূর্ব্বে। মৃত পূর্ব্বপুরুষ ও আত্মীয়-স্বজনদের ছবিই শুধু নয়, অতীতের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত অনেক জিনিসও উত্তর দিকের এই ঘরখানিতে সযত্নে সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন তিনি। তারাপদকে বলেছিলেন, তুবেলা যেন ধূপধুনা দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় ঘরটা। তারাপদ অক্ষরে অক্ষরে তাঁর আদেশ পালন ক'রে যাচ্ছে, তিনি নিজেই বহুদিন ঘরটাতে ঢোকেন নি। হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের মহাসমুদ্রে অবগাহন ক'রে তাঁর মনে কিছুকাল থেকে এই প্রতীতি জন্মেছিল যে, যারা আত্মার অমরতায় আস্থাবান, মায়া-পাশ ছিন্ন ক'রে অখণ্ড অব্যক্ত পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও জীবের গত্যন্তর নেই ব'লে যাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক জীবকেই জন্মজন্মান্তরের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হয়ে অবশেষে সেই একই মহাসত্তায় মিশতে হবে এই যারা সত্য ব'লে মনে করে, তাদের পক্ষে এই নশ্বর জীবনের তু-চারটে স্মৃতির টুকরোকে আঁকড়ে থাকার অর্থ—সেই বিরাট প্রবাহকে অস্বীকার করা, যার খরস্রোতে, তারা জানে যে, পর্ব্বত সমুদ্রে এবং সমুদ্র মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। আজকের পর্ব্বতের প্রতিকৃতি নিয়ে কি হবে? ওটা তো ওর আসল রূপ নয়। নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল পরমাণুপুঞ্জের একটা বিশেষ মুহূর্ত্তের ছবি রেখে লাভ কি? নিত্য-চলমান বিশ্বজগতের পটভূমিকায় কল্পনানেত্রে দেখলে ওর স্বরূপ হয়তো দেখা যেতে পারে এবং তাই হয়তো সত্য দর্শন। বহুকাল তিনি ঢোকেন নি ঘরটাতে। আজ কিন্তু ওই বড় তালাটা চোখে পড়াতে তাঁর দার্শনিক মন হঠাৎ যেন ক্রীড়াপ্রবণ হয়ে উঠল। দর্শনের বিজ্ঞ অধ্যাপক অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সঙ্গে খেলার মাঠে নেমে যেন হুড়োহুড়ি ক'রে খেলতে উৎসুক হলেন।

ঘরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ে শিব-শুভ্রের বিরাট অয়েল-পেন্টিং ছবিখানা। হঠাৎ দেখলে রামমোহন রায় ব'লে ভুল হয়। সেই চোগা

চাপকান শামলা। হংস-শুভ্র পিতার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। যদিও ছবি ছবিই, তবু হংস-শুভ্রের মত দার্শনিকও মনে মনে কোন একটা প্রত্যাদেশের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন যেন ক্ষণকাল। বাচনিক কোন প্রত্যাদেশ এল না বটে, কিন্তু অনেক দিন আগেকার একটা ছবি ফুটে উঠল মনে। তাঁর আর সোম-শুভ্রের উপনয়নের ছবি। ভট্টপল্লী থেকে গৌরীকান্ত শিরোমণি এসেছিলেন, কাশী থেকে এসেছিলেন পণ্ডিত গোপীনারায়ণ। তা ছাড়া পুরোহিত, পণ্ডিত, শাস্ত্রী আরও অনেকে ছিলেন। বৈদিক মন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনিতে বিরাট মণ্ডপটা গমগম করছিল, এখনও তাঁর মনে আছে। বিরাট উৎসব হয়েছিল। সাত দিন সাত রকম। প্রথম দিন হিন্দু মতে—ব্রাহ্মণভোজন, যাত্রা, ভাগবত-পাঠ। দ্বিতীয় দিন মুসলমানী মতে—পোলাও-কাবাব-কোপ্তার খানা, বাইনাচ, মুশয়রা। তৃতীয় দিন সাহেবদের জন্য সাহেবী হোটেলে সাহেবী ফ্যাশানে ডিনার, ড্রিঙ্ক, ডান্স। চতুর্থ দিনে কাঙালী-ভোজন—লুচি, ভাত, ডাল, পোলাও, তরিতরকারি, মিষ্টান্ন—সব রকম, যে যত খেতে এবং নিয়ে যেতে পারে, অষ্টপ্রহরব্যাপী কীর্ত্তন হয়েছিল। পঞ্চম দিন কেবল মেয়েদের খাওয়ানো হয়েছিল, সেও ভূরি-ভোজন। পুরুষদের কোন সম্পর্কই ছিল না তার সঙ্গে। মেয়ে রাঁধুনী, মেয়ে পরিবেশনকারিণী, মেয়ে কীর্ত্তনিয়া, এমন কি মেয়ে-যাত্রা পর্য্যন্ত এসেছিল। ষষ্ঠ দিন কবির লড়াই, কবিদের সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছিল সেদিন। সপ্তম দিন হয়েছিল পালোয়ানদের কুস্তি, ওস্তাদদের গান, আর তাঁদের প্রত্যেকের ফরমাশ অনুযায়ী খাওয়ার ব্যবস্থা। কেউ খেলেন বাদামের হালুয়া, কেউ মহিষের কাঁচা দুধ, কেউ স্বপাক আলোচাল গাওয়া-ঘি, কেউ সিদ্ধির সন্দেশ, কেউ মধু আর ফলাহার করলেন কেবল, কেউ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে নিলেন নিজের হাতে।...হঠাৎ চাবুকটা নজরে পড়ল হংস-শুভ্রের। চামড়ার ওই হাণ্টারটা দিয়ে সিতাংশুকে খুব মেরেছিলেন তিনি একদিন অবাধ্যতার জন্য। হংস-শুভ্র ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ছবির ভিড়ের মধ্যে সিতাংশুর ছবিখানা খুঁজতে লাগলেন। ওই যে, হাসিমুখে চেয়ে আছে। ব্যারিস্টারের গাউনে কি সুন্দর মানাত ওকে! হিমাংশু সুধাংশুর ছবিও পাশাপাশি টাঙানো রয়েছে, কিন্তু সিতাংশুর দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তিনি। ছেলেটা দুষ্ট ছিল ব'লেই বোধ হয় বেশি ভালবাসতেন তাকে। যা ধরত, তা করত। তাঁর মতের বিরুদ্ধেই ব্যারিস্টারি পড়েছিল,

কিছুতেই আই. সি. এস. পরীক্ষাটা দিলে না। কিছুতেই সামলানো যেত না, একটা ঝড় যেন। ঝড় থেমে গেছে। হংস-শুভ্র এগিয়ে গিয়ে আর একটা অয়েল-পেন্টিংয়ের সামনে দাঁড়ালেন। দূরসম্পর্কের পিসীমা ভুবনমোহিনী দেবী। রক্তের দিক দিয়ে সম্পর্কটা দূর বটে, কিন্তু মনের দিক দিয়ে এই ভুবনমোহিনী একদিন হংস-শুভ্রের অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বহু-বিবাহের যুগে বহুপত্নীবান যে কুলীনের গলায় মালা দিয়ে ভুবনমোহিনী সীমন্তে সিঁদুর পববার অধিকার পেয়েছিলেন. তাঁর গৃহেই সেই ন বছর বয়স থেকেই বহু সপত্নী সমভিব্যাহারে তিনি এমন নিখুঁত রকম সুন্দর অনাড়ম্বর আত্মমর্য্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন ক'রে গেছেন যে, সে কথা ভাবলে হংস-শুভ্রের শির এখনও শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে হংস-শুভ্রের বাড়িতে আসতেন তিনি। প্রায় সমবয়সীই ছিলেন। হংস-শুভ্র অবাক হয়ে যেতেন তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর অনবদ্য রূপরাশি দেখে, প্রস্ফুটিত শতদল যেন। বেশি দিন বাঁচেন নি, ভরা-যৌবনেই মারা গেছেন। ইংরেজী-কেতায়-মানুষ হংস-শুভ্র তাঁর একগোছা চুল স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ কেটে রাখতে চেয়েছিলেন, ভুবনমোহিনী দেন নি। ভাগ্যে কিছু দিন পূর্ব্বে একটা ফোটো তুলে রেখেছিলেন, তাই এখনও তাঁর কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে। অনেক খরচ ক'রে সেই ফোটো থেকে এই ছবিখানা করিয়ে রেখেছেন তিনি। হংস-শুভ্র যখনই এ ছবিখানার কাছে এসেছেন মনে মনে প্রণাম করেছেন, আজও করলেন। হংস-শুভ্র এগিয়ে গেলেন। ছবির পর ছবি···কত ছবি! দামী গ্লাস-কেসে একখানা শাল রাখা ছিল, কাঞ্চনমালার শাল। সেখানার সম্মুখে দাঁড়ালেন খানিকক্ষণ। পাশেই কুন্দর গয়নার বাক্সটা রয়েছে, যাবার সময় কুন্দ গায়ের সমস্ত গহনা খুলে রেখে গিয়েছিল। তারপরই ভায়রাভাই রুদ্রবিলাস। এককালে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল লোকটার সঙ্গে, চমৎকার শেক্‌স্‌পিয়র আবৃত্তি করত। কবে ম'রে গেছে। শেক্‌স্‌পিয়রের নামটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের আরও কতকগুলো প্রিয় নাম মনে প'ড়ে গেল—মিল্টন, বেকন, লক, হিউম, অ্যাডাম স্মিথ, গিবন, রলিন্স···স্বপ্নের মত মনে হ'ল, বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের মত। এদের কারও সঙ্গেই আর জীবন্ত সম্পর্ক নেই, সমস্তই স্মৃতি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

এক

সোম-শুভ্র

ক

টেবিলের ওপর সাদা একখানি চাদর পাতা। তার ওপর কয়েকটা সাদা প্লেট। এক ধারে একখানি খবরের কাগজ বিছানো। সোম-শুভ্র একটি চকচকে কাঁচি দিয়ে পালংশাক কাটছিলেন। যে পাতাটি পোকায় খেয়েছে অথবা যেখানে সামান্যতম মলিনতার সংশ্রব আছে ব'লে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, তা তৎক্ষণাৎ কেটে বাদ দিয়ে খবরের কাগজে জমা করছেন। তিনি যা খাবেন, তা নিখুঁত রকম নির্ম্মল হওয়া চাই এবং সে বিষয়ে তাঁর মন এত বেশি রকম সজাগ যে, তিনি নিজের হাতেই সব করেন। পাশেই চাল এবং ডাল রয়েছে। ইন্দু সব বেছে দিয়েছে একবার, তবু তিনি আর একবার নিজে দেখে দেবেন। কয়েকটি আলু, আধখানা বাঁধাকপি, গোটা দুই বিলিতী বেগুন হাতে ক'রে ইন্দু ঢুকল। সোম-শুভ্র প্রসন্ন দৃষ্টি তুলে তার দিকে হাসি-মুখে চাইলেন।

গরম জলে ধুয়ে নিয়ে এলে? আচ্ছা, রাখ ওই প্লেট দুটোতে। আমার আর কিছু লাগবে না।

আপনার কুকারটা ঠিক ক'রে দিই?

সব আমি ক'রে নেব এখন, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

ইন্দু কোন উত্তর না দিয়ে আলু কপি আর বিলিতী বেগুনগুলো প্লেটে সাজিয়ে রাখতে লাগল। সোম-শুভ্র ক্ষণকাল ইন্দুর গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে থেকে যেন তার আবদার রক্ষা করছেন, এই ভাবে বললেন, আচ্ছা, বেশ, তুমিই কর আজ সব। কুকারের বাটিগুলো গরম জলে ধুয়ে নাও একবার তা হ'লে। আমার বেতের বাক্সটাতে জল মাপবার ছোট মগটা আছে।

ঠিক এক মগ জল লাগবে ঝরঝরে ভাত হতে। ডালে এক মগের কম দিলেও চলবে, পাতলা ডাল পছন্দ নয় আমার। হাসলেন একটু। ইন্দুর মুখেও সামান্য একটু হাসির আভাস ফুটে উঠল। সে কুকারটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সোম-শুভ্র পালংশাক কাটা শেষ ক'রে চাল বাছতে লাগলেন।

যৌবনকালে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন ব'লেই নয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন ব'লে বাধ্য হয়ে স্বাবলম্বী হতে হয়েছে তাঁকে। সেকালে ব্রাহ্মরা গোঁড়া হিন্দুদের কাছে প্রায় অস্পৃশ্যই ছিলেন। পরিচয় জানতে পারলে হিন্দু রাঁধুনী পর্য্যন্ত থাকতে চাইত না। সোম-শুভ্র কখনও কারও কাছে নিজের পরিচয় গোপন করেন নি। ব্রাহ্মদের কাছে গিয়ে সহানুভূতি আকর্ষণ করতেও তাঁর আত্মসম্মানে বেধেছিল; অপরিচ্ছন্ন চাকরের হাতে খেতে তাঁর চিরকালই অপ্রবৃত্তি, সুতরাং স্বপাক আহারেই অভ্যস্ত হতে হয়েছে তাঁকে। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়েছিল, এখন কিন্তু এমন হয়েছে যে, অপরে রেঁধে দিলে তৃপ্তিই হয় না। সুরেশ্বরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনেক পরে হয়েছিল; ইকমিক কুকারও অনেক পরের কথা। সে যুগে সনাতন প্রথাতেই পিতলের বোকনোতে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খেতেন তিনি। নিজে হাতে রেঁধে খেতে হ'ত ব'লে তরকারি খাওয়ার অভ্যাসটা প্রায় নেই বললেই হয়,—তরি-তরকারি যা খান, তা হয় কাঁচা, না হয় সিদ্ধ। শরীরের জন্যে আর যা দরকার, তা পূরণ করেন দুধ দিয়ে। চাষবাস নিয়েই ছিলেন, সুতরাং গরুর অভাব হয় নি কখনও। তারপর অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে—বিহার-অঞ্চলে নিজের আস্তানাই গ'ড়ে উঠেছে একটা—বন্ধুবান্ধবেরও অভাব হয় নি পরে—সুরেশ্বরদের সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতাই হয়েছিল—ইচ্ছে করলে অন্যভাবেও তিনি আহারের ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু স্বপাক ত্যাগ করেন নি তিনি। যে স্বাধীন মনোভাব তাঁকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল, সেই স্বাধীন মনোভাব তিনি বরাবর বজায় রেখেছেন। কখনও কোনও কারণে কারও অধীনতা স্বীকার করেন নি। বাল্যকালে হংস-শুভ্রের সঙ্গে বিলাসের কোলেই

লালিত-পালিত হয়েছিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছাবৃত আদর্শের জন্য অশেষ প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয়েছে তাঁকে জীবনে। সে আদর্শ স্বাধীনতারই আদর্শ। বিদেশী রাজা আমাদের দেশ দখল করেছে ব'লে প্রাণ-মনও তাদের পায়ে সঁপে দিতে হবে, এই হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেই তাঁর বিদ্রোহ। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের হিড়িকে সবাই যখন সাহেবদের নকল করতে ব্যস্ত, তখন তাঁর সবচেয়ে শ্রদ্ধা হয়েছিল সেই মহাপুরুষটির প্রতি, যিনি সে যুগে মিশনারিদের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন, হিব্রু আর গ্রীক অধ্যয়ন ক'রে প্রচলিত বাইবেলের ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, শাস্ত্র ঘেঁটে হিন্দুধর্ম্মের কীর্ত্তিকলাপ প্রচার করেছিলেন, পৌত্তলিকতাই যে হিন্দু-ধর্ম্মের শেষ কথা নয়, তা উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। রামমোহনের মনীষাই নয়, তাঁর নির্ভীকতা, তাঁর আত্মসম্মান-বোধ বেশি মুগ্ধ করেছিল সোম-শুভ্রকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও কম মুগ্ধ করেন নি। সে যুগে সকলেই যখন বিলাসের তীব্র স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তখন ওই ধনীর দুলালের সত্য-অনুসন্ধিৎসা, বিষয়ে বীতরাগ, পাশ্চাত্য সভ্যতার জারক প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস সত্যই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। মহর্ষি নিজেই যে স্বাধীনচিত্ত ছিলেন তা নয়, অপরের স্বাধীনতার ওপর তিনি জোর ক'রে কখনও হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না। তাই তাঁর প্রিয় শিষ্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যখন মতবিরোধ হ'ল, তখন নিজের মতে নিজের পথেই চলতে দিলেন তিনি তাঁকে। নিজেরও আদর্শ পরিবর্ত্তন করলেন না, তাঁকেও পরিবর্ত্তন করবার জন্যে জবরদস্তি করলেন না। তাঁর সহধর্ম্মিণীকেও তিনি পৌত্তলিকতা থেকে জোর ক'রে বিরত করতে চেষ্টা করেন নি। তাঁর এই স্বাধীনতা-নিষ্ঠা যদিও সোম-শুভ্রের মনকে খুবই নাড়া দিয়েছিল, তবু তিনি আদি-ব্রাহ্ম-সমাজে ঢোকবার চেষ্টা করেন নি, তার কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল, স্বাদেশিকতার ছদ্মবেশে সে সমাজে যে সনাতনী মনোবৃত্তি তখনও ওতপ্রোত হয়ে ছিল, তা ঠিক সংস্কারমুক্ত মনোবৃত্তি নয়। উপবীতধারী

ব্যক্তি-মাত্রকেই ব্রাহ্মণত্বের মর্য্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। কেশব সেনের অতি-প্রগতিশীল আন্দোলনেও তাঁর চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয় নি, তা যেন বড্ড বেশি পাশ্চাত্য-ঘেঁষা ছিল। যদিও তিনিও মিশনারিদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন, তাঁর 'সুলভ সমাচার' যদিও স্বদেশী ভাবই উদ্দীপ্ত করত তখন সকলকার মনে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি যেন যীশুখ্রীষ্টেরই ভক্ত হয়ে পড়লেন। যীশুখ্রীষ্টের ওপর কারও বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু দেশে তখন 'স্বদেশী' ভাব জেগেছে—বেদান্ত উপনিষদ ছেড়ে বাইবেলের ব্যাখ্যা শোনবার প্রবৃত্তি ক'মে আসছিল শিক্ষিত যুবকদের। দেশী কুসংস্কার এবং পাশ্চাত্য-বিহ্বলতা—এই উভয়েরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁর। তাই হংস-শুভ্র যখন মেতেছিলেন সুরেন বাঁড়ুজ্যের দলে, সোম-শুভ্র তখন দীক্ষা নিচ্ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে দীক্ষা নিচ্ছিলেন ব'লে যে, মহর্ষির দলের ওপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তা মোটেই নয়। নবগোপাল মিত্রের এবং রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবোধ তখন কোন্ যুবকের প্রাণে সাড়া না জাগাত! নবগোপাল মিত্রের নামই ছিল 'ন্যাশনাল' মিত্তির। তাঁর কাগজের নাম ছিল 'ন্যাশনাল পেপার'। তাঁর হিন্দুমেলায়, শঙ্কর ঘোষের লেনে তাঁর কুস্তির আখড়ায় সে যুগে কে না গেছে! সেই কুস্তির আখড়ায় সোম-শুভ্রও লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা, তরোয়াল-খেলা শিখেছিলেন একদিন। লর্ড লিটন আসবার পর অবশ্য থেমে গেল সেসব। কেশব সেনের বক্তৃতা শুনতেও সাগ্রহে যেতেন তিনি। যেতেন না কেবল 'পলিটিকাল' সভায়। সেকালের বক্তৃতা-মুখর পলিটিকাল আন্দোলনে তাঁর প্রাণ ঠিক সাড়া দিত না। তাঁর মনে হ'ত, সাহেবী পোশাক প'রে বিলিতী মদ খেয়ে সভায় সভায় সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের লম্বা বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি, যদি কার্য্যত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সে সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের মর্য্যাদা আমরা না দিতে পারি? আমাদের নিজেদেরই সমাজে যখন জাতিভেদের অসাম্য, স্ত্রীলোকদের পরদা সরিয়ে দেবার সাহস নেই,

কুসংস্কারের পঙ্কে সমস্ত দেশ যখন পঙ্কিল, ভ্রাতৃবিরোধই যখন সমাজের প্রাত্যহিক ঘটনা, তখন সেখানে নিজেরা সেসব দূর করবার চেষ্টা না ক'রে বক্তৃতা করলেই কি দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে? স্বায়ত্ত-শাসন তিনিও কাম্য মনে করতেন, কিন্তু তার চেয়েও তিনি বেশি কাম্য মনে করতেন স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা অর্জ্জন করাকে। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তিনি, তাই এ কথাটা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এড়ায় নি যে, জনসাধারণ কর্ত্তৃক জনসাধারণের হিতের জন্য যে শাসনবিধি আমরা চাইছি, তা কখনও স্থায়ী হবে না, জনসাধারণ যদি তার উপযুক্ত না হয়। নিজের চিত্ত স্বাধীন না হ'লে সত্যিকার স্বাধীনতা কে দিতে পারে? সমাজের পায়ে অসংখ্য কুসংস্কারের শৃঙ্খল আমরা নিজেরাই পরিয়ে রেখেছি, অথচ তার অগ্রগতির জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি বিদেশী বড়লাটকে। এই হাস্যকর ব্যাপারে তাঁর মন কখনও সাড়া দেয় নি। তাই তিনি কংগ্রেস-সভায় বিদ্রোহমূলক বক্তৃতা করবার চেষ্টা না ক'রে সত্যি সত্যি বিদ্রোহ করেছিলেন সমাজের বিরুদ্ধে। প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে তাঁর পৌরুষ যেন কৃতার্থ হয়েছিল। ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের জন্যে তিনি ব্রাহ্ম হন নি, ব্রাহ্মধর্ম্ম সে যুগে বিদ্রোহের প্রতীক ছিল ব'লেই তিনি সে ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আসলে তিনি বিদ্রোহী ছিলেন। কোন গণ্ডির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তিনি যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি, তার প্রমাণ, ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যেও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেন নি। সে সমাজেরও নানা কুসংস্কার নানা গোঁড়ামি তাঁর মনকে পীড়িত করত। শেষকালে সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল অধিকাংশ ব্রাহ্মদের 'হামবড়া' ভাব। মুখে যদিও সকলে বিনয়ের অবতার ছিলেন, কিন্তু আচারে-ব্যবহারে কথায়-বার্ত্তায় তাঁরা এমন ভাব প্রকাশ করতেন অব্রাহ্ম হিন্দুদের সম্পর্কে যে, সোম-শুভ্রের লজ্জা করত। কারও সঙ্গে খাপ খায় নি ব'লেই তিনি পালিয়েছিলেন বাংলা দেশ ছেড়ে বেহারের দেহাতে, এবং সেখানেই স্কুল ক'রে হাসপাতাল ক'রে নিজের আদর্শ জীবন যাপন করবার

চেষ্টা করেছিলেন এতকাল। এক সময়ে তিনি ভেবেছিলেন যে, বেহার অঞ্চলে অনেকখানি জমি কিনে নির্য্যাতিত ব্রাহ্মদের জন্যে একটা উপনিবেশ স্থাপন করবেন, অনেকেই তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করার জন্যে নির্য্যাতিত হতেন। অনেককে সাহায্য করতেন তিনি। ভেবে-চিন্তে উপনিবেশ স্থাপন করবার বাসনা ত্যাগ করেছিলেন তিনি শেষকালে। ভেবে দেখলেন, এতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হওয়া সম্ভব। বহু-সম্প্রদায়-বিভক্ত এই দেশে আর একটা সম্প্রদায় বাড়ালে বিরোধের আর একটা বীজ বপন করা হবে মাত্র। এটা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এড়ায় নি যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটা প্রত্যঙ্গ—ওটাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পৃথক করবার চেষ্টা করা অনুচিত। ওর যেটুকু ধর্ম্ম সেটুকু সনাতন হিন্দুশাস্ত্র থেকেই নেওয়া, আর ওর যেটুকু ঢং সেটুকু বিদেশী জিনিস। উপনিবেশ স্থাপন করলে অনিবার্য্যভাবে সেই ঢংটুকুকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। নিছক ধর্ম্মচর্চ্চার জন্যে আলাদা উপনিবেশ স্থাপন করবার প্রয়োজন নেই। সমাজ-সংস্কার করতে গেলে সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবার চেষ্টা করাই ভাল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পর হয়ে যেতে হয়, তাতে লাভ হয় না, লোকসান হয়। তা ছাড়া আর একটা কথাও মনে হয়েছিল তাঁর। ধর্ম্মের জন্যে, আদর্শের জন্যে কষ্টস্বীকার না করলে ঠিক যেন মূল্য দেওয়া হয় না তার। সুতরাং উৎসাহী ব্রাহ্ম-হিতৈষী হিসাবে ব্রাহ্ম-সমাজে তাঁর খুব খাতির ছিল না। বন্ধু সুরেশ্বর ছাড়া আর কারও সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠও ছিলেন না তিনি। বেহারের যে অংশে তিনি জমি কিনেছিলেন, তা নেহাতই দেহাত—রেল-স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে—মেশবার মত বাঙালীও কাছে-পিঠে ছিল না বড় একটা। বেহারী জনমজুর, বেহারী চাকর-গোমস্তা, স্কুল, হাসপাতাল আর চাষবাস নিয়েই থাকতেন তিনি। বই প'ড়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন। বাংলা দেশের সঙ্গে যোগ ছিল বাংলা সাহিত্যের মারফত। বাংলা ভাষার প্রত্যেক লেখককে তিনি চিনতেন। সাহিত্য ছাড়া তাঁর আর একটি শখ ছিল, তা

বাগানের—শুধু ফলের নয়, ফুলেরও। প্রকৃতির কোলেই কেটেছে সারাটা জীবন। তাই কোন বিষয়ের কোন গোঁড়ামিই তাঁর মনকে আবিল ক'রে তোলে নি। তিনি মনের শুভ্রতা সত্যিই বজায় রাখতে পেরেছিলেন। বিবাহ করেন নি, কোন স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসেন নি, মিথ্যা কথা বলেন নি, হীন কাজ করেন নি কখনও কোনও রকম। তাঁর মনের আর একটা অবলম্বন ছিল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। কলেজ-জীবনে আর্টের চেয়ে বিজ্ঞানের প্রতিই বেশি ঝোঁক ছিল তাঁর, বিশেষ ক'রে উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রতি। উদ্ভিদ-জীবনের গহন রহস্যে নানা তত্ত্ব অনুসন্ধান ক'রে দিনের পর দিন তিনি কাটিয়েছেন। যশোলিপ্সা থাকলে তাঁর ওই সব অপূর্ব্ব, অদ্ভুত এবং অনেক সময় আজগুবি গবেষণা ছাপিয়ে তিনি নাম করতে পারতেন, কিন্তু সেসব দিকে লক্ষ্য ছিল না তাঁর। সত্যকে সন্ধান করবার যে আনন্দ, সেই আনন্দেই মশগুল থাকতেন, সেসব লিপিবদ্ধ ক'রে কাজে লাগাবার খেয়াল কখনও হয় নি। এমনও হয়েছে যে, তাঁর কল্পনা, তাঁর গবেষণা অনেক পরে অন্য বৈজ্ঞানিকের যশের কারণ হয়েছে, কিন্তু সেজন্য কখনও ক্ষুব্ধ হন নি তিনি, আনন্দিতই হয়েছেন।' গাছেরও যে অনুভূতি আছে—এ কথা জগদীশচন্দ্রের বহুপূর্ব্বে তাঁর মাথায় এসেছিল। জগদীশচন্দ্র, ঠিক তাঁর সহপাঠী না হ'লেও, সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যখন উদ্ভিদের অনুভূতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলেন, তখন সোম-শুভ্র নিজের কল্পনাকে একজন বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় মূর্ত্ত দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। গাছের অনুভূতিই নয়, গাছ বিষয়ে নানা উদ্ভট কল্পনা আছে তাঁর। তাঁর ধারণা, পশুপক্ষীরাই শুধু যে মানুষের অনুরাগ-বিরাগ বুঝতে পারে তা নয়, গাছেরাও পারে। গাছকে ভালবাসলে সে হৃষ্ট হয়, ঘৃণা করলে ক্লিষ্ট হয়। বায়লজিস্টরা গাছকে জীব-জগতের নিম্নতম স্তরে স্থান দিয়েছেন গাছের পূর্ণ পরিচয় এখনও ঠিকমত পান নি ব'লে। ঘোড়ার শরীরে ডিপ্‌থিরিয়া এবং টেটানাস ঢুকিয়ে যখন প্রতিষেধক অ্যান্টিটক্‌সিন তৈরি করা সম্ভব হ'ল, তখন সোম-শুভ্রের মনে হ'ল, গাছের

শরীরেও যদি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে গাছও হয়তো প্রতিষেধক কোনও ঔষধ প্রস্তুত করতে পারে। যে গাছ জীব-জগতের এত আহার এবং ঔষধ যোগাচ্ছে, তার পক্ষে এও অসম্ভব না হতে পারে। এই সব নিয়ে তাঁর কল্পনা-বিলাসের অন্ত নেই। এই সম্পর্কেই বিশেষ ক'রে তিনি এবার কলকাতায় এসেছেন।

হংস-শুভ্র এসে প্রবেশ করলেন। উঠে দাঁড়ালেন সোম-শুভ্র।

ব'স ব'স। একটা কথা জানতে এলাম। শঙ্খর ছেলের অন্নপ্রাশনের খবর পেয়েছ তুমি ?

হ্যাঁ, দু তরফ থেকেই পেয়েছি। শঙ্খর শ্বশুরবাড়ি থেকেও নিমন্ত্রণ করেছেন আমাকে। আগামী রবিবারে তো ?

রবিবারে হবে না। ছুটির দিন দেখে অন্নপ্রাশন হয় না, শুভদিন দেখে হয়। পরের সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ভাল দিন আছে, সেই দিনই ঠিক করছি। তুমি থাকতে পারবে তো ? প্রায় দিন দশেক পেছিয়ে গেল।

পারব।

তা হ'লে তো ভালই হ'ল, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা হচ্ছিল। মৃগাঙ্ককেও চিঠি লিখে দিই তা হ'লে, তার এখন বম্বে যাওয়ার দরকার নেই। কংগ্রেসের একটা মীটিঙে ও না গেলে দেশোদ্ধার আটকে থাকবে না। সবাই দেশোদ্ধার করতেই মত্ত—নিজেকে উদ্ধার করা যে আগে দরকার, তা কেউ বুঝবে না।

হীরক এবং রজতের মুখ তাঁর মনে পড়ল। তাঁর এই পৌত্র দুটির জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তাঁর। ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে আজকাল ভাবাই ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। হীরক জেলে ; রজতের পেছনে নাকি এখনও পুলিস ঘুরছে, এত খরচ করা সত্ত্বেও। রজতের সম্বন্ধে একটা যা ভরসার কথা, ছোকরা প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করেছে। মেয়েটাও নেহাত তুচ্ছ করবার মত নয়, কালো চোখের চাউনিতে আলো আছে। কাজলের

ঢলঢলে মুখখানা মনে পড়ল। মুখে যদিও কিছু বলেন নি তিনি, কিন্তু এক নজর দেখেই এই নাত-বউটিকে ভারী পছন্দ হয়েছিল তাঁর। রজত কি একে ফেলে পালাতে পারবে? কিন্তু রজত সব পারে। একটুও মুখবিকৃতি না ক'রে কুইনিন-মিক্শ্চার খেয়ে বাজি জিতেছিল একদিন ছেলেবেলায়। ট্রেন ফেল ক'রে তুমুল বৃষ্টিতে হেঁটে এসেছিল কেবল কথা রাখবার জন্যে। সব পারে। আজকালকার এই ডাকাত ছেলেগুলোর অসাধ্য কিছু নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ মনে হ'ল, এর আগে এ দেশে এ রকম ছেলে ছিল কি? ক্ষুদিরাম? কানাইলাল?—বারীনের নামটা মনে পড়তেই মনটা খিঁচড়ে গেল হঠাৎ। না—না…হঠাৎ নজরে পড়ল, সোম-শুভ্র তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

আত্মস্থ হয়ে বললেন, ও, আচ্ছা, তুমি থাকছ তা হ'লে। দেখ, ভাবছি, এই বোধ হয় আমার জীবনের শেষ কাজ, একটু ভাল ক'রেই করব। কাশী থেকে ভাল পুরোহিত আনিয়ে রীতিমত যজ্ঞ ক'রে, বুঝলে—

উৎসাহভরে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন, সোম-শুভ্র চাল বাছছেন—ইতিপূর্ব্বে আরও দু-একবার দেখেছেন, তবু মেজাজটা বিগড়ে গেল নতুন ক'রে। গমনোদ্যত হয়ে বললেন, আচ্ছা, বিকেলে সব কথা হবে এখন।

বিকেলে আমি কলকাতা যাব ভাবছি।

ও, আচ্ছা।

একটু দ্রুতপদেই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সোম-শুভ্র প্রশান্তভাবে চাল বাছতে লাগলেন। মিনিট দুই পরে একটা কাচের কুঁজো হাতে ক'রে তারাপদ প্রবেশ করলে।

এই দেখ, তোমার মনোমত হয়েছে কি না। তিন বার ধুয়েছি।

কুঁজোটা তুলে ধরলে। সোম-শুভ্র ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে দেখলেন খানিকক্ষণ,

তারপর বললেন, এখনও ময়লা ভাসছে। থাক, রেখে দাও তুমি, আমি নেব ঠিক ক'রে এখন।

কোথা ময়লা, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না বাপু!

আবার বেরিয়ে গেল তারাপদ। একটু পরেই আবার জল-ভরতি কুঁজো নিয়ে ঢুকল।

নাও, দেখ।

সোম-শুভ্র দেখে বললেন, রেখে দাও। তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, রেখে দাও না, আমি সব ঠিক ক'রে নেব।

তা তো নেবে। কিন্তু ওদিকে বড় কর্ত্তা যদি টের পায় যে, তুমি নিজে সব ঠিক ক'রে নিচ্ছ, তা হ'লে আর আস্ত রাখবে না আমাদের কাউকে। তোমাদের বংশে রাগটি তো কারও কম নয়, নেপালী চাকরটাকে এমন খড়ম ছুঁড়ে মারলে সেদিন যে—

তারাপদ!

হংস-শুভ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ওই শোন। এখন কলকাতা ছুটতে হবে আমাকে। অন্নপ্রাশনের তারিখ-ফারিখ সব উল্টে দিয়ে ব'সে আছে। যজ্ঞ হবে। বাণীকণ্ঠকে তার করা হয়ে গেছে।

বাণীকণ্ঠ কে?

এ বাড়ির তোমরা কেউ চেন না তাকে। ওর এক গ্লাসের ইয়ার ছিল আগ্রায়। চমৎকার সারেঙ্গ বাজায়, এই তার গুণ।

তারাপদ!

উচ্চতর গ্রামে হংস-শুভ্রের ডাক শোনা গেল আবার।

আমি যাই। ইন্দু রইল, সে সব ঠিক ক'রে দেবে।

তারাপদ!

তারাপদ চ'লে গেল। কুকারের বাটিগুলি গরম জলে সাবান দিয়ে ধুয়ে

একটা ফরসা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে ইন্দু প্রবেশ করলে একটু পরে।

চালগুলো ধুয়ে আনি?

আন, ছাড়বে না যখন।

ইন্দু নিখুঁত নিপুণতা সহকারে বাছা চালগুলি গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সোম-শুভ্র ডালে মন দিলেন।

খ

সোম-শুভ্র কলকাতায় এলে পরমানন্দের বাসাতেই ওঠেন। শশাঙ্কের বাসায় উঠতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয় তাঁর। বাসন্তী এ নিয়ে অনেক অনুযোগ করেছে, কিন্তু তবু তিনি ওঠেন নি। শঙ্খ রজত হীরক—এদের কাউকে তিনি চেনেন না। শশাঙ্ককে চেনেন, কিন্তু— এই 'কিন্তু'টা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তিনি। অন্নপ্রাশনের দিনে যেতে হবেই, ভিড়ে গোলমালে কেটে যাবে কোন প্রকারে, এই ভরসা।

পরমানন্দ এবং অনামিকাকে আগে থাকতেই খবর দিয়েছিলেন। খবর না দিয়ে কোথাও যান না তিনি। পরমানন্দ এবং অনামিকা বিকেলে বেরিয়ে পড়ে সাধারণত। কোন মহদুদ্দেশ্যে নয়, আড্ডা দিতে যায়। পরমানন্দ যায় নবকুমারের বাড়িতে, অনামিকা ইলার। পরমানন্দের চাকরি হয়েছে, নবকুমারের হয় নি। নবকুমার 'অধরা' নামক মাসিক-পত্রিকার অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক। অনামিকার বিয়ে হয়েছে, ইলার হয় নি। ইলাও বিনা বেতনে শিক্ষয়িত্রীগিরি করেন সদ্য-স্থাপিত একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে। পরমানন্দ নবকুমার শুধু যে এক জাতের লোক তা নয়, এক ধাতেরও। দুজনেই নোট-বই মুখস্থ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জ্জন করেছে, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণও করেছে, কিন্তু একজনও ঠিক ব্রাহ্মণ-প্রকৃতির

নয়। স্থলভ সংস্করণের নানা পুস্তকের দৌলতে দুজনেই—বিশেষ ক'রে নবকুমার—আধুনিক জগতের অনেক সংবাদ রাখে। ফড়ফড় ক'রে অনেক কিছু আউড়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারে সাধারণ যে কোন লোককে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ওরা ঠিক 'ব্রাহ্মণ' নয়, এমন কি শিক্ষিতও নয়। ওরা ভারবাহী মাত্র। ওরা নানা বই থেকে নানা সংবাদ সংগ্রহ ক'রে চতুর্দ্দিকে আস্ফালন ক'রে বেড়ায় নিজেদের জাহির করবার জন্যে এবং সেটাও নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে। শিক্ষাটা মনে প্রবেশ করলে যে সঙ্কোচ, যে দ্বিধা, যে বিনয় আত্মপ্রচারে বাধা সৃষ্টি করে, তা এদের নেই, এবং নেই ব'লেই যেন এরা গর্ব্বিত। অনামিকা ইলারও সেই দশা। লোক-দেখানো শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষিত হয় নি। মনোজগতের নয়, বস্তুজগতের স্থখ-স্থবিধা আহরণের জন্যেই ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছে সর্ব্বদা নানা ভাবে নিজেদের ঢাক পিটিয়ে।

তবু সোম-শুভ্র এদের কাছেই আলোচনা করবেন ঠিক করেছিলেন। যদিও তিনি পরমানন্দকে মানুষ করেছেন এবং নিজে পছন্দ ক'রেই অনামিকার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছেন, তবু এদের যে তিনি ঠিক চেনেন না, তা তিনি নিজেও বুঝতেন। আজকাল কোন ছেলেকে 'মানুষ' করা মানে, তার জন্যে মাসে মাসে নিয়মিতভাবে কিছু অর্থ ব্যয় করা। সে সত্যিই মানুষ হচ্ছে কি না, তা নির্দ্ধারণ করা সত্যিই প্রায় অসম্ভব। পছন্দ ক'রে বিয়ে দেওয়াটাও অনেকটা ওই জাতীয় অসম্ভব ব্যাপার। যে মেয়েটিকে পছন্দ করা যায়, সে সত্যিই পছন্দসই কি না, তা এক নজর দেখে বা সামান্য একটু-আধটু খবর নিয়ে বোঝা শক্ত। এসব জানা সত্ত্বেও সোম-শুভ্র এদের কাছেই নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে আলোচনা করবেন ঠিক করলেন, তার কারণ, যৌবনের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন, অসম্ভব এবং আজগুবি কল্পনা পরিহাসের পরিবর্ত্তে স্বপ্ন উদ্রিক্ত করতে পারে কেবল যৌবনের মনেই। যৌবনের প্রতি তাঁর এই আস্থার গভীরতা এত অধিক

ছিল যে, আধুনিক ছেলে-মেয়েদের চপলতা, বিলাসপ্রবণতা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি বেচালকেও তিনি সহ্য করতেন। মনে করতেন, প্রাণের জীবন্ত প্রবাহ স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের তৈরি কৃত্রিম গণ্ডি অতিক্রম ক'রে যায় মাঝে মাঝে। চিরকালই যায়। ও নিয়ে বেশি বিচলিত হয় তারাই, যারা সত্যকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। তবে এটাও ঠিক যে, তিনি বেচাল পছন্দ করতেন না, সভ্যসমাজের রীতিনীতি মেনে চলাটাই ভাল লাগত তাঁর, নিজেও মেনে চলতেন। জীবন্ত প্রাণের আবেগকে স্বীকার করতেন ব'লেই তার দুর্দ্দমনীয়তাকেও মানতেন। এই আবেগকে শুধু যে মানতেন তা নয়, এর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁর।

জীবনের ছিয়াত্তর বছর যখন পূর্ণ হ'ল, এবং হঠাৎ যখন তাঁর পুরাতন ভৃত্য ঝকৃস্থ সন্ন্যাস-রোগে মারা গেল এক ঘণ্টার মধ্যে, তখন তাঁর মনে হ'ল, জমা-খরচ মিলিয়ে জীবনের হিসাব-নিকাশ এবার ঠিক ক'রে ফেলা উচিত। যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁরও মৃত্যু হতে পারে। বিবাহ করেন নি, উত্তরাধিকারী কেউ নেই। দশ লক্ষ টাকার যে পৈত্রিক সম্পত্তি তিনি পেয়েছিলেন, তা থেকে কিছুই তিনি প্রায় খরচ করেন নি। হাজার দশেক টাকা খরচ ক'রে জীবনের প্রথম ভাগে তিনি সস্তায় যে দুশো বিঘে জমি কিনেছিলেন, তা থেকে শুধু তাঁর ভরণ-পোষণ নয়, অনেক উদ্বৃত্তও হয়েছে। স্কুল এবং হাসপাতাল চালাতে কিছু খরচ হয়েছে অবশ্য, বন্ধুবান্ধবরাও মাঝে মাঝে নিয়েছেন কিছু, শশাঙ্ককে কিছু দিয়েছিলেন একবার, পরমানন্দর জন্যেও কিছু গেছে, কিন্তু তবু এখনও সবসুদ্ধ ত্রিশ লক্ষ টাকা তাঁর ব্যাঙ্কে জমা আছে। এ টাকাটার একটা সুব্যবস্থা করা দরকার। এ ছাড়া তাঁর যেসব গবেষণা-মূলক অদ্ভুত কল্পনা আছে, সেগুলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মূর্ত্তি দেবার চেষ্টা করাও উচিত—সম্ভব হ'লে যন্ত্র-সহযোগে সেসবের যাথার্থ্যও প্রমাণ করতে হবে। এই সম্পর্কে তাই তিনি পরমানন্দ এবং অনামিকাকে চিঠি লিখেছিলেন যে, তারা যেন তাদের দু-একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনে

বুধবার সন্ধ্যায়, সেই দিন তিনি কলকাতায় পৌঁছবেন এবং তাদের সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ে দু-একটা আলোচনা করবেন। পরমানন্দ অনামিকা তাই সেদিন আড্ডা দিতে না গিয়ে নবকুমার ইলাকেই নিমন্ত্রণ করেছিল নিজেদের বাড়িতে। নবকুমার কাগজের সম্পাদক, সবজান্তা, সবাইকে তাক লাগিয়ে কথা বলে। ইলা বি. এস-সি. পড়েছিল, তারও বৈজ্ঞানিক হতে বাধা নেই।

সোম-শুভ্র ঠিক সময়ে এসে পৌঁছলেন এবং পরমানন্দ, অনামিকা, নবকুমার, ইলার সম্মুখে এমন স-সঙ্কোচে তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধটি পাঠ করলেন যে, যেন তিনি বিশ্ববিখ্যাত কোন বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্মুখে কতকগুলি হাস্যকর উদ্ভটতার অবতারণা ক'রে ধৃষ্টতা প্রকাশ করছেন।

পরমানন্দ অনামিকা সোম-শুভ্রের কাছে নানা ভাবে উপকৃত। এমন কি তাদের আশাও আছে যে, হয়তো সোম-শুভ্র তাদেরই তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ক'রে যাবেন। সুতরাং সোম-শুভ্রের যে কোন প্রকার অদ্ভুত আচরণই তারা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তারাও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল (নবকুমার ইলার কাছে) যখন তিনি অবিচলিত গাম্ভীর্য্য সহকারে ব্যক্ত করলেন যে, গাছেরাও মানুষের মতই কথা কয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করে। তাঁর মতে আমরা যাকে 'মর্ম্মর' বলি, তা ঠিক একই ধরনের ধ্বনি নয়। বিভিন্ন গাছেরই মর্ম্মর যে বিভিন্ন তাই শুধু নয়, একই গাছের বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ঋতুতে মর্ম্মরধ্বনি বিভিন্ন—এ তিনি লক্ষ্য করেছেন। বাতাসের গতি-বেগ এবং পত্রের আকৃতির ওপরই মর্ম্মরধ্বনি প্রধানত নির্ভর করে তা তিনি জানেন, কিন্তু এ-ও তিনি অনুভব করেছেন এবং তার কতকটা প্রমাণও পেয়েছেন যে, কেবল বাতাসের গতি-বেগ ও পত্রের আকৃতি দিয়েই সর্ব্বপ্রকার মর্ম্মরধ্বনির ব্যাখ্যা করা যায় না। এ বিষয়ে গাছেদের নিজেদেরও যেন সজ্ঞান কিছু প্রচেষ্টা আছে ব'লে মনে হয় তাঁর। যন্ত্র দিয়ে তিনি মেপে দেখেছেন যে, একই উত্তাপে ও বায়ুমণ্ডলের চাপে একই বাতাসের গতি-বেগে একই গাছ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন রকম মর্ম্মরধ্বনি

শোনায়। ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র থাকলে তিনি প্রমাণ রাখতে পারতেন। তা ছাড়া তাঁর মতে গাছের ভাষা শুধু শ্রাব্য নয়, দর্শনীয়ও। চক্ষু এবং কর্ণ উভয় ইন্দ্রিয়ের সহযোগে সে ভাষার মর্ম্ম গ্রহণ করতে হয়। গাছের সব পাতা একসঙ্গে কাঁপে না, সব পাতার ওপর সূর্য্যালোক সমভাবে প্রতিফলিত হয় না। শুধু ফোনোগ্রাফ নয়, সিনেমাটোগ্রাফও দরকার, যদি কেউ বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাছের ভাষাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণা করতে চান। গাছের ভাষা শ্রাব্য এবং দৃশ্য তো বটেই, তা ছাড়া আর একটা জিনিস আছে ব'লেও তাঁর মনে হয়। সিম্‌বায়োসিস ব'লে যেমন এক ধরনের জীবনযাত্রাপ্রণালী উদ্ভিদ ও পশু জগতে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন—যাতে দুটি বিভিন্ন প্রাণী অথবা উদ্ভিদ যৌথভাবে পরস্পরের সাহায্য নিয়ে প্রাণ ধারণ করে—তেমনই, সোম-শুভ্রের ধারণা, গাছের ভাষা ও পাখির গান, গাছের ভাষা ও পতঙ্গের গুঞ্জন, পরস্পর-পরিপূরক। একের সাহায্য ব্যতিরেকে অপরে ঠিক যেন মূর্ত্ত হতে পারে না। তাই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে গাছের ভাষার রূপও বিভিন্ন। সোম-শুভ্রের দৃঢ় বিশ্বাস, তারা তাদের এই বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাব-বিনিময়ও করে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কলকেফুলের গাছের পাতায় পাতায় হঠাৎ একটা শিহরণ জাগল, একটা কোকিল ডেকে উঠল তার ডালে। ঠিক পাশেই একটা আতা গাছ, একই রকম হাওয়া বইছে, কিন্তু তাতে শিহরণও নেই, কোকিলও নেই। কিন্তু আর একটু দূরে আর একটা কলকেফুলের গাছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাগল অনুরূপ শিহরণ, তার ডালেও ডেকে উঠল কোকিল। মনে হ'ল, দুটো গাছ যেন কথা ক'য়ে উঠল একই ভাষায়। এসব ঘটনা এত বার তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, এদের তিনি কাকতালীয়বৎ ব'লে উড়িয়ে দিতে চান না। তবে তাঁর এই মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য যে সব প্রমাণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন, তা ঠিক ক'রে উঠতে পারেন নি তিনি। তবু তিনি এগুলো ছাপার অক্ষরে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে চান এই উদ্দেশ্যে যে, ভবিষ্যৎ যুগের কোন বৈজ্ঞানিক হয়তো এ নিয়ে কাজ করতে পারবেন, তাঁর

এ কল্পনাও হয়তো সত্যরূপে মূর্ত্ত হবে কোনদিন ভবিষ্যৎ কোন জগদীশচন্দ্রের প্রতিভাবলে।

সম্পাদক নবকুমারের মনে হ'ল, সোম-শুভ্র বোধ হয় এই সব প্রলাপ তার 'অধরা' পত্রিকায় ছাপাতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাকে বোধ হয় নিমন্ত্রণ করিয়েছেন আজ। এই হাস্যকর ব্যাপার বেশি দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বেই নিবৃত্ত করা উচিত, নবকুমারের মনে হ'ল। কর্ত্তব্য-প্রণোদিত অপ্রিয় কার্য্যটাকে কৌশলে মোলায়েম করবার উদ্দেশ্যে তাই সে বললে, আপনার প্রবন্ধটা আমার কাগজে নিতে পারতাম; কিন্তু তাতে এত গম্ভীর প্রবন্ধ ঠিক চলবে কি না, বুঝতে পারছি না। আমার কাগজ ঠিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকা তো নয়। তবে—

সোম-শুভ্রকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকতে দেখে নবকুমার থেমে গেল।

তোমার কাগজ আছে নাকি?

আমার ঠিক নয়। প্রোপ্রাইয়েটর হচ্ছেন রামদাস মল্লিক। আমি সহকারী সম্পাদক।

প্রোপাইটার না ব'লে প্রোপাইয়েটর বললে, কারণ তার গর্ব্ব, ইংরেজী কথা যখন বলে, তখন অভিধান-সম্মত শুদ্ধ উচ্চারণই ক'রে থাকে সে। সব সময় সফল হয় না যদিও, কারণ সে ইংরেজ নয়, তবু চেষ্টা করে। বেণীমাধবের অভিধান উলটে পালটে আজই সকালে 'প্রোপাইয়েটর' তার চোখে পড়েছিল। তাক মাফিক লাগিয়ে দিলে।

সোম-শুভ্র প্রশ্ন করলেন, রুবি মিলের রামদাস মল্লিক নাকি?

হ্যাঁ।

কাগজের নাম কি?

অধরা।

রামদাস মল্লিক সোম-শুভ্রের অপরিচিত নন। তিনিও ব্রাহ্ম। এই ওজুহাতে এবং অবলা বিধবাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করবেন এই কারণ দেখিয়ে

বহুকাল পূর্ব্বে তিনি সোম-শুভ্রের কাছ থেকে হাজার খানেক টাকা চাঁদা নিয়েছিলেন। অনেকের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন,—হাজার টাকা অবশ্য আর কেউ দেন নি, কিন্তু দশ, বিশ ; পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশো—যার কাছে যতটুকু নেওয়া যায় তিনি নিয়েছিলেন। অবলা বিধবাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্য হয় নি, কিছুকাল পরে একটি তেলের কল স্থাপিত হয়েছিল। বিধবার সঙ্গে এই তেলের কলটির কিছু সম্পর্ক যে ছিল না, তা নয়। রুবি-নাম্নী যে বিধবা মেয়েটির প্রেমে প'ড়ে রামদাস মল্লিক দ্বিতীয় পক্ষে তাকে বিয়ে করেছিলেন, তার নামের সঙ্গে মিলটির নাম যুক্ত ক'রে বিধবা-প্রীতির কিছু পরিচয় মল্লিক মশায় দিয়েছিলেন। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া যায় না যে মল্লিককে, তিনি আজকাল 'অধরা' নামক এক পত্রিকারও স্বত্বাধিকারী হয়েছেন—এই বার্ত্তা শুনে সোম-শুভ্রের মনের নেপথ্যে যে রসিকতা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, তার আভাস মুখে অবশ্য ফুটল না কিছু! ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, ও। তোমাদের কাগজে চলে না বুঝি এ ধরনের লেখা ?

আজ্ঞে না। আমরা পোস্ট জর্জিয়ান লিটারারি 'মুউভ্‌মেণ্ট' নিয়েই আছি। তারই রূপটা বাংলা ভাষায় ফোটাতে চেষ্টা করছি।

হচ্ছে না কিন্তু কিছুই।—কথাটা অপ্রত্যাশিতভাবে ব'লেই সোম-শুভ্রের মুখের দিকে চেয়ে ইলা বুঝলে যে, কথাটা এখন এ ভাবে বলাটা অশোভন হয়েছে। ইলার অপ্রতিভ ভাবটা দেখে অনামিকাকে ঘাড় ফিরিয়ে হাস্য গোপন করতে হ'ল। পরমানন্দ দৃষ্টির ইঙ্গিতে নবকুমারকে অনুরোধ করতে লাগল, যেন সোম-শুভ্রকে খুব বেশি নিরুৎসাহিত না করা হয়। সোম-শুভ্র প্রবন্ধের পাতাতেই নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। এসব তিনি দেখতে পেলেন না। বলা বাহুল্য, 'অধরা' পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপাবার কোন আগ্রহ তাঁর জাগল না। জাগলেও তার জন্যে নবকুমারের অনুগ্রহপ্রার্থী হবার দরকার হ'ত না তাঁর, রামদাস মল্লিক যখন সে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। কিন্তু এত কথা তিনি নবকুমারকে বললেন না। ক্ষণকাল নীরব থেকে একটু সসঙ্কোচেই তিনি বললেন, আমি যা লিখেছি

তা বিশেষ কিছু নয় হয়তো, কিন্তু তবু এটা ছাপাব ঠিক ক'রে ফেলেছি। ছাপালে পঞ্চাশ ষাট পাতার একখানা চটি-বই হবে। এক হাজার কপি ছাপাতে কত খরচ পড়তে পারে?

নবকুমারই উত্তর দিলে, দেড়শো টাকার মধ্যেই হবে।

দেড় হাজার টাকায় তা হ'লে দশ হাজার কপি হবে।

একেবারে দশ হাজার কপি ছাপাবেন? অত কি বিক্রি হবে?

বিক্রি করব না, বিতরণ করব।

এর জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। চতুর্দ্দিকে সকলের যখন এত অভাব, তখন শুধু শুধু দেড় হাজার টাকার এই অপব্যয়! পরমানন্দকে মানুষ করেছিলেন ব'লেই বোধ হয় তার ধারণা ছিল যে, সোম-শুভ্রের টাকাকড়ির ওপর তার একটা ন্যায্য দাবি আছে। তাই সে সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, তার মানে?

মনে করেছি, লাখ খানেক টাকা কোনও ভাল ব্যাঙ্কে জমা ক'রে যাব। তারই সুদ থেকে প্রতি বছর এই বই ছাপা হয়ে বিতরিত হবে। হাজার দুই-তিন সুদ হবে বোধ হয়। দেড় হাজার যদি বই ছাপানোর খরচ হয়, বাকিটা হবে বিতরণের খরচ। যিনি বিতরণ করবেন, তাঁকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে, টিকিট প্রভৃতিও লাগবে কিছু—

ইলা আবার কথা ক'য়ে উঠল অপ্রত্যাশিতভাবে, আপনার টাকা অবশ্য আপনি যেমন ভাবে খুশি খরচ করতে পারেন—

তারপর একটু হেসে বললে, এদেশে এখনও সে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এতগুলো টাকা আরও ঢের ভালভাবে 'ইউটিলাইজ' করা যেত।

সোম-শুভ্র কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন এবং চুপ ক'রেই হয়তো থাকতেন, যদি না তাঁর মনে হ'ত যে, তাঁর নীরবতাকে হয়তো উপেক্ষা ব'লে মনে করবে মেয়েটি। মৃদু হেসে তাই উত্তর দিলেন, সেটা নির্ভর করে ইউটিলিটি কাকে বল

তুমি, তার ওপর। তোমার শাড়ি দেখে আমার কিন্তু ভরসা হচ্ছে যে, আমাদের দুজনের আদর্শে খুব বেশি তফাত নেই।

ইলার দামী রেশমের শাড়িটার দিকে সস্নেহে চাইলেন তিনি।

ইলা লজ্জিত মুখে বললে, এর দামই বা কত? আর এ কটা টাকা দিয়ে কটা লোকেরই বা উপকার হবে? কিন্তু আপনার ওই এক লাখ টাকা দিয়ে—

তেত্রিশ কোটি লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা ভাবলে এক লাখ টাকাও কিছু নয়। আর একটা স্কুল তৈরি ক'রে আরও গোটাকতক লোককে কেরানী হবার সুযোগ দিতে চাও? না, আর কোন হিতকর অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে কতকগুলো চোরকে প্রশ্রয় দিতে চাও? তোমার মতে কি হ'লে ভাল হয়, শুনি?

আপনার ওই বই ছাপিয়েই বা কি হবে?

হয়তো কিছুই হবে না। আবার এমনও হতে পারে যে, আজ যা আজগুবি ব'লে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাই হয়তো কোন বৈজ্ঞানিকের প্রতিভায় প্রদীপ্ত হয়ে মানব-সভ্যতার রূপই বদলে দেবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—

কথাটা বলতে গিয়ে একটু ইতস্তত ক'রে থেমে গেলেন তিনি। ঘড়িতে আটটা বাজল। অনামিকাকে উঠে পড়তে হ'ল। সোম-শুভ্রের আহারের ব্যবস্থা করতে হবে। রাত্রে অবশ্য দুধ ছাড়া তিনি খাবেন না কিছু এবং সে দুধটুকুও নিজের প্যানে নিজের স্টোভে গরম ক'রে নেবেন, কিন্তু তারও ব্যবস্থা করতে হবে অনামিকাকেই। অনামিকা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি, সোম-শুভ্রের কথাবার্ত্তা শুনে কিছু বলবার আর প্রবৃত্তিও ছিল না তার। আলেয়াকে নির্ভরযোগ্য আলো মনে ক'রে বিভ্রান্ত পথিক অবশেষে যেমন বিক্ষুব্ধ হয়, সোম-শুভ্রের আলোচনা শুনে অনামিকার মনের অবস্থাও অনেকটা তেমনই হয়েছিল। নিরীহ নির্দ্দোষ পরমানন্দের ওপর ভয়ানক রাগ হচ্ছিল তার। একেই বলে কালনেমির লঙ্কা ভাগ। সোম-শুভ্রের টাকার ওপর নির্ভর ক'রে বালীগঞ্জের চৌমাথার ওপর জমির দর করা হচ্ছিল। দেড়শো

টাকা মাইনের কেরানীর আশাও কম নয়! বামন হয়ে চাঁদে হাত! মনের মধ্যে তুষানল জ্বলছিল অনামিকার। সে আর ব'সে থাকতে পারলে না, উঠে গেল। পত্নীর মনের অবস্থা পরমানন্দেরও অজ্ঞাত রইল না। হঠাৎ বেফাঁস কিছু ব'লে না বসে! অনামিকার পিছু পিছু সেও উঠে গেল।

নবকুমার বললে, আপনার সবচেয়ে বড় কথাটা কি, তা তো বললেন না?

আমার নিজের তৃপ্তি।

একটু চুপ ক'রে থেকে সোম-শুভ্র আবার বললেন, লম্বা লম্বা বক্তৃতার আড়ালে এই সত্য কথাটা ঢাকা প'ড়ে যায় অনেক সময়। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, বিবেকানন্দ, পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক, কবি দার্শনিক, দেশনেতা সকলেই যা সন্ধান করেছেন, তার নাম আত্ম-তৃপ্তি। দৈবক্রমে তাতে আর পাঁচজনের উপকার হয়ে গেছে। না-ও যদি হ'ত, তা হ'লেও তাঁরা স্বধর্ম্মচ্যুত হতেন না।

এতটা ব'লে সহসা তাঁর মনে হ'ল, আত্ম-প্রশংসা করা হচ্ছে। সসঙ্কোচে চুপ ক'রে গেলেন।

ইলা মুখরা মেয়ে। ব'লে উঠল, দশজনের উপকার ক'রে যাঁরা তৃপ্তিলাভ করেন, তাঁরাই পৃথিবীতে পূজনীয় কিন্তু।

ঈষৎ হেসে সোম-শুভ্র বললেন, পৃথিবীতে এ রকম লোক থাকাও অসম্ভব নয়, যাঁরা দশের পূজা এড়াতে চান। মানুষ অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণাকেই পূজো করে কিনা। গ্যালিলিও যদি লোকের পূজা চাইতেন—

এখন কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই পূজনীয় নন কি?

এখন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মতকে সমসাময়িক বিজ্ঞেরা শুধু আজগুবি ব'লেই মনে করে নি, তাঁকে লাঞ্ছিতও করেছিল সেজন্যে।

তারপর একটু হেসে বললেন, তা ব'লে আমি এ কথা বলতে চাইছি না যে, আমি গ্যালিলিওর সমকক্ষ। এটা হয়তো আমার বাজে খেয়াল মাত্র। তর্কের খাতিরেই তর্ক করছিলাম শুধু।

এই পর্য্যন্ত ব'লে স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইলেন তিনি।

একটু পরে নবকুমার কথা কইলে, ইলা দেবী কম্যুনিস্ট, তাই আপনার খেয়াল বোধ হয় ভাল লাগছে না ওঁর।

সোম-শুভ্র সস্নেহে ইলার দিকে চাইলেন।

ইলা ব'লে উঠল, যে কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক কম্যুনিস্ট না হয়ে পারে না। বর্ত্তমান যুগে কম্যুনিজ্‌মই মুক্তি। আপনার মনে হয় না তা?

সোম-শুভ্র বললেন, হ্যাঁ, যাদের খেটে খেতে হবে, তাদের পক্ষে মুক্তি বইকি।

সকলেরই খেটে খাওয়া উচিত এবং প্রত্যেক সভ্যসমাজের উচিত—প্রত্যেক কর্ম্মীকে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া।

সব মানুষের পক্ষে কি এক নিয়ম খাটে? তুঁতগাছ গুটিপোকার পক্ষে হিতকর স্বীকার করি, কিন্তু সব পোকার পক্ষে নয়। এমন কি সেই গুটি-পোকাই যখন প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়, তার পক্ষেও নয়। সেও তখন তুঁতপাতায় আবদ্ধ থাকে না, ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। গুটিপোকার চক্ষে যেটা নিরর্থক বিলাস, প্রজাপতির পক্ষে সেইটেই সার্থক কর্ম্ম। এক নিয়ম কি খাটে সকলের বেলায়? বিশেষত মানুষের বেলায়?

উপমা দিয়ে কথা কইলে পারব না। নবকুমারবাবুর মত সাহিত্যিক তো আমি নই, লেখাপড়া শিখে বেকার ব'সে আছি। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকবার ইচ্ছে নেই। তাই মনে হয়, সোভিয়েটের দেশে থাকলে হয়তো সসম্মানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতাম।

সোম-শুভ্র চুপ ক'রে রইলেন। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগল তাঁর। তাঁর বিশ্বাস . . প্রকৃতির বিচিত্র নিয়ম-অনুসারে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন প্রকার সুখ-দুঃখ ভোগ করতে বাধ্য। মানুষের তৈরি সাম্যবাদের ছদ্মবেশ এত বার ধরা পড়েছে যে, বৈজ্ঞানিক মাত্রেই শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন, জীব. . . সত্যিই যদি একটা যুদ্ধ হয় এবং তার প্রধান অস্ত্র যে

শক্তি, তা প্রকৃতিই সকলকে যদি সমানভাবে না দিয়ে থাকেন, তা হ'লে নিখুঁত সাম্যের আশা দুরাশা মাত্র, আদর্শবাদীর স্বপ্ন শুধু। বাস্তব-জগতে সেটাকে মুখোশরূপে ব্যবহার ক'রে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে নিজেদের কাজ হাঁসিল ক'রে নেবেন হয়তো, কিন্তু খ্রীষ্টের স্বর্গরাজ্য অথবা খ্রীষ্ট-বিরোধী লেনিনের সাম্যরাজ্য দুর্ব্বলের কল্পলোকে অথবা আদর্শবাদীর স্বপ্নলোকেই থেকে যাবে। জীবলোকে তা কোন দিনই মূর্ত্ত হবে না, হবার উপক্রম করবে, কিন্তু হবে না। এ সবই জানেন তিনি। তবু রঙিন-শাড়ি-পরা ছিমছাম এই মেয়েটির—বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, যার কোন দুঃখই নেই, অথচ অন্তরে যার এত গ্লানি—এর স্বরূপ জানতে পেরে এবং নিজের সচ্ছলতার সঙ্গে তার তুলনা ক'রে তাঁর ভদ্র-অন্তঃকরণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

নবকুমার একটু অধীর হয়ে উঠেছিল। সোম-শুভ্র অথবা ইলা কাউকেই তাক লাগাতে না পেরে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। অবশেষে সে উঠে পড়ল।

কিছু যদি মনে না করেন, আমি উঠি এখন।

খাবে না এখানে ?

পরমানন্দ খেতে বলেছিল, কিন্তু হঠাৎ এখন মনে পড়ল, স'
সঙ্গে একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আছে আমার—থাকতে পারব না।

আচ্ছা।

নবকুমার রাস্তায় বেরিয়ে মোড়ের পানে
সিগারেট কিনে দেশলাইয়ের ওপর সেটা ল
অস্বস্তি ভোগ করতে লাগল। ওখা
নীলরতনের নাম ক'রে অ
পর ইলা সোম-শুভ্রের।
নিস্তার দিচ্ছি না আপ

আমি বুড়ো মানু

দ্বারপ্রান্তে অনামিকাকে দেখা গেল। সমস্ত মুখ থমথম করছে তার।

স্টোভ জ্বেলেছি, আসুন। ইলা, তুমিও এস, খাবার দেওয়া হচ্ছে। নবকুমারবাবু কোথা গেলেন?

তাঁর একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট ছিল, চ'লে গেছেন তিনি।

সকলে উঠে ভেতরের ঘরে গেলেন।

গ

সোম-শুভ্র নিবিষ্ট চিত্তে ব'সে হিসেব লিখছিলেন। প্রত্যহ নিখুঁতভাবে পাই-পয়সার হিসেব মিলিয়ে তবে তিনি শুতে যান। বহুকাল থেকে এ কাজ ক'রে আসছেন। আধ পয়সার হিসেব গোলমাল হয়ে গেলে রাত্রে ঘুম হয় না—আধ পয়সার জন্যে নয়, হিসেব গোলমালের জন্যে। কোন হিসেবের একচুল গোলমাল অসহ্য তাঁর পক্ষে। সারাজীবন তিনি এমন নিখুঁতভাবে হিসেব রেখেছেন যে, যে কোন মুহূর্ত্তে ব'লে দিতে পারেন জীবনে কত কুলি-ভাড়া [illegible]য়েছেন, কত কাপড় কিনেছেন, কত চাল-ডাল কিনেছেন। সমস্ত প্রকার [illegible]ল হিসেব আছে তাঁর কাছে। শুধু টাকাকড়ির ব্যাপারেই নয়, [illegible]তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিয়ম-নিবদ্ধ। কোন প্রকার অনিয়ম [illegible]মন কি বিছানার চাদর কোথাও যদি সামান্য কুঁচকে থাকে, [illegible] হয়। ঘুম আসতে চায় না, সেটা ঠিক ক'রে না [illegible] করতে থাকে। এ রকম লোকের জীবন [illegible]-শুভ্রের জীবন আশ্চর্য্য রকম শান্তিপূর্ণ, [illegible] নিজের চাকরদের কাছেও— [illegible]। বরং তাঁর ভাবভঙ্গী [illegible] অস্তিত্ব দ্বারাই তিনি [illegible] তা সহ্য করছে ব'লে

ইলা এসে প্রবেশ করলে।

আমি আপনার বিছানাটা ঠিক ক'রে দিয়ে যাই।

না না, কিছু দরকার নেই, তুমি বাড়ি যাও। আমি নিজেই ক'রে নিতে পারব। অনু কেমন আছে?

ভাল আছে। সে-ই আসছিল, আমিই মানা করলাম তাকে। একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাকুক।

এর আগে কি ওর ফিট হয়েছিল কখনও?

কই, শুনি নি তো।

ইলা সোম-শুভ্রের বিছানা খুলে পাততে লাগল। সোম-শুভ্র বাধা দিতে পারলেন না, কোন ব্যাপার নিয়ে বেশি বাদ-প্রতিবাদ করাটাও তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি হাসি-মুখে হিসেব লিখতে লাগলেন।

মশারির দড়ি নেই বুঝি? নিয়ে আসি।

সব আছে; দাঁড়াও, দিচ্ছি।

সোম-শুভ্র উঠে তোরঙ্গ খুলে (সুটকেস পছন্দ করেন না তিনি) এক গুলি টোয়াইনের শক্ত সুতো, চারটি ছোট পেরেক এবং একটি ছোট হাতুড়ি বার ক'রে ইলাকে দিলেন।

এসব আপনি সঙ্গে রাখেন বুঝি?

সোম-শুভ্র একটু হাসলেন শুধু। ওই তোরঙ্গের মধ্যে কত রকম জিনিস যে তাঁর সংগ্রহ করা আছে, তা দেখলে ইলা অবাক হয়ে যেত। খাম, পোস্টকার্ড, টিকিট, মনিঅর্ডার ফর্ম, চিঠি লেখার কাগজ, কলম, নিব, আলপিন, ফাউন্টেন পেন, ব্লটিং, সাধারণ পেন্সিল, লাল-নীল পেন্সিল, ছুরি, কাঁচি [illegible], দেশলাই, গালা, শিলমোহর, হরিতকী, মাজন—এসব তো আছেই, অনেকেরই থাকে; কিন্তু এসব ছাড়াও এমন অনেক জিনিস আছে, যা অনেকের থাকে না। কয়েকটা ছোট ছোট কৌটোতে [illegible]না, পয়সা, আনি, দুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা, এমন কি কয়েকটা গি[illegible]ও আলাদা আলাদা করা আছে।

কয়েকটা শক্ত খামে আছে নানা মূল্যের নোট। এসব ছাড়া ছোট একটা পুঁটুলিতে নানা রকমের কাপড়ের টুকরো, নানা রঙের সুতোর গুলি, সরু মোটা ছুঁচ, নানা ধরনের ছোট বড় বোতাম সংগ্রহ করা আছে। যখনই যে কাপড়ের জামা অথবা মশারি করান, তখনই তার খানিকটা ছাঁট সংগ্রহ ক'রে রেখে দেন, ভবিষ্যতে যদি তালি দিতে হয়—এই ভেবে। পড়বার সময় চশমা লাগে, দু জোড়া করিয়ে রেখে দিয়েছেন—এক জোড়া হঠাৎ হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গেলে অসুবিধেয় যেন পড়তে না হয় অথবা অপরকে যেন অসুবিধেয় ফেলতে না হয়। অভিজ্ঞতা থেকে সোম-শুভ্র এটা বুঝেছেন যে, অ-গোছালো হ'লে নিজের তো অসুবিধে হয়ই, আশপাশে যারা থাকে তারাও অস্বস্তি ভোগ করে। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি না পেলে জীবনযাত্রার ছন্দে তাল কেটে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায় যেন।

না না, ও ঠিক হচ্ছে না, ঠিক সমান ক'রে মেপে নাও, যেখানে সেখানে পেরেক ঠুকলে ঠিক হবে না। মশারির চারটি খুঁট ঠিক সমান হওয়া চাই তো।

আপনি কি লিখছেন লিখুন না, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। সোম-শুভ্র আর বাধা দিলেন না, লিখতে লাগলেন, কিন্তু মনে মনে বুঝলেন, ঠিক হচ্ছে না, ও চ'লে যাবার পর ঠিক ক'রে নিলেই হবে। যথাসাধ্য ভাল ক'রেই ইলা মশারি টাঙানো বিছানা-পাতা শেষ ক'রে বললে, দেখুন।

চমৎকার হয়েছে।

যাবার আগে ইলা লীলাভরে হেসে বললে, আপনার যে এত কাজ ক'রে দিচ্ছি, আমার একটু স্বার্থ আছে।

কি?

আমি যে স্কুলে পড়াই; সেখানে আমাকে মাইনে দেয় না। ভবিষ্যতে মাইনে পাব—এই আশায় ঢুকেছিলাম। স্কুলের যিনি সেক্রেটারি, তিনি এখন বলছেন, বি. টি.-পাস লোক নেওয়া হবে। আমি যদি এক বছরের মধ্যে বি. টি. পাস করতে পারি, তা হ'লে তাঁরা আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন, না পারলে অন্য লোক নেবেন। স্কুলের সেক্রেটারি অনাদি সেন আপনাকে খুব খাতির করেন, আপনি যদি একটু রেকমেণ্ড ক'রে দেন আমাকে—

কি রেকমেণ্ড করব ?

আমাকে যেন চাকরি করতে করতে বি. টি. পাসের সুযোগ দেওয়া হয়। ওঁরা ইচ্ছে করলে তিন বছর পর্য্যন্ত সময় দিতে পারেন। আমি তা হ'লে টাকা কিছু জমিয়ে নিতে পারি, বি. টি. পড়ার অনেক খরচ তো।

কত খরচ ?

তা মাসে প্রায় পঞ্চাশ টাকা। এক বছরে ছ-সাতশো টাকা লাগবে। আপনি একটা চিঠি লিখে দিলেই কিন্তু হয়ে যায়।

তাদের স্কুলের বিষয় তো আমি কিছুই জানি না। তারপর একটু হেসে বললেন, তোমার বিষয়েই বা এমন কি জানি! চিঠি দেওয়াটা কি ঠিক হবে ?

বেশ, তবে দেবেন না।

প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেল ইলা। সোম-শুভ্র লক্ষ্য করলেন, তার হাসি-হাসি মুখখানি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। খুব খারাপ লাগতে লাগল তাঁর। কিন্তু কি করবেন তিনি, এমন ভাবে চিঠি দেওয়াটা কি উচিত হ'ত ? উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব মেটাতেই সারাজীবনটা কেটে গেল! কি যে কর্ত্তব্য, তা ঠিক করা এত কঠিন! ইলার মুখখানা বারম্বার ভেসে বেড়াতে লাগল মনের ওপর। একখানা হাজার টাকার চেক লিখে দিলেই বোধ হয় ওর সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু এমনভাবে মহত্ত্ব আস্ফালন ক'রে অপরিচিত একজন মেয়েকে একটা চেক ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যে যে ইতরামি আছে, তার মধ্যে যেতে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। তারপর হঠাৎ আর একটা কথাও মনে হ'ল। যে শিব-শুভ্রের টাকা তিনি পেয়েছেন, তাঁর আত্মা যাতে তৃপ্ত হবে, টাকাটা কি সেই ভাবেই খরচ করা উচিত নয় ? শশাঙ্ক-শুভ্রের কথা মনে হ'ল। কে জানে, তার ব্যবসা কেমন চলছে আজকাল! বহুদিন তার কোন খবর পান নি। গায়ে প'ড়ে খবর নিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। সে-ও বোধ হয় সঙ্কোচভরেই তাঁর কাছে আসতে পারে না। নিতান্ত প্রয়োজনবশেই সেবার আসতে হয়েছিল ব'লে মনে মনে লজ্জিত হয়ে আছে বোধ হয়। শশাঙ্কের ছেলে শঙ্খ, তারও আবার ছেলে হয়েছে! শিশু শশাঙ্ক-শুভ্রের মুখটা মনের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি।

৩

শশাঙ্ক-শুভ্র

কোন দামী মোটরকার যদি দৈব-দুর্ব্বিপাকে বার বার ধাক্কা খেয়ে ভেঙে চুরে যায় এবং যদি একাধিক মূর্খ মিস্ত্রী সস্তায় সেটাকে সারিয়ে দেবার ওজুহাতে নানা রকম জোড়া-তালি লাগায় তাতে তা হ'লে তার যা অবস্থা হয়, শশাঙ্ক-শুভ্রের বর্ত্তমান অবস্থা অনেকটা তাই। শশাঙ্ক-শুভ্র মোটরকার নন—মানুষ, তাই অবস্থাটা জটিলতর।

প্রথম ধাক্কা খান যৌবনের প্রারম্ভে। বর্ত্তমানের সাহেবী স্যুট পরা প্রৌঢ় শশাঙ্ক-শুভ্রকে দেখে অনুমান করা কঠিন যে, যৌবনের প্রারম্ভে তিনি একদা বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হয়ে বোমার দলে যোগ দিয়েছিলেন। দেশের বাগদীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে, ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করবার কল্পনাও তাঁর মাথায় একদিন এসেছিল। সখারাম গণেশ দেউস্করের বই, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গান, সুরেন বাঁড়ুয্যের বক্তৃতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' তাঁরও চিত্তকে উদ্বোধিত করেছিল সেদিন স্বাধীনতার মন্ত্রে। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে মেরে কানাইলাল যখন ফাঁসী গেলেন তখন যুবক শশাঙ্ক-শুভ্রও ঠিক ক'রে ফেললেন যে, ওদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন তিনি। ও পথে বিনা-বাধায় চলতে পেলে তিনি ঠিক কি যে হতেন, তা এখন আন্দাজ করা শক্ত। কিন্তু সে পথে চলবারই সুযোগ তিনি পান নি ভালভাবে। যাত্রা করবার মুখেই তিনি ধাক্কা খেলেন। পথ-রোধ ক'রে দাঁড়ালেন পিতা হংস-শুভ্র স্বয়ং। অনুগৃহীত একজন পুলিস-কর্ম্মচারীর মুখে যেই তিনি খবর পেলেন যে, শশাঙ্ক বোমার দলে মিশেছে অমনই তিনি ডেকে পাঠালেন তাকে।

তুমি বোমার দলে যোগ দিয়েছ শুনছি।

দিয়েছি।

ও দলে যোগ দেবার মত মনের জোর আছে তোমার ?

আছে।

বেশ, দেখা যাক।

ড্রয়ার থেকে প্রকাণ্ড একটা চকচকে ছোরা বার ক'রে বললেন, এই নাও। আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে কিছুতেই বোমার দলে যেতে দেব না। তোমার যদি মনের জোর থাকে এই ছোরা আমার বুকে বসিয়ে দিয়ে চ'লে যাও।

ছোরা হাতে ক'রে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শশাঙ্ক-শুভ্র।

হংস-শুভ্র বললেন, বুঝেছি। দাও ছোরাখানা। ইংরেজদের তাড়াবার চেষ্টা না ক'রে ওদের ভাল গুণগুলো নেবার চেষ্টা কর। তোমাকে বিলেত পাঠাব ঠিক করেছি, তার জন্যে প্রস্তুত হওগে যাও।

বিলেত যাওয়ার নামে স্বদেশ-প্রেম কর্পূরের মত উবে গেল যেন।

ধাক্কাটা সামলাতে মাসখানেক লেগেছিল তবু।

মাস ছয়েক পরে বিলেত চ'লে যান তিনি।

দ্বিতীয় ধাক্কাটা খেয়েছিলেন বিলেতে—জনৈক বন্ধুর সঙ্গে সাহেবিয়ানায় পাল্লা দিতে গিয়ে। সেও আজ অনেক দিনের কথা। প্রেসিডেন্সি কলেজে যে ছেলেটির সঙ্গে সব চেয়ে বেশি ভাব হয়েছিল, সেই ছেলেটিই যে ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর অধঃপতনের কারণ হবে—এ কথা তখন কে ভেবেছিল ! অন্তরঙ্গতার অন্তরালে যে ঈর্ষ্যার বীজ লুক্কায়িত ছিল, তা প্রথম অঙ্কুরিত হ'ল একটি তরুণী মেম সাহেবকে কেন্দ্র ক'রে। সনৎকুমারও সুশ্রী, অভিজাত-বংশীয় ধনীর সন্তান, শশাঙ্কর চেয়ে কোন অংশে কম তো নয়ই, বরং কোন কোন বিষয়ে এক-কাঠি বাড়া। ছিপছিপে চেহারা, স্মার্ট থাকে বলে তাই। শশাঙ্ক ছিল একটু মোটা নাদুস-নুদুস গোছের। নাচের আসরে কন্দর্পের বিচারে তারই জিত হ'ল, বরমাল্যও হয়তো তারই গলায় দুলত, যদি স্বয়ং কুবের এসে মধ্যস্থতা না করতেন। নিছক টাকার জোরে শশাঙ্ক তাকে ছিনিয়ে নিয়ে, ঠিক পত্নীত্বে

নয়, প্রণয়িনীত্বে বরণ করলেন। সনৎকুমার মুচকি হেসে চুপ ক'রে রইলেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হ'ল, হারটা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরেই শশাঙ্ককে হৃদয়ঙ্গম করতে হ'ল যে, এই স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশে কোন ললনারই চরণে বা কণ্ঠদেশে কোনরকম শৃঙ্খলেরই স্থায়ী স্থান নেই, এবং তা নিয়ে হৈচৈ করাটা শুধু যে নিষ্ফল তা নয়, অশোভনও। দেঁতো হাসি হেসে শিভ্যল্‌রির অভিনয় করা ছাড়া উপায় নেই। সপ্তাহখানেক পরে তাই তিনি যখন টের পেলেন তাঁরই দেওয়া সাড়ে সাতশো পাউণ্ডের নেকলেস গলায় ঝুলিয়ে তাঁর প্রণয়িনী সনৎকুমারের সঙ্গে প্যারিসভ্রমণে গেছেন, তখন আরও কয়েক পাউণ্ড খরচ ক'রে জরুরি তার-যোগে তাঁকে উচ্ছ্বসিত আনন্দ-জ্ঞাপনও করতে হ'ল। মর্ম্মান্তিক সত্যটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রেও কিন্তু শশাঙ্ক-শুভ্র থামতে পারলেন না। টাকা ঢালতে লাগলেন। যাদের টাকা ছাড়া আর কোন সম্বল নেই তাঁদের টাকার উপর অগাধ বিশ্বাস। তাঁদের ধারণা টাকায় শেষ পর্য্যন্ত সব হয়। আকাশে পোস্ট-অফিস থাকলে সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ নক্ষত্রকেও ঘুস দেবার চেষ্টা করতেন, বোধ হয় তাঁরা। বড় লোকের ছেলে শশাঙ্ক-শুভ্র দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে শুধু প্রণয় বাবদে নয়, নানা বাবদে টাকা খরচ ক'রে সনৎকুমারের সঙ্গে টক্কর দিতে লাগলেন। শেষটা হংস-শুভ্র প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলেন। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে পুত্রকে তিনি যা লিখলেন, তার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে—প্রিয় বৎস, একটা কথা যদি মনে রাখ, ভবিষ্যতে তোমারই উপকার হবে। প্রিন্স দ্বারকানাথের মত ধনীও অজস্র অপব্যয়ের আঘাতে কাবু হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর তুলনায় আমাদের আয় সামান্য। বছরে মাত্র দশ লাখ টাকা। তোমার আরও চারটি ভাই, দুটি বোন আছে। প্রত্যেকের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাই তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার বরাদ্দ মাসহারার বেশি তুমি যা খরচ করবে, তা তোমার নামে লেখা থাকবে এবং তা তোমার অংশের প্রাপ্য থেকে বাদ যাবে ভবিষ্যতে। আর একটা কথা মনে রাখলেও সংযত হতে পারবে। কৃপণতা ক'রে অকারণ কৃচ্ছ্রসাধন করা

যেমন নোংরামি, বাহাদুরি ক'রে পাঁচজনকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে অকারণ অপব্যয় করাটাও তার চেয়ে কম নোংরামি নয়।

কিছুকালের জন্য সংযত হলেন শশাঙ্ক-শুভ্র এবং সেই সংযমের যুগেই কেম্ব্রিজের ডিগ্রীটা অর্জ্জন করলেন। সনৎকুমার হলেন ব্যারিস্টার। শশাঙ্ক-শুভ্র ও যদি ব্যারিস্টারি পাস ক'রে আসতেন, তা হ'লে পরবর্ত্তী যুগে জটিলতর সমস্যায় পড়তে হ'ত না তাঁকে। স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করবার একটা পথ উন্মুক্ত থাকত। তিনি বিদেশী সভ্যতার হাব-ভাব কায়দা-কানুন সমস্ত আয়ত্ত করলেন, করলেন না কেবল বিদেশী প্রথায় টাকা রোজকার করবার কৌশলটা। চাকরি করলে কেম্ব্রিজের ডিগ্রীটা হয়তো কাজে লাগতে পারত, যদি প্রথম প্রথম—মানে, বয়স থাকতে থাকতেই—তিনি সেটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু বোমার দলে যিনি একদিন যোগ দিয়েছিলেন, 'অন প্রিন্সিপ্‌ল' তিনি চাকরির বিরোধী ছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর তিনি যা করতেন, প্রায়ই 'অন্ প্রিন্সিপ্‌ল' করতেন।

ফিরে এসে 'অন্ প্রিন্সিপ্‌ল'ই তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। পুরাতন যোগসূত্রকে পুনঃস্থাপন করবার জন্যই নয়—নূতন ক্ষুধাও একটা অনুভব করছিলেন। কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। বিবেকানন্দের দিগ্বিজয়ের পর যে জাতীয়তা-বোধ কালক্রমে মিইয়ে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাতে যেন প্রাণসঞ্চার করলেন। জগৎ-সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব আবার নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হ'ল যখন, তখন ভারতের জাতীয়তার প্রতীক যে কংগ্রেস তাতে যোগ না দেওয়াটা ঘোরতর অকর্ত্তব্য ব'লেই মনে হ'ল শশাঙ্ক-শুভ্রের। গোখলে কিছুদিন আগে মারা গেছেন। ছাড়া পেয়েছেন তিলক। বিরুদ্ধপন্থী গোখলের চিতাপার্শ্বে তিলকের বক্তৃতাটা শশাঙ্ক-শুভ্রের এমন মর্ম্মস্পর্শ করল যে, তিলক-ভক্ত হয়ে পড়লেন তিনি হঠাৎ। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গোখলের 'সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া'র অধিনায়কত্ব করছেন বটে, কিন্তু তিলক তাঁর প্রাণেও সাড়া তুলেছেন। কোন্ কুল রাখবেন ঠিক করতে পারছেন না তিনি।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ও নেতা হবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে পারেন নি। লালা লাজপত রায় দেশের ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে একরকম বানপ্রস্থই অবলম্বন করেছেন আমেরিকায়। এস. পি. সিন্‌হা বম্বেতে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হলেন বটে, কিন্তু তাঁর সুর পছন্দ হ'ল না কারও। তিলকেরই নেতা হবার কথা; কিন্তু ফিরোজ শা মেটা প্রভৃতি বুড়োর দল বাগড়া দিতে লাগলেন ব'লে শশাঙ্ক-শুভ্রের রাগ হ'ল খুব। এ নিয়ে রাগারাগি তর্কাতর্কি ঘোরাঘুরি কম করেন নি, এস. পি. সিন্‌হার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করেছিলেন এবং কিছু করতে না পেরে শেষে যোগ দিয়েছিলেন তিলকের 'হোম-রুল লীগে'ই। তিলকের হোম-রুল আর পত্নী বাসন্তীর হোম-রুল কিন্তু এক নয়; তা ছাড়া বাসন্তীর বাবা একজন রায়-বাহাদুর। মনের প্রত্যক্ষলোকে কিন্তু তিলক-ভক্তিটা প্রাণপণে জাগ্রত রাখবার চেষ্টা করেছিলেন শশাঙ্ক-শুভ্র। তিলকই তাঁকে 'ডিস্‌গাস্‌টেড' হবার সুযোগ দিলেন। তাঁর খুব খারাপ লাগল, যখন বিদ্রোহী তিলক মডারেটদের সঙ্গে আপোস ক'রে কংগ্রেসে ঢুকতে রাজি হলেন। যে ন্যাশনালিজ্‌মের বিপ্লবী সুর তুলেছিলেন তিনি, শশাঙ্কর মনে হ'ল, তা অনেকখানি নেবে গেল যেন। একটা 'থিওরি'ই খাড়া ক'রে ফেললেন তিনি—এ দেশের জল-হাওয়ায় বিদ্রোহ টিকতে পারে না—ভারি স্যাঁতসেঁতে দেশটা। স্যাঁতসেঁতে দেশ ছাড়াও যে প্রবলতর আর একটা কারণ আছে, তার প্রমাণও পাওয়া গেল। যতীন মুখুজ্যে বালাশোরের জঙ্গলে পুলিসের সঙ্গে লড়তে লড়তে প্রাণ দিলেন। বিবাহ করার ফলেই হোক বা বিশ্লেষণ করার ফলেই হোক, শশাঙ্ক-শুভ্রের ধারণা হ'ল, এ দেশে বিপ্লব-পন্থা অনুসরণ করা মানে প্রাণ দেওয়া বা সময় নষ্ট করা। কোনটা করতেই প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। অথচ স্বদেশী কিছু একটা করবার জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিল। এই সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালীর ছেলেকে ডাক দিয়ে বললেন—তোমরা ব্যবসা কর; স্বাধীন ব্যবসা ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করাটাই দেশসেবা করা। কথাটা বড় ভাল লাগল। যুদ্ধ বেধেছে, এই সময় দেশী 'ইন্‌ডাস্ট্রি'গুলোকে সচেতন ক'রে

তোলা যেতে পারে। আর একটা থিওরিও খাড়া করলেন। ইংরেজরা বণিক, ভাঁতে ঘা দিলেই ওরা টলবে। কতকগুলো কেরানী, উকিল আর মাস্টারের বাজে চীৎকার ওরা গ্রাহ্য করবে কেন? হঠাৎ ব্যক্তিগত একটা কথা মনে পড়াতে আরও বেশি উৎসাহিত হলেন। সনৎ ব্যারিস্টারি ক'রে আর কটা টাকা রোজকার করতে পারবে? আমি যদি ভাল ক'রে ব্যবসা করতে পারি, তরতর ক'রে দুদিনেই উঠে যাব ওকে ছাড়িয়ে। ব্যবসাই করতে হবে।···থিওসফি ত্যাগ ক'রে অ্যানি বেসাণ্ট যখন 'সম্মিলিত' কংগ্রেসের অধিনেত্রী হয়ে পুরো দমে হোম-রুল আন্দোলন শুরু করেছেন, শশাঙ্কর মাথায় তখন অঙ্কুরিত হচ্ছে নানা রকম ব্যবসার প্ল্যান।

তৃতীয় ধাক্কা এইবার খেতে হ'ল। ব্যবসা করতে হ'লে টাকা চাই এবং টাকার মূল উৎস হংস-শুভ্র। তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে তাঁর সঙ্গেই মনান্তর ঘটতে লাগল।

বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর শশাঙ্ক-শুভ্র যা করতেন, 'অন্ প্রিন্সিপ্‌ল'ই করতেন। সুতীক্ষ্ণ একটা বিলিতী বিবেক তাঁর দেশী মস্তিষ্ক-বিবরে আড্ডা গেড়েছিল। হংস-শুভ্রের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণ এই বিবেকই। হংস-শুভ্র নিজে এককালে খুব সাহেব ছিলেন, এখন কিন্তু সাহেবিয়ানা তাঁর চক্ষুশূল। বিদেশী সভ্যতার আপাত-চটকদার জৌলুস একদিন তাঁর চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রতারিত করেছিল ব'লেই সে জৌলুসের ওপর এখন তিনি জাতক্রোধ। দেহ এবং মন থেকে বাজে বিলিতী খোলসটাকে দূর ক'রে দিয়ে যখন নিজের চতুর্দ্দিকে হংস-শুভ্র সনাতনী পরিবেষ্টনী গ'ড়ে তুলতে শুরু করেছেন, তখন শশাঙ্ক বিলেত থেকে ফিরলেন এবং পরিবর্ত্তিত পিতাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। প্রথম প্রথম এ নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন নি তিনি। কিন্তু ক্রমেই দেখলেন, যাকে বার্দ্ধক্যজনিত মস্তিষ্ক-বিকৃতি ভেবে সানুকম্প লঘু হাস্যভরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তা মোটেই লঘু হাসিতে উড়ে যাবার মত হালকা জিনিস নয়। আঘাত ক'রেও তাঁকে বিচলিত করা গেল না, কয়েকটা

স্ফুলিঙ্গ উড়ল শুধু, এবং তাতে ক্ষতি হ'ল শশাঙ্ক-শুভ্রেরই। হংস-শুভ্রের মনস্তত্ত্বটা তিনি বুঝতে পারেন নি সম্ভবত। পারলে এত কাণ্ড হয়তো হ'ত না। হংস-শুভ্র সেকালে যেমন উগ্র সাহেব ছিলেন, একালে তেমনই উগ্র হিন্দু হয়েছেন। তফাত শুধু এই যে, উগ্র সাহেব হংস-শুভ্র তাঁর পারিপার্শ্বিককে মনের মত ক'রে গড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন, ছেলেমেয়েদের সেই আদর্শে মানুষ করেছিলেন; কিন্তু উগ্র হিন্দু হংস-শুভ্র বৃদ্ধ বয়সে নিজের দলে কাউকে পেলেন না। সাহেব হংস-শুভ্রের কীর্ত্তিকলাপ হিন্দু হংস-শুভ্রের শান্তি বিঘ্নিত করতে লাগল এবং এইটেই বোধ হয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ করলেন না কারও কাছে, তাঁর নবতম ধ্বজাকে উদ্যত ক'রে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যেও নিজের দুর্গে অটল হয়ে রইলেন। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যাই হোক আধিভৌতিক হিসেবে এতে শশাঙ্ক-শুভ্রেরই ক্ষতি হ'ল।

পিতার সঙ্গে শশাঙ্ক-শুভ্রের প্রথম সংঘর্ষের কাহিনীটা এই রকম। পিতামহ যোগীশ্বর এককালে স্বগ্রামে জগদ্ধাত্রীপূজা করতেন। শিব-শুভ্র কিছুকাল করেছিলেন, পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। যোগীশ্বরের আদি নিবাস সেই হিঙ্গুল গ্রামে পুরাতন বাস্তু-ভিটা সংস্কার করিয়ে জগদ্ধাত্রীপূজা পুনঃপ্রবর্ত্তন করেছিলেন হংস-শুভ্র। হিঙ্গুল গ্রাম স্থানটি মোটেই সুগম নয়। রেল-স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে, কাঁচা-রাস্তায় গরুর গাড়ি ক'রে যেতে হয়। বলা বাহুল্য, এসব বাধা প্রবুদ্ধ হংস-শুভ্রকে নিরস্ত করতে পারে নি। তিনি প্রতি বছর হিঙ্গুল গ্রামে যেতেন এবং আত্মীয়-স্বজন-জ্ঞাতি-বর্গ সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে মহাসমারোহে জগদ্ধাত্রীপূজা যথানিয়মে করতেন। পানাপুকুরের জল, মশার কামড়, সুখাদ্যের অভাব প্রভৃতি তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নি। তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যে মৃগাঙ্ক ও ইন্দু তাঁর সঙ্গে প্রায় প্রতি বছরই হিঙ্গুল গ্রামে গিয়েছে। প্রথম যখন পূজা আরম্ভ হয়, তখন হিমাংশু সিতাংশু সুধাংশু— তিনজনেই বিলেতে। শশাঙ্ক ফিরেছেন এবং কিছুদিন হোম-রুল ক'রে অবস্থান করছেন শ্বশুরবাড়ি দিল্লীতে। হংস-শুভ্র তাঁকে আসতে লিখেছিলেন,

কিন্তু তিনি আসেন নি। অক্ষমতা এবং দুঃখ জ্ঞাপন ক'রে একখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন মাত্র। হিমাংশু, সিতাংশু এবং সুধাংশুকেও হংস-শুভ্র পত্র-যোগে পূজার খবরটা সাড়ম্বরে জানিয়েছিলেন। আশা করেছিলেন, উত্তরে তারাও অনুরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবে। তিনজনেরই উত্তর এসেছিল, কিন্তু উৎসাহ প্রকাশ করা দূরের কথা, এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখই কেউ করে নি। হিমাংশুর চিঠি এক সুইডিশ প্রফেসারের গুণগানে ভরতি ছিল। ডোমিনিয়নের ডেলিগেট্স, বিকানীরের মহারাজা এবং সার্ এস. পি. সিন্‌হাকে নিয়ে বিলেতে তখন যে ইম্পিরিয়াল ওয়ার কন্‌ফারেন্স বসেছিল, তাতে এস. পি. সিন্‌হার বক্তৃতায় 'ব্রিটিশ পাব্‌লিক' যে কি রকম মুগ্ধ হয়েছে, তারই বর্ণনা করেছিল সুধাংশু। আর সিতাংশু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল অ্যানি বেসাণ্ট, অ্যারুন্‌ডেল এবং ওয়াডিয়ার 'অন্তরিত' হওয়ার খবরে এবং উল্লাস প্রকাশ করেছিল মিস্টার জিন্না হোম-রুল লীগে যোগ দিয়েছেন ব'লে। বিলেতে ব'সেও ভারতবর্ষের খবর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল সে। সুরেন বাঁড়ুজ্যে, রাসবিহারী ঘোষ, ভূপেন বোস, মদনমোহন মালবীয়, কে. জি, গুপ্ত, মহম্মদাবাদের রাজা, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, ভি. এস. শাস্ত্রী, সি. পি. রামস্বামী আয়ারকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ক'রে কংগ্রেস বিলেতে ডেপুটেশন পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চেম্বার্‌লেন সাহেব কিছুতেই নিজের 'পলিসি' প্রকাশ করলেন না, ভারতীয় সৈন্য-বিভাগে ভারতীয়দের কমিশন দিতেও চাইলেন না—সুতরাং সে ডেপুটেশন গেল না। সার্ এস. পি. সিন্‌হাকে নিয়ে নমো-নমো ক'রে যে কন্‌ফারেন্সটা হয়ে গেল, সিতাংশুর তা মোটেই মনঃপূত হয় নি। এই সব নিয়েই দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল সে। তবে সে-ই কেবল 'পুনশ্চ' দিয়ে পুজোর বিষয় এক লাইন লিখেছিল—জগদ্ধাত্রী-পুজোর খবরটা শুনে সে 'কিউরিয়াস' হয়েছে। মৃগাঙ্ক তখন মেডিকেল কলেজে ঢুকেছে। হংস-শুভ্র ঠিক করলেন, ওকে আর বিলেতে পাঠাবেন না। পাঠানও নি। সোম-শুভ্রও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, মানে, ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র একখানা ডাক-যোগে তাঁর উদ্দেশ্যেও প্রেরিত হয়েছিল। অনুতপ্ত হংস-শুভ্র যখন

সোম-শুভ্রকে পত্র-যোগে আহ্বান করেন, এটা তার আগের ঘটনা। যোগীশ্বরের পৌত্র হিসেবে তাঁকে খবরটা দেওয়া উচিত—এই ভেবেই খবরটা দিয়েছিলেন হংস-শুভ্র। একটু খোঁচা দেওয়াও উদ্দেশ্য ছিল হয়তো। সোম-শুভ্র এর উত্তরে দেবী-সূক্তের একটা নূতন ধরনের ব্যাখ্যা এবং গ্রামের গরিব-দুঃখীদের খাওয়াবার জন্যে শ পাঁচেক টাকা পাঠিয়েছিলেন। শশাঙ্ক-শুভ্র শ্বশুরবাড়িতে ব'সে রইল, অথচ জগদ্ধাত্রীপূজোয় এল না, এতে হংস-শুভ্র মনে মনে খুবই চটলেন। মুখে কিন্তু কিছু বললেন না। পিতা-পুত্রে যে সংঘর্ষটা হয়ে গেল, তা মানসিক।

দ্বিতীয় বছরের পূজোয় শশাঙ্ক-শুভ্র কাঁচা রাস্তা ভেঙে শকটারোহণে হিঙ্গুল গ্রামে সস্ত্রীক হাজির হলেন। বাসন্তী জেদাজেদি না করলে সেবারও যেতেন কি না সন্দেহ। বাসন্তীর জেদাজেদি করবার দুটো কারণ ছিল। বুদ্ধিমতী পুত্রবধূ মাত্রেই শ্বশুর-শাশুড়ীর স্নেহ আকর্ষণ করতে চায়। আমি সকলের স্নেহ আকর্ষণ করতে পারি, আমাকে দেখলে কেউ না ভালবেসে পারে না —এই ধরনের একটা গর্ব্বও বাসন্তীর মনে সদা-জাগরূক থাকত এবং সে গর্ব্বের ন্যায্য খোরাক সংগ্রহ করবার জন্যে সে না পারত এমন কাজ নেই। সবাই আমাকে ঘিরে বাহবা বাহবা করুক, সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির কেন্দ্রবর্ত্তিনী হয়ে না থাকলে জীবনই বৃথা—এই ছিল তার জীবনের মূল প্রেরণা। অনেকে এমনিতেই অর্থাৎ বাসন্তীর কোন আয়াসের অপেক্ষা না রেখেই বাহবা দিত, অনেকের কাছে বাহবা আদায় করবার জন্যে বাসন্তীকে রীতিমত কষ্ট-স্বীকার করতে হ'ত, তৃতীয় একটা একগুঁয়ে দল ছিল যারা কিছুতেই বাহবা দিত না। এই তৃতীয় দল সম্বন্ধে বাসন্তীকে বাধ্য হয়ে মিথ্যাভাষণই করতে হ'ত—উচ্চকণ্ঠে সোচ্ছ্বাসে প্রচার করতে হ'ত যে, ওরাও ওর সম্বন্ধে গদগদ। পরিচিত-মহলে কেউ যে ওর সম্বন্ধে উদাসীন থাকবে এবং আর পাঁচজনে সেটা জানবে, এ চিন্তা বাসন্তীর পক্ষে অসহ্য। তাই সেবার বাসন্তী প্রথমত এবং প্রধানত গিয়েছিল হংস-শুভ্রের বাহবা আদায় করবার জন্যে। দ্বিতীয় কারণটা—মজা দেখা।

গরুর গাড়ি চ'ড়ে মাঠের পর মাঠ ভেঙে পূর্ব্বপুরুষদের বাস্ত-ভিটেয় পৌঁছে, আত্মীয়-আত্মীয়া-পরিবৃত হয়ে জগদ্ধাত্রীপূজো দেখার মধ্যে যে মজা আছে, তা তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেওয়ার মত বস্তুতান্ত্রিক মন বাসন্তীর তখনও হয় নি। সেই সবে বিয়ে হয়েছে। শশাঙ্কর কিন্তু হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে যে মজায় তার মন সাড়া দিত, সে মজার প্রধান উপকরণ অর্থ। নিরর্থক গরুর গাড়ি চ'ড়ে একটা অজ-পাড়াগাঁয়ে গিয়ে জগদ্ধাত্রীপূজোর নামে অকারণ শক্তি ও সময় অপব্যয় করার মধ্যে কি মজা যে থাকতে পারে, তা তাঁর মাথায় আসে নি। কিন্তু তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তরুণী ভার্য্যা যখন হিঙ্গুল গ্রামে যাবেন ব'লে ঝুঁকলেন, তখন 'অন্ প্রিন্সিপ্ল' তিনি বাধা দিতে পারলেন না। সঙ্গেও আসতে হ'ল। দুরূহ রাস্তায় অবলা পত্নীকে একা আসতে দেওয়াটাও 'অন্ প্রিন্সিপ্ল' অনুচিত। সুতরাং বিবেকের খাতিরেই সেবার শত অসুবিধা ভোগ ক'রেও তিনি হিঙ্গুল গ্রামে গিয়ে হাজির হলেন। আশা করেছিলেন, পিতা উল্লসিত হয়ে উঠবেন। হয়তো মনে মনে হয়েছিলেন, কিন্তু ভাষায় যা প্রকাশ করলেন, তাতে সুর কেটে গেল। পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা ছিল নিম্নলিখিত প্রকার।—

হংস-শুভ্র খালি গায়ে একটি মোড়ার ওপর ব'সে হুঁকোয় কাঁঠালপাতার নল লাগিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন। অদূরে একটা ঝি বাসন মাজছিল, খ'ড়ো চালের একটি ঘরে নগ্নগাত্র কুৎসিত-দর্শন জনকয়েক ময়রা ভিয়ান চড়িয়েছিল, চণ্ডী-মণ্ডপে অবস্থিত গ্রাম্য শিল্পের অদ্ভুত নিদর্শন জগদ্ধাত্রী-প্রতিমাটির সম্মুখে এক পাল উলঙ্গ অর্দ্ধ-উলঙ্গ রুগ্ন ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ভিড় ক'রে, দূরসম্পর্কীয়া কয়েকজন আত্মীয়া সিক্তবসনে কলসী কাঁখে জল আনছিলেন পাশের পুষ্করিণী থেকে। এমন সময় গরুর গাড়িটা এসে থামল এবং তার থেকে নাবলেন সাহেবী স্যুট-পরা শশাঙ্ক-শুভ্র এবং হাই-হিল-জুতো-পরা বাসন্তী। উভয়ে এগিয়ে এসে প্রণাম করতেই হংস-শুভ্র হুঁকোটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন, গুড মর্নিং, আশা করি, মিসেস মুখার্জির রাস্তায় কোন রকম কষ্ট হয় নি।

শশাঙ্ক-শুভ্রের মুখ লাল হয়ে উঠল।

বাসন্তী কিন্তু একমুখ হেসে বললে, বাবা কি যে বলেন!

ঘরের ভেতরে ঢুকে শশাঙ্ক-শুভ্র স্ত্রীকে বললেন, নিউসেন্স! এর পর আর থাকতে ইচ্ছে করছে না, চল, ফিরে যাই।

বাসন্তী আবার একমুখ হেসে বললে, পাগল নাকি!

মনান্তরের এই সূত্রপাত। বহুকাল পূর্ব্বের এই সূত্রটি নানা ঘটনা-পরম্পরায় নানারূপ আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক পাক খেয়ে খেয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছিল, তার ঠিক স্বরূপটি বাইরের লোকের দৃষ্টিগোচর হ'ত না। কিন্তু এরই বিপাকে প'ড়ে শশাঙ্ক-শুভ্র ব্যবসায়-ব্যাপারে হংস-শুভ্রের দাক্ষিণ্য-লাভে বঞ্চিত হলেন। একটা না একটা খিটিমিটি লেগেই থাকত দুজনের মধ্যে। বাসন্তী মাঝে থাকাতে কলহটা কোলাহলে পরিণত হতে পারে নি। হংস-শুভ্র বাসন্তীকে যে খুব পছন্দ করতেন তা নয়, বরং ঠিক উল্টো। মেয়েটার কোন রকম খুঁত ধরতে না পেরে, তার সর্ব্বদা সব রকমে সবাইকে খুশি করবার চেষ্টা দেখে, তার বাপের অগাধ ঐশ্বর্য্যের ঝনৎকারে মনে মনে জ্ব'লে যেতেন তিনি। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। কোনও ওজুহাত না পেলে কি নিয়ে রাগ করবেন? বাসন্তী রাগ করবার কোন সুযোগই কখনও দিত না। মাঝে মাঝে তিনি মৃগাঙ্কর স্ত্রী কনকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে তির্য্যক-পথে বাসন্তীকে আঘাত দেবার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু সে আঘাতও বাসন্তীকে কাবু করতে পারত না। কনকের আরও বেশি প্রশংসা ক'রে বাসন্তী হংস-শুভ্রকে অপ্রতিভ ক'রে দিত। হংস-শুভ্র মনে মনে চটতেন, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার উপায় থাকত না। শেষটা এমন হয়েছিল যে, হংস-শুভ্র বাসন্তীকে মনে মনে ভয় করতেন। বাসন্তীর মধ্যস্থতাতেই পিতা-পুত্রের অন্তরবহ্নি দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে নি। সব দিক বজায় রেখে সকলের প্রশংসা আদায় ক'রে হাসিমুখে অসম্ভবকে সম্ভব করবার শক্তি পরিবারের মধ্যে

একমাত্র বাসন্তীরই আছে। বাসন্তী হাসিমুখে কারও কাছে কখনও কিছু চাইত যখন, 'না' বলবার সামর্থ্য থাকত না তার। যা নিত, তার দশগুণ প্রত্যর্পণও করত সে নানা উপায়ে। আদরে, আবদারে, অভিমানে, অযাচিত উপহারে, অজস্র স্তুতিতে প্রত্যেক পরিচিত লোকের মনে যে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করত সে, তাতে কোন কিছু বেসুরো বাজা অসম্ভব। বাসন্তীর জগৎ ছিল ঐক্যতানের জগৎ। এ রকম স্ত্রীকে নিয়ে শশাঙ্ক-শুভ্র বিব্রত হয়েছেন সারাজীবন। তাঁর সমস্ত হিসাব-নিকাশ, সমস্ত 'প্রিন্সিপ্‌ল', বারম্বার ভেসে গেছে বাসন্তীর খুশির খরস্রোতে। বাসন্তী যা চাইবে, তাই হবে। তাই হওয়াবে সে। অথচ বাসন্তীর ওপর বেশিক্ষণ চ'টে থাকাও অসম্ভব। হেসে কেঁদে শেষ পর্য্যন্ত সে ভাব ক'রে নেবেই।

শশাঙ্ক-শুভ্রের সারাজীবনব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতার একটা কারণ হয়তো বাসন্তী। কিন্তু বাসন্তী না থাকলে তাঁর অশান্তি আরও শতগুণ বাড়ত। বাসন্তী থাকাতে অনেক অশান্তিজনক ব্যাপার গ্লানিকর হয়ে ওঠে নি তাঁর জীবনে। তিনি রেগে এমন অনেক কাণ্ড ক'রে ফেলতে উদ্যত হয়েছেন, যার পরিণাম নিশ্চয়ই ভয়াবহ রকম বিষময় হয়ে উঠত, বাসন্তী যদি দু হাত প্রসারিত ক'রে না আটকাত তাঁকে। তাঁর হঠাৎ-রাগী চিত্ত-তুরঙ্গমের মুখে বাসন্তী-বল্‌গা না থাকলে কোন্ দিন কোন্ অতল গহ্বরে প'ড়ে তলিয়েই যেতেন তিনি। বাসন্তীকে না হ'লে তাঁর চলে না।

সবই বুঝতেন। কিন্তু তবু তাঁর দুঃখ হ'ত। বাসন্তী যদি তাঁর মুখ চাইত একটু। বড্ড বেশি রকম খরচ করে—একেবারে বেপরোয়া। কিছু বলবার উপায় নেই, বললেও শুনবে না। ছেলেবেলা থেকেই ওই ভাবে মানুষ হয়েছে। বাপ অগাধ বড়লোক, আর সে তাঁর আদুরে মেয়ে।

খ

চাকরি-বিমুখ আভিজাত্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত সাহেবী-মেজাজ শশাঙ্ক-শুভ্র যদি দৈবাৎ আলাদিনের প্রদীপ একটা সংগ্রহ করতে পারতেন, তা হ'লে হয়তো তাঁর কোনক্রমে কুলিয়ে যেত। অল্প আয়াসেই অর্থ-সমস্যা সমাধান করতে পারতেন তিনি। পিতৃ-প্রদত্ত বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বন্দীজীবন যাপন করতে হ'ত না তাঁকে। আলাদিনের প্রদীপ আরব্য-উপন্যাসের কল্পলোকেই সম্ভব, এ কথা শশাঙ্কর মত শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকের অবিদিত থাকবার কথা নয়, তবু তিনি সারাজীবন ওই আলাদিনের প্রদীপের সন্ধানেই কাটিয়ে দিলেন। যৌবনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে প্রেরণা জাগিয়েছিলেন তাঁর মনে, তদনুসারেই তিনি চলেছিলেন ; কিন্তু তিনি মাড়োয়ারী নন, বাঙালী ভদ্রলোক—তাই জটিলতাই বাড়ল কেবল, অর্থাভাব ঘুচল না। যোগ্যতা থাক না থাক, অর্থ চাই-ই। পিতা বিমুখ,—নিজেকেই উপার্জ্জন করতে হবে তা। এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে স্বল্প আয়াসে রাশি রাশি টাকা আসবে—সংক্ষেপে এই হয়ে উঠল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। বহুবিধ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার হয়ে, নানা কারবারে বহু টাকা নিযুক্ত ক'রে, অল্প সুদে টাকা ধার ক'রে বেশি সুদ-দেনেওয়ালা ব্যাঙ্কে তা জমা রেখে, নানা রকম শেয়ার কিনে এবং দাঁও-মাফিক তা বিক্রি ক'রে, নূতন ধরনের জীবনবীমা কোম্পানি সৃষ্টি ক'রে, আম জাম কাঁঠাল প্রভৃতি দেশী ফলকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিদেশী বাজারে চালান দিয়ে, দেশলাই-কারখানা বানিয়ে, নূতন ধরনের ভদ্র ছাপাখানা বানিয়ে—বিবিধ বিচিত্র উপায়ে তিনি অর্থাগমের উপায় আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধু ব্যারিস্টার সনৎ-কুমারকে নিষ্প্রভ ক'রে দেবার জন্যে। কিন্তু পারেন নি। পারেন নি, কিন্তু থামেনও নি। বিলিতী মদের মত বিলিতী ব্যবসায়ের নেশাও পেয়ে বসেছিল তাঁকে, অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরেছিল যেন। তিনি ছাড়তে

চাইলেও সেই করাল 'কম্‌লি' কিছুতেই তাঁকে ছাড়ে নি। যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধ'রে—সাহেবী-মেজাজের লোক হ'লেও এই প্রবাদটি তিনি বিশ্বাস করতেন। বস্তুত তাঁর জীবনে এবং মনোবৃত্তিতে দেশী-বিদেশীর একটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে যাওয়াতে তিনি আরও বেশি বিপন্ন হয়েছিলেন। যদিও বোমা-ননসেন্স তাঁর মন থেকে অনেক দিন আগেই অন্তর্হিত হয়েছিল, কিন্তু মনে-প্রাণে তিনি 'ন্যাশনালিস্ট' ছিলেন। এইজন্যেই হোক, বা পরশ্রী-কাতরতার বশেই হোক, সাহেবদের তিনি সুচক্ষে দেখতেন না। তাই পারত-পক্ষে কোন সাহেবী ব্যাঙ্কে তিনি টাকা রাখেন নি, কোন ব্যবসায়ে সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত করেন নি। দেশী ব্যাঙ্কে টাকা রেখে দেশী কর্ম্মচারীদের সহায়তায় তিনি সাহেব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করতেন। নিজে জমিদারের ছেলে, দিলদরিয়া আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন চিরকাল, ব্যবসায় পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে যে বক-ধ্যান বা কাক-বুদ্ধির প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল না। তিনি প্রকাণ্ড বাড়ি ভাড়া ক'রে ব্রেক্‌ফাস্ট-লাঞ্চ-টিফিন-ডিনারের ফাঁকে ফাঁকে দামী মোটরকার-বাহিত হয়ে প্রতিদিন (হ্যাঁ, রবিবার ছাড়া প্রায় প্রতিদিনই) দেশী কর্ম্মচারী-চালিত ব্যবসায়ের কাগজী তত্ত্বাবধান করতেন ফ্যানের তলায় ব'সে ব'সে স্টেনো এবং প্রাইভেট সেক্রেটারির সহায়তায়। এই করতেই ঘেমে উঠতেন। নানারূপ স্নায়বিক অবসাদ ঘটত। বন্ধু-বান্ধবদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সপরিবারে শিমলা কিংবা শিলং দৌড়তে হ'ত বছরে অন্তত একবার। ফলে যা হয়েছিল—বলা বাহুল্য—তার ইতিহাস অতিশয় করুণ। দেশী ব্যাঙ্ক ফেল হ'ল, দেশী কর্ম্মচারীদের অপটুতা অসাধুতা প্রকট হয়ে উঠল ক্রমশ, মুখার্জি সাহেবের স্বদেশ-হিতৈষণা ঋণজালে জড়িত হয়ে উপহাসের খোরাক যোগাতে লাগল সকলের। শেষে দেশী চরিত্র, দেশী সংস্কার, দেশী প্রথা—'এনিথিং' দেশীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন তিনি। বিদেশীদের ওপর বরাবরই রাগ ছিল, স্বদেশীদের ওপরও বীতরাগ হয়ে কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়লেন তিনি কিছুদিন।

চতুর্দ্দিকে অব্যবস্থা ; মাথায় নানা রকম 'বিজ্‌নেস-প্ল্যান' ; বাসন্তীর প্রশংসা-কাঙাল পর-ভোলানো ঘর-জ্বালানো স্বভাবের জন্যে সংসার-খরচ মাসিক দশ হাজারে উঠেছে ; কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই—ছেলেরা অবাধ্য, প্রত্যেকটি কর্ম্মচারী চোর ; সনৎকুমার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ক'রে চলেছে, চৌরঙ্গীতে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি কিনবে নাকি ; অথচ তিনি উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে কোন দিকই সামলাতে পারছেন না। প্রত্যেকটি ব্যবসা টলমল করছে, কয়েকটা ডুবেই গেছে ; কিছু টাকা পেলে হয়তো সামলে উঠতে পারা যেত—বেশি নয়, লাখখানেক টাকা। কিন্তু হংস-শুভ্র দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, বরাদ্দ টাকার বেশি এক কপর্দ্দকও দেবেন না। নাতিদের টাকা দেবেন—শঙ্খ রজত হীরক কম টাকা ওড়ায় নি তাঁর—নিতান্ত বাজে ব্যাপারে উড়িয়েছে, কিন্তু ব্যবসার উন্নতির জন্যে একটি পয়সা দেবেন না তাঁকে তিনি। কাশীর পণ্ডিতদের টাকা দিচ্ছেন, তাঁকে দেবেন না। অদ্ভুত মনোবৃত্তি!

এই সঙ্কটের মুখে শশাঙ্ক-শুভ্রের মনে পড়ল কাকামণিকে। কাকামণি ইচ্ছে করলে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। কাকামণি কেন যে ব্রাহ্ম হয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন শুধু শুধু, তা আজও তাঁর মাথায় ঢোকে নি। ধর্ম্ম জিনিসটার উদ্ভব বর্ব্বর সমাজের কুসংস্কার থেকে—আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা এই কথাই বলেন। নানা বুদ্ধিমান লোক ওই দিয়ে নানা ধরনের মুখোশ তৈরি ক'রে নিজেদের কাজ হাঁসিল করেছে বোকা বোকা লোকদের ঠকিয়ে যুগে যুগে। কাকামণি বোকা লোক নন, তিনি কেন যে এই প্যাঁচে প'ড়ে পর হয়ে গেলেন, তা শশাঙ্কর বুদ্ধির অতীত। এই সামান্য কারণে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা অনর্থক বাধো-বাধো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাধো-বাধো ভাবটা কাটিয়ে উঠতে খুব বেশি সময় অবশ্য লাগে নি শশাঙ্ক-শুভ্রের। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ এর চেয়ে ঢের বেশি দুরূহ কাজ ক'রে থাকে। ঠিক সময়েই কাকামণির কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তিনি। এই সম্পর্কে কাকামণির যে ছবিটি তাঁর মনে আঁকা আছে, তাও অপরূপ। পূর্ব্বে কোন খবর না দিয়েই শশাঙ্ক

গিয়েছিলেন। খবর দিয়ে তাঁর মনকে প্রশ্ন-সঙ্কুল ক'রে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে ব'লে মনে হয় নি। আচম্বিতে গিয়ে পড়লে কোন কিছু আন্দাজ করবার অবসর পাবেন না তিনি, এবং তাতেই সুফল ফলবে ব'লে শশাঙ্কর মনে হয়েছিল। গিয়ে দেখেন, ছোট্ট পরিচ্ছন্ন একটি বেতের মোড়ার ওপর ধপধপে সাদা লংক্লথের ফতুয়া প'রে সোম-শুভ্র অনিমেষ-নয়নে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছেন। মাঠের দিকে চেয়ে শশাঙ্ক-শুভ্রকেও ক্ষণকালের জন্য নির্নিমেষ হয়ে পড়তে হ'ল। বিরাট একখানা সবুজ মখমলের গালিচা কে যেন চক্রবাল-রেখা পর্য্যন্ত বিছিয়ে দিয়েছে। অবশ্য ক্ষণকালের জন্যেই—পরমুহূর্ত্তে তিনি সোম-শুভ্রের দিকে চেয়ে দেখলেন। সোম-শুভ্র ব'সেই আছেন। শশাঙ্কর জুতোর শব্দ হয়েছিল নিশ্চয়; কিন্তু সে শব্দে সোম-শুভ্রের ধ্যানভঙ্গ হয় নি—ধ্যানই করছেন, শশাঙ্কের প্রথমে ধারণা হয়েছিল। অমন নিস্তব্ধ তন্ময় বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে মানুষ যে গম-ক্ষেতের দিকে চেয়ে ব'সে থাকতে পারে, তা শশাঙ্কর পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হ'ত, যদি না তিনি দেখতে পেতেন যে সোম-শুভ্রের দুটো চোখই খোলা রয়েছে। খোলা চোখে এ কি রকম ধ্যান! বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল শশাঙ্ককে। আশ্চর্য্য রকম স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিলেন সোম-শুভ্র। একটু গলা-খাঁকারি দিয়েও যখন তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করা গেল না, তখন শশাঙ্ককে ডাকতে হ'ল।

কাকামণি!

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়ে যেন চমকে উঠলেন তিনি। তারপর চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে শশাঙ্কর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ—নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

শশাঙ্ক! তুই এমন সময়ে হঠাৎ?

তখনও হংস-শুভ্র চিঠি লেখেন নি তাঁকে, তখনও তিনি স্বজন-পরিত্যক্ত হয়ে নির্ব্বাসিত-জীবন যাপন করছেন। স্যুট-পরিহিত ভ্রাতুষ্পুত্রের আকস্মিক

অভ্যাগমে অপ্রত্যাশিত এমন একটা আনন্দোচ্ছ্বাসে সমস্ত অন্তর পরিপ্লাবিত হয়ে গেল তাঁর যে চোখে জল এসে পড়ল। শশাঙ্ক তা হ'লে এখনও ভোলে নি তাঁকে! হাজার হোক, কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছিলেন তো! এর পরই তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন শশাঙ্ক-শুভ্রের সম্বর্দ্ধনার জন্যে। শশব্যস্ত হবারই কথা। নিজে তিনি চা খান না, মাংস খান না, সিগারেট খান না। শশাঙ্কর কিন্তু সবই চাই বোধ হয়, ও কষ্ট সহ্য করতে পারে না—জানেন তিনি। চারদিকে লোক ছুটিয়ে দিলেন। নিজেই তাড়াতাড়ি স্টোভ জ্বালতে ব'সে গেলেন।

হাত-পা-মুখ ধুয়ে, গরম দুধের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খা ততক্ষণ। চা এসে পড়বে এক্ষুনি। আগে যদি একটু খবর দিতিস, কোন কষ্ট হ'ত না। স্টেশনে আমার শামপানিটা রেখে দিতাম। স্প্রিং-দেওয়া গাড়ি, ভাল বলদ, কোন কষ্ট হ'ত না তোর। নতুন যে বলদ জোড়া কিনেছি ঘোড়ার মত দৌড়য়।

গম্ভীর সোম-শুভ্র শিশুর মত প্রগল্‌ভ হয়ে উঠলেন।

কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে পারিবারিক প্রসঙ্গের নানা আলোচনার আড়ালে-আবডালে শশাঙ্ক নিজের বর্ত্তমান জটিল অবস্থাটা ক্রমশ ফুটিয়ে তুললেন। কাকামণির সঙ্গে অনেক দিন ছাড়াছাড়ি, তাঁর মতামত ঠিক জানা নেই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধ না হবারই কথা, তাই এইটেকে প্রাধান্য দিয়েই কথা আরম্ভ করলেন তিনি। প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ এ দেশে অনুসরণ করতে গিয়েই যে তিনি বিপন্ন, তা প্রতিপন্ন করবার জন্যে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক নানা ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁর দুরবস্থার জন্যে যে ঘটনা-পরম্পরা দায়ী, তার ঠিক কোন্ কোন্‌গুলিতে বেশি রঙ ফলাও করলে সোম-শুভ্রের হৃদয় বিগলিত হবে, তা আন্দাজ ক'রে নিতে বেশি বেগ পেতে হ'ল না। বহু ব্যবসায়ে বহু লোকের সংস্পর্শে এসে এ দক্ষতাটা লাভ করেছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ আলাপ করবার পরই লোক-চরিত্র খানিকটা বুঝতে পারতেন। সোম-শুভ্রের চরিত্র তো অনেকটা জানাই ছিল—সুতরাং তাঁর

মর্ম্মস্থলে পৌঁছতে বেশি দেরি হ'ল না। ইচ্ছে করলেই তিনি যে একটা বড় চাকরি পেতে পারতেন, কিন্তু স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্যে তার চেষ্টা করেন নি; ব্যবসায়ে উন্নতি করতে না পারলে এ দেশের উন্নতি নেই, এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই তিনি নানা রকম ব্যবসা ফেঁদেছিলেন এবং স্বদেশী লোকের ওপর অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করার ফলেই যে নৈষ্ফল্য ছাড়া আর কিছু অর্জ্জন করতে পারেন নি—এই সব কথা এমন একটা করুণ আন্তরিকতার সঙ্গে কখনও হেসে কখনও গম্ভীরভাবে তিনি বর্ণনা করলেন যে, কিছুক্ষণের জন্যে সোম-শুভ্র অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর ধারণা হ'ল, শশাঙ্ক তাঁরই মত একটা আদর্শের জন্যেই জীবনপাত করছে এবং হংস-শুভ্র একটা অযৌক্তিক জেদের বশবর্ত্তী হয়েই তাকে সাহায্য করছেন না। শশাঙ্কর বর্ণনাটা আরও মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিল বিশ্বাস-প্রসূত ব'লে। তিনি নিজে সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে, একটা বড় প্রিন্সিপ্‌লের খাতিরেই তিনি অনেক কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ ক'রে এই সব ঝড়ঝঞ্ঝাপাত মাথা পেতে নিয়েছেন। এমন কি কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ আছে ব'লে অনেক সাহেব খদ্দেরের অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত—তবু যতক্ষণ কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল, কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি তিনি। এখন অবশ্য কংগ্রেসের কেউ নন তিনি। মৃগাঙ্কর মত মহাত্মাজীর আধ্যাত্মিক রাজনীতিতে আস্থা নেই তাঁর। রজতের মত ঢাল-খাঁড়া-হীন বিদ্রোহী নিধিরাম সাজতেও চান না তিনি। হীরকের সমাজতন্ত্রবাদ তো তাঁর মাথাতেই ঢোকে না। বস্তুত আজকালকার কোন রকম হুজুকে আর আস্থা নেই তাঁর। অর্থনৈতিক উন্নতি না হ'লে দেশের মুক্তি নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে আগে দেশের লক্ষ্মী-শ্রী ফিরিয়ে আনতে হবে—পরাধীন দেশে অবশ্য তার অনেক বাধা আছে, কিন্তু বাধা সত্ত্বেও তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং ভালভাবে তা করতে পারলেই বাধা আপনি স'রে যাবে—এই তিনি বোঝেন এবং এইজন্যেই তিনি স্বাধীন ব্যবসাতে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। কিন্তু কেউ তাঁকে বুঝলে না।

সোম-শুভ্র নীরবে তাঁর বর্ণনা শুনে যাচ্ছিলেন। একটু ফাঁক পড়তেই হেসে বললেন, এখানে এসে পড়লি হঠাৎ কি মনে ক'রে? একটু বিশ্রামের জন্যে বুঝি? ভালই করেছিস, খুব খুশি হয়েছি আমি। বউমাকেও আনলে বেশ হ'ত। তাঁকে তো দেখিই নি আমি।

শশাঙ্ক-শুভ্রের ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাঁকে মন্ত্রণা দিলে—এই সুযোগ, ব'লে ফেল, আর দেরি ক'রো না। লোহা গরম থাকতে থাকতেই আঘাত করা উচিত।

আঘাত করলেন। ফলও হ'ল আঘাত করার মতই। শোনামাত্রই সোম-শুভ্র বিবর্ণমুখে খানিকক্ষণ মুহ্যমান হয়ে রইলেন। মুখভাবের হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন দেখে শশাঙ্ক-শুভ্রও ভীতই হয়ে পড়লেন প্রথমে। আড়চোখে একবার চেয়ে চুপ ক'রে রইলেন। ক্ষণকাল অস্বস্তিকর নীরবতার পর সোম-শুভ্র ধীরে ধীরে নিজের চোখ-মুখের ওপর হাত বুলিয়ে সমস্ত গ্লানিটা যেন তুলে নিলেন—কোন বিষয়ে মনঃস্থির করবার পূর্ব্বে এ রকম করেন তিনি। তারপর প্রশ্ন করলেন, কত টাকার দরকার তোমার?

অন্তত লাখখানেক না হ'লে তো সামলাতে পারব না।

সোম-শুভ্র উঠে গেলেন। সোম-শুভ্রের বিবর্ণ মুখের তাৎপর্য্য শশাঙ্ক যেমন বোঝেন নি, হঠাৎ এই উঠে যাওয়ার তাৎপর্য্যও তেমনই বুঝলেন না। বিস্মিত হয়ে গেলেন, যখন মিনিট পাঁচেক পরে তিনি ফিরে এসে অত্যন্ত সহজভাবে এক লাখ টাকার চেকখানা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও। এর জন্যে আসবার দরকার ছিল না তোমার এত কষ্ট ক'রে। চিঠি লিখলেই পারতে। এর পর কিন্তু আর জমল না। আঘাত পেলে শামুক বা কাছিম যেমন শক্ত খোলের মধ্যে নিজের সর্ব্বাঙ্গ গুটিয়ে নেয়, দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্যের মধ্যে সোম-শুভ্র তেমনই আত্মগোপন করলেন। টাকার জন্যেই শশাঙ্ক এখানে এসেছে, তাঁর জন্যে নয়, এ ধারণাটা মনে স্পষ্ট হওয়ামাত্রই তিনি আর একবার হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, পারিবারিক বৃক্ষের ছিন্ন শাখা তিনি, অন্তরের যোগ লুপ্ত

হয়েছে, কলমের গাছের মত পর হয়ে গেছেন তিনি। জোর ক'রে আপন হওয়ার চেষ্টা যে বৃথা তা নয়, আত্মসম্মানহানিকর। সে চেষ্টা তিনি আর করলেন না।

চেক পাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই ব্যবসায়-সংক্রান্ত জরুরি কাজের ওজুহাত দেখিয়ে শশাঙ্ক-শুভ্র কলকাতা অভিমুখে রওনা হয়ে পড়লেন। আরও দু-একদিন থাকতে পারতেন, কিন্তু কাকামণির আচরণটা কেমন যেন 'ফানি' ব'লে ঠেকল তাঁর। কলকাতায় পৌঁছে তিনি নিজে যা করলেন, তা আরও 'ফানি'। ব্যবসা সামলাবার জন্যে এক লাখ টাকার সত্যিই অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিন্তু ফিরে এসেই—মানে, হাওড়া স্টেশনেই একজন দালালের মুখে যেই খবর পেলেন যে, ব্যারিস্টার সনৎকুমার চৌরঙ্গীতে যে বাড়িটা কিনবেন প্রায় ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন, সে বাড়িটা এখনও তাঁর কেনা হয় নি, বাড়ির মালিক এক লাখ টাকার কমে বাড়িটা ছাড়তে রাজি নন এবং এক লাখ টাকা দিতে সনৎকুমার ইতস্তত করছেন—অমনই তিনি বাড়ি না গিয়ে সোজা হাজির হলেন সেই বাড়ির মালিকের কাছে এবং কালবিলম্ব না ক'রে কিনে ফেললেন বাড়িটা। ব্যবসাতে ঘা খাবার সম্ভাবনাটা রইল অবশ্য। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বহু বার বহু রকম ঘা খেয়ে খেয়ে মন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ছিলই, ভাবলেন, এটাতে নতুন আর কি হবে! সনতের ওপর টেক্কা দিয়ে বাড়িটা কিনে ফেলতে পারাতে বরং সে ক্ষতের ওপর আরামপ্রদ মলম পড়ল একটা। ব্যবসাতে লোকসান হ'ল কিছু, ছ মাসের মধ্যে কিন্তু টাকাও জুটে গেল কিছু আবার। শেয়ার-মার্কেটে অপ্রত্যাশিত রকম কিছু পেয়ে গেলেন। নিজেদের অমন প্রকাণ্ড একটা বাড়ি হওয়াতে গদগদ বাসন্তী তার পঞ্চাশ হাজার টাকার গয়নার সেটটা বাঁধা দিতে রাজি হ'ল। সময় দিলেন অনেক পাওনাদার। পরের বছর ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ ক'রে উদ্ধার করলেন গয়নার সেট, শিলং শহরে বাড়ি কিনে ফেললেন একটা। কিন্তু হুশ ক'রে সব ডুবে গেল আবার পাটের ব্যবসায়ে অত্যধিক ঝুঁকি নিতে গিয়ে তার পরের বছর।

কয়েকজনের পরামর্শে শটিফুডের ব্যবসাতে নাবলেন। তাতেও গেল কিছু টাকা।···উত্থান-পতন চলছেই সারাজীবন ধ'রে। সমস্ত খতিয়ে এই কিছুদিন আগে সম্প্রতি অনুভব করেছেন যে, পতনের দিকটাই ভারী বেশি। সমস্তই যেন পতনোম্মুখ। শ্বশুরের কাছে টাকা ধার ক'রে—হ্যাঁ, ধার ব'লেই নিয়েছেন তিনি—বাসন্তীর নামে মিল কিনেছেন একটা। তাতে কিছু লাভ হয়ে যদি কিছু ধার শোধ হয়! ধার, ধার, চতুর্দ্দিকে কেবল ধার! বাবার সঙ্গে মতের মিল নেই···কার সঙ্গেই বা আছে!

মাস ছয়েক পরে।

টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিয়ে অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে বাইরের ঘরে ব'সে ভাবছিলেন শশাঙ্ক-শুভ্র। এ কি অত্যাচার! বাড়িটা ধর্ম্মশালা নাকি! যার যখন খুশি আসবে, যতদিন খুশি থাকবে! হ'লই বা মাসতুতো ভাই! পক্ষাঘাতগ্রস্ত কাকাকে নিয়ে আমার এখানে গুষ্টিসুদ্ধ মিলে উঠে চিকিৎসা করাবে তার! কলকাতায় বাড়ি আছে ব'লে চোরের দায়ে ধরা পড়েছি নাকি! বাবা লিখেছেন, নিজেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসছেন তাঁদের—বুড়ো বয়সে এসব ঝঞ্ঝাট পোয়াবার কি দরকার তাঁর? আত্মীয়-বাৎসল্যটা আরও যেন বেড়েছে, কেউ গিয়ে ধরলেই হ'ল। যেখানে সেখানে এ রকম উপকার করবার মানেই বা কি? ওরা কি 'নীডি'? মোটেই নয়। বাঙালী-জাতের স্বভাবই হচ্ছে পরের স্কন্ধে আরোহণ করা। না, 'অন প্রিন্সিপ্‌ল' এসব তিনি সহ্য করবেন না। বাবা চটবেন, চটুন। কাণ্ট হেল্‌প।

···ঈজি-চেয়ারে শুয়ে পায়ের পাতা নাচাতে নাচাতে আবার পাইপটা ধরালেন। বহুদিন আগেকার আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। ষষ্ঠীচরণকে নিয়ে সে কি কাণ্ড! বাবার দূরসম্পর্কের পিসী ভুবনমোহিনী দেবীর

বহুপত্নীক স্বামীর বংশধর ষষ্ঠীচরণ, কোথাও কিছু নেই, একদিন বাবার এক চিঠি নিয়ে এসে হাজির। সমস্ত পরিচয় দিয়ে বাবা লিখেছেন—অর্থাভাবে পড়তে পারছে না, তোমার বাসায় রেখে বি. এ. পড়বার সুযোগ দিও একে। ছোকরা গরিব ছিল অবশ্য, কিন্তু মূর্ত্তিমান জানোয়ার একটা। হাতের নখ কাটত না, চোখের পিচুটি পুঁছত না, চবর-চবর ক'রে পান চিবোত খালি, আর পিক ফেলত যেখানে সেখানে, পেটে পিলে, মাথায় প্রকাণ্ড টিকি। সব সহ্য ক'রে তবু তাকে বাসায় রেখেছিলেন শশাঙ্ক। ছোকরা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মাথা ঠিক রাখতে পারলে না। নবোদ্ভিন্নযৌবনা বাসন্তীকে দেখে—বাসন্তীর তখনও ছেলেপিলে হয় নি—ছোকরার মাথা ঘুরে গেল। তার সঙ্গে বার বার হেসে হেসে কথা ক'য়ে, আর সদা-সর্ব্বদা তার সুখ-সুবিধার দিকে নজর দিতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে তার মাথা আরও গুলিয়ে দিলে বাসন্তী নিজেই। হঠাৎ একদিন বাসন্তীকে প্রণয়-নিবেদন ক'রে বসল সে। এর পর আর তাকে বাড়িতে রাখা চলল না। চাবকে দূর করা উচিত ছিল, কিন্তু বাসন্তী তা করতে দেয় নি, ভদ্রভাবেই বিদেয় করতে হ'ল। হস্টেলে গিয়ে রইল সে। 'ওয়ার্ড' দিয়েছিলেন তাকে বি. এ. পর্য্যন্ত পড়াবেন, 'ওয়ার্ডে'র নড়চড় করলেন না তিনি, হস্টেলের সমস্ত খরচ বহন করলেন। ষষ্ঠীচরণকে হস্টেলে পাঠানো হয়েছে শুনে অসন্তুষ্ট হংস-শুভ্র পত্রযোগে যে গালাগালিটা দিয়েছিলেন তাঁকে, তা ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ হ'লেও শোভনতার সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। কিচ্ছু বলেন নি শশাঙ্ক-শুভ্র, আসল কারণটা খুলে বলা সম্ভবও ছিল না। উত্তরে কেবল লিখেছিলেন—ও রকম একটা নিউসেন্সকে ভদ্র-বাড়িতে রাখা সম্ভব নয় ব'লেই হস্টেলে পাঠাতে হয়েছে। হংস-শুভ্র এর উত্তর দেন নি কোন। বছর খানেক কোন চিঠিই লেখেন নি। এ ঘটনার প্রায় বছর চারেক পরে—শঙ্খ সবে হয়েছে তখন—হিজুলগ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে যাবার জন্যে চিঠি লিখলেন হংস-শুভ্র। দেশের বাড়িতে সব রকম পূজারই পুনঃপ্রবর্ত্তন করেছিলেন তিনি। শশাঙ্ক

লিখলেন—যেতে পারলে খুবই খুশি হব, কিন্তু ষষ্ঠীচরণ যদি আসে তা হ'লে আমি যাব না, অকারণ একটা অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে চাই না। ফেরত ডাকেই হংস-শুভ্রের উত্তর এল—আজকাল তোমাদের আত্মসর্ব্বস্ব স্বজনবিমুখ মনোভাব দেখে দুঃখ হয়। কিন্তু এটা পাশ্চাত্য শিক্ষার অনিবার্য্য ফল ভেবে চুপ ক'রে থাকি। তোমার ভয় নেই, তুমি এস, ষষ্ঠীচরণের আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। সে লক্ষ্ণৌ শহরে প্রফেসারি করছে, পূজোর ছুটিটা ওই অঞ্চলেই কাটাবে লিখেছে। শশাঙ্ক-শুভ্রের যাবার ইচ্ছে ছিল না, বাসন্তীর জেদেই সেবারও যেতে হয়েছিল। রুষ্ট শ্বশুরকে তুষ্ট করবার আগ্রহে শশাঙ্কর আপত্তি টেঁকে নি। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, ষষ্ঠীচরণ সশরীরে বর্ত্তমান। আপাদমস্তক জ্ব'লে উঠল তাঁর।

পিতাকে আড়ালে প্রশ্ন করলেন, আপনি লিখেছিলেন, ষষ্ঠীচরণ আসবে না, কিন্তু ও তো এসেছে দেখছি। আমাকে আগে লিখলে—

এসে পড়ল, কি করি বল? মানা তো করতে পারি না।

আমি থাকব না তা হ'লে।

তোমার খুশি। আমি ওকে চ'লে যেতে বলতে পারব না। ও আমার আত্মীয় লোক। **He has as much right in my house as you have.**

বেশ, আমি চললাম তবে।

সোজা বাসন্তীর কাছে গিয়ে বললেন, চল, এখানে আর এক দণ্ড থাকব না।

বাসন্তীর হাসিটা এখনও মনে পড়ছে তাঁর। বাসন্তী হেসে উত্তর দিয়েছিল, কি ছেলে-মানুষি করছ তুমি!

তুমি থাক, আমি তা হ'লে চললাম।

সেবার অষ্টমীর রাতটা একা একা মেঠো রাস্তা ভেঙেই কেটেছিল তাঁর।

বাসন্তী সঙ্গে আসে নি। পিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না, বাসন্তীকেও ত্যাগ করব—এই জাতীয় নানা প্রতিজ্ঞা করতে করতে পথ হেঁটেছিলেন তিনি,

বেশ মনে পড়ছে। ম্লানায়মান জ্যোৎস্নালোকে নদীপারের শুভ্র কাশবনের ছবিটাও মনের মধ্যে আঁকা আছে এখনও। আশ্চর্য্য!

বাবাকে কি টেলিগ্রাম করলে তুমি, আমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে?

জিজ্ঞেস আবার করব কি! সত্যি কথা লিখে দিলাম—রিগ্রেট। হাউস ফুল, নো রুম।

আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাপু! এমন মুশকিলে ফেল তুমি। ও রামদয়াল, পাশের বাড়িটা দেখ তো, 'টু লেট' লেখা ঝুলছিল দেখেছিলাম, দেখ তো, কোন ভাড়াটে এসেছে কি না!

দরোয়ান রামদয়াল চ'লে গেল।

শঙ্খ পাশের ঘরে ছিল, বেরিয়ে এসে বললে, ভাড়াটে আসে নি এখনও। যা ভাড়া হাঁকছে, মাসে আড়াই শো টাকা।

ভাড়া যা-ই হোক, তুই ঠিক ক'রে আয় বাবা। কাল তোর দাদু আসছেন নবীন ঠাকুরপোদের নিয়ে। এ বাড়িতে কুলুবে না। তাঁকে আর একটা টেলিগ্রাম ক'রে দে যে, বাড়ি ভাড়া করেছি একটা।

বাধ্য বালকের মত চ'লে গেল শঙ্খ-শুভ্র, শশাঙ্কের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই। শশাঙ্কর অনুমতির অপেক্ষা রাখে না কেউ; অথচ শশাঙ্ককেই সব টাকা যোগাতে হয়।

শঙ্খ চ'লে গেলে বাসন্তীর দিকে চেয়ে শশাঙ্ক বললেন, মাসে আড়াই শো টাকা এখন পাব কোথা থেকে? তুমি তো সুব্যবস্থা ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লে।

তুমি টেলিগ্রাম না করলে এই বাড়িতেই কুলিয়ে নেওয়া যেত কোন রকমে। শঙ্খ না হয় তোমার ঘরেই শুত। হীরু আর রজতের ঘর দুটো তো খালিই প'ড়ে আছে।

হীরক-রজতের কথায় ক্ষণিকের জন্যে বাসন্তী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মাতৃহৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠল ক্ষণকালের জন্যে। ওদের জন্যে ঘর আলাদা করা

আছে বটে, কিন্তু সে ঘরে ওরা যে আসবে না, তা সবাই জানে।···সত্যি কি আসবে না?

শশাঙ্ক-শুভ্র বললেন, তিনখানি ঘরে কি হবে ওদের, পঙ্গপাল আসছে এক দঙ্গল।

একতলায় যে ঘরটায় বাক্স-আলমারি-খাট আছে, সেটাও খালি ক'রে দেওয়া যেত—ফার্নিচারগুলো চারিয়ে দিতাম সব ঘরে।

তা হ'লে বাড়ি ভাড়া করতে পাঠালে কেন?

মুচকি হেসে বাসন্তী বললে, তোমার মান রাখবার জন্যে। তুমি যে লিখে দিয়েছ, নো রুম। কাল বড় মোটরখানা নিয়ে বেরিও না তুমি। আমি ওটা নিয়ে স্টেশনে যাব বাবাকে আনতে। নিজে না গেলে হয়তো আসবেনই না তিনি। আচ্ছা, তনিমার কোন খবর আসে নি এখনও?

কই, না।

বেয়ানটি বেশ কিপ্‌টে আছেন। ফোনের দু আনাও খরচ করতে রাজি নন। আমাকেই ফোন করতে হবে রোজ। আমি সেখানেই যাচ্ছি বাড়িটা তুমি ঠিক ক'রো।

হেসে বেরিয়ে গেল বাসন্তী।

শশাঙ্ক-শুভ্র চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। বাসন্তী সব উলটে-পালটে দিয়ে গেল! সারাজীবন ধ'রে সবাই তাঁর সব বিধি-ব্যবস্থা বারংবার উলটে দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর মুখের দিকে কেউ চাইবে না; এমন কি, ছেলেরাও না। শঙ্খ এক হিসেবে ভাল বটে, রজতের মত খামখেয়ালী নয়, হীরকের মত পাগলও নয়। কিন্তু ওর বুকের পাটা ব'লে কোন জিনিসই নেই যেন। কেমন যেন অত্যন্ত ভালমানুষ-গোছের; সর্ব্বদা যেন সঙ্কুচিত হয়ে আছে।—ওকে দেখলে পুত্র-গর্ব্বে মন ভ'রে ওঠে না। নিয়মিত আপিস করে, সন্ধ্যাহ্নিক করে, সরু-গোছের একটা টিকিও রেখেছে। নিজের ঘরটিতে চুপচাপ ব'সে বই পড়ে খালি, কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। বাবা ওকে

ছেলেবেলায় কাশীতে এক টোলে পাঠিয়ে সেই যে ওর মনে কি এক ঘুণ ধরিয়ে দিলেন, কেমন যেন জরদ্গব-গোছ হয়ে গেছে। জোর ক'রে টেনে এনে হিন্দু-স্কুলে ভরতি ক'রে না দিলে ওর কোন পদার্থই থাকত না আর। এই উপলক্ষ্যে বাবার সঙ্গে মনোমালিন্যের কথাটা মনে পড়ল। মুখে যদিও কিছুই বলেন নি, কিন্তু আমলকী-ভেঞ্চারে একটি পয়সাও সাহায্য করলেন না এইজন্যে।

বেয়ারা এসে একখানা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল—মৃগাঙ্ক জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। মৃগাঙ্কটাও যেন কি! হ'ল ডাক্তার, মাতল খদ্দর নিয়ে। যা কিছু রোজকার করে, ওতেই যায়। দুটো মেয়ে আছে, একটা ছেলে আছে, সেসব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। বোর্ডিংে বোর্ডিংে মানুষ হচ্ছে তারা। বাবা বলেছিলেন, আমার বাসাতে থেকেই পড়ুক ওরা—বাসন্তীও সায় দিয়েছিল তাতে। আশ্চর্য্য মনোবৃত্তি এদের! আমি যেন একটা অফুরন্ত জলাশয়, যার যখন খুশি এসে কলসী ভ'রে ভ'রে নিয়ে যাবে! বাসন্তী সায় দিয়েছিল—বাসন্তী তো দেবেই; কনক কিন্তু রাজি হয় নি। বাবার কাছ থেকে মাসহারা নিতেও রাজি হয় নি সে। রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল ওম্যান! ওই তো ঠিক। শুক্তি-মুক্তা-নবনীর পড়ার খরচ নিশ্চয় এস্টেট থেকে বাবা দেন··· মৃগাঙ্কর দাতব্য চিকিৎসালয়ের খরচও বাবা দেন বোধ হয় কিছু। মৃগাঙ্ককেও তো বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক'রে দেবার কথা। টাকার কথা মাথায় এসে পড়াতে শশাঙ্ক-শুভ্র অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, মনে মনে তিনি যোগ করছেন, আগামী মাসে কার কত টাকা দেনা শোধ করতে হবে। মিলটা যদি ঠিকমত চলে, আর গমের দর মণ-প্রতি যদি আট আনা ক'রেও চড়ে, তা হ'লে দেনা শোধ করতে কতক্ষণ! রজত আর হীরক যদি ওসব বাজে ব্যাপারে উন্মত্ত না হয়ে ব্যবসাতে নাবত আমার সঙ্গে—শেষ পর্য্যন্ত নাবতে হবেই, ওসব বাজে নন্‌সেন্স নিয়ে বেশি দিন কাটানো যায় না। আমিও একদিন বোমার দলে যোগ দিয়েছিলাম—হেঃ!···রজত হীরক

দুজনের মুখই পর পর ভেসে উঠল মনের ওপর। ছেলে দুটো…নিজের মনের ব্যবহারে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন একটু পরে। মনের অন্তরতম প্রদেশে ছেলে দুটো যে আসন অধিকার ক'রে আছে, তা শ্রদ্ধার আসন। বাই জোভ—না না, শ্রদ্ধা করবার মত কিছু নেই ওদের আচরণে, ওরা ভুল পথে চলছে—অর্থনৈতিক উন্নতি করতে না পারলে, দেশের উন্নতি নেই। পিস্তল ছুঁড়ে কিংবা কুলী ক্ষেপিয়ে তা হবে না। ওয়েট এ বিট। তিনি নিজেই হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবেন, দেশের উন্নতি কি ক'রে করতে হয়! ভাল একটা ব্যাঙ্ক খুলতে হবে আগে। সোৎসাহে উঠে ব'সে ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে পাইপটা ধরালেন আবার।

ঝনঝন ক'রে ফোনটা বেজে উঠল।

হ্যালো, কে? বাসন্তী? হ্যাঁ, আমি। ও, তনিমার ছেলে হয়েছে? এক্ষুনি? ব্যাটাছেলে? বাঃ, আচ্ছা, যাচ্ছি। বাসন্তী ফোন করছে শঙ্খর শ্বশুর বাড়ি থেকে।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ মনে হ'ল, বুড়ো হয়ে গেলাম, পৌত্র হ'ল! তারপরই মনে হ'ল, নাতিকে কেন্দ্র ক'রে বাসন্তী এইবার একটা খরচের তুফান তুলবে। ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে পাইপটা কামড়ে ধরলেন। বেশিক্ষণ ব'সে থাকতে পারলেন না কিন্তু। স্টেশনেও যেতে হবে একবার, মৃগাঙ্ক আসছে এই ট্রেনে।

চার

মৃগাঙ্ক-শুভ্র

ক

ছেলেবেলায় হিঙ্গুল-গ্রামে একবার জগদ্ধাত্রী-পূজা উপলক্ষ্যে গিয়ে মৃগাঙ্ক-শুভ্র এক বৈষ্ণবীর মুখে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক একটি কীর্ত্তন শোনেন। সে কীর্ত্তন কিশোর মৃগাঙ্ক-শুভ্রের প্রাণ স্পর্শ করেছিল। জ্ঞাতসারে না হোক, অজ্ঞাতসারেই সেদিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কোন্ সুরে তাঁর জীবন-বীণা বাজবে। রাধা জাতি-কুল-মান সমস্ত ত্যাগ ক'রে পাগলিনী হয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে। কোন বাধাকেই বাধা ব'লে মনে করেন নি তিনি। কোন কৃচ্ছ্রসাধনই কষ্টকর ব'লে মনে হয় নি তাঁর কাছে। কৃষ্ণপ্রেম-বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ ক'রে কৃতার্থ হয়েছিল তাঁর অন্তর। প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগের এই অপরূপ কাহিনী ভারতবর্ষের কাব্যে-দর্শনে ধর্ম্মে-কর্ম্মে প্রাসাদে-পর্ণকুটীরে ধনী-দরিদ্র আপামর-ভদ্র সকলের অন্তরে যে মন্ত্রবলে আজও সুধা-সিঞ্চন ক'রে চলেছে, সেই মন্ত্রবলেই কিশোর মৃগাঙ্ক-শুভ্র সহসা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ত্যাগ না করতে পারলে জীবন বিফল—ত্যাগই তৃপ্তি, ত্যাগই সুখ। রূপসী বৈষ্ণবীর কমনীয় কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে জীবন-যজ্ঞের মূল মন্ত্রটি যেন তাঁর মর্ম্মস্পর্শ করেছিল সেদিন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা বৃহৎ আদর্শের জন্য প্রয়োজন হ'লে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করতে পারতেন সেদিন তিনি। সেদিন কিন্তু সামনে কোন আদর্শ ছিল না, প্রয়োজন হয় নি। তারপর অনেকদিনই হয় নি। স্কুল-পাঠ্য পুস্তকেই মন নিবদ্ধ থাকত, একটু কুনো স্বভাবের লোকও ছিলেন, বাইরের কোন খবরই রাখতেন না। কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হলেন যখন, বৃহৎ কোন আদর্শ চিত্তকে উন্মুখ করে নি তখনও। মা মারা গেলেন হঠাৎ। দাদা তখন হোমরুল ক'রে বেড়াচ্ছেন তিলকের সঙ্গে। মৃত্যুকালে মায়ের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত

হ'ল না তাঁর। শ্রাদ্ধের সময় এলেন বটে, কিন্তু মাথা কামাতে চাইলেন না। সহসা পিতার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল মৃগাঙ্ক-শুভ্রর। মায়ের মৃত্যুতে, দিদির গৃহত্যাগে, তিনজন উপযুক্ত পুত্রের অকাল-মরণে, ইন্দুর বৈধব্যে, কাকার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে, দাদার অসদ্ব্যবহারে যে পিতার অন্তর অহরহ পুড়ে যাচ্ছে, তাঁকে কি ক'রে একটু শান্তি দেওয়া যায়—এই হ'ল মৃগাঙ্ক-শুভ্রর তখনকার লক্ষ্য। কায়-মনোবাক্যে তিনি পিতার অনুবর্ত্তী হয়ে চলতে লাগলেন। সবে তখন আই. এস-সি. পাস ক'রে বি. এস-সি. পড়ছেন, পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, বাবার ইচ্ছা অনুসারে সন্ধ্যাহ্নিক একাদশী করেন, মুরগি খাওয়া পাপ ব'লে মনে হয়। বেশ চলছিল। হঠাৎ একদিন হাতে এল বিবেকানন্দের বই একখানা। নূতন একটা আদর্শের সন্ধান পেলেন যেন। যে মহাপুরুষের বাণী সমসাময়িক বঙ্গদেশের কানে ঢোকে নি, উদ্বুদ্ধ করেছিল মাদ্রাজকে, আমেরিকাকে, লণ্ডনকে, তাঁর বজ্রনির্ঘোষে সহসা ঘুম ভেঙে গেল যেন মৃগাঙ্ক-শুভ্রের। মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করলেন গিয়ে, বিবেকানন্দের সমস্ত বই প'ড়ে ফেললেন, রাতের পর রাত জেগে। এই বীর সন্ন্যাসীর বাণী তাঁর মনে অনেকদিন আগে শোনা সেই সুরটিকেই আবার যেন জাগিয়ে তুলল: আত্মত্যাগ ক'রে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। আত্মোৎসর্গ না করতে পারলে সুখ নেই। সন্ন্যাসী হতে হবে, দেশহিতব্রতে সর্ব্বত্যাগী বীরের মত অগ্রসর হতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য ক'রে শক্তিসংগ্রহ করতে হবে তার জন্যে। কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে লাগলেন কিছুদিন। মনে হ'ল, যেন বৃহত্তর জীবনের আহ্বান এসে পৌঁছেছে—যেমন এসে পৌঁছেছিল বুদ্ধের কাছে, চৈতন্যের কাছে, বিবেকানন্দের কাছে। হিমাচল থেকে কুমারিকা, গুজরাট থেকে আসাম—বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র প'ড়ে রয়েছে। সূচীভেদ্য অন্ধকার চতুর্দ্দিকে—তামসিকতার অন্ধকার। সে অন্ধকারকে দূর করতে হবে আমাদের স্বকীয় সভ্যতার আলোক-পাত ক'রে। সন্ন্যাসীর আদর্শেই গ'ড়ে তুলছিলেন

নিজেকে মনে মনে—রাখাল মহারাজের সঙ্গে দেখা করতেন প্রায়ই গিয়ে—দীক্ষা নেবেন নেবেন করছেন, এমন সময় হঠাৎ একদিন সব ভেঙে গেল।

হংস-শুভ্র একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, একটি গরিব ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধার করতে হবে। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি।

নির্ব্বাক হয়ে রইলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র।

হংস-শুভ্র বলতে লাগলেন, মেয়েটি সুন্দরী। লেখাপড়া জানে, এবার ম্যাট্রিক পাস করেছে।

মৃগাঙ্ক নির্ব্বাক।

চুপ ক'রে আছ কেন?

আমি ভেবেছি বিয়ে করব না।

ও। এ রকম অদ্ভুত কথা ভাববার মানে?

রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবার ইচ্ছে—

হংস-শুভ্র কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন, গেরুয়া সিল্কের জোব্বা প'রে বক্তৃতা দেওয়ার বাসনা হয়েছে? বিয়ে ক'রেও তা করা যায়। কালই হাফ-এ-ডজন অর্ডার দিয়ে আসতে পার। কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে দাঁড়ালেই শ্রোতা জুটে যাবে। বক্তৃতার বিষয়টা কি? বেদান্ত, না বিজ্ঞান?

মৃগাঙ্ক চুপ ক'রে রইলেন নতনেত্রে।

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে হংস-শুভ্র আবার বললেন, পৃথিবীতে এমন কোন মহৎ কাজ নেই, যা বিয়ে ক'রে করা যায় না। স্বয়ং রামকৃষ্ণও বিবাহিত ছিলেন। যাক, অত কথায় কাজ নেই, তুমি যা ঠিক করেছ তাই কর, আমি—

হংস-শুভ্র হঠাৎ থেমে গেলেন এবং একটু হাসলেন। তাঁর এ হাসিটি বড় মর্ম্মান্তিক। খুব রাগ হ'লে বা দুঃখ হ'লে এই হাসিটি হাসেন তিনি। হাসি শুনে মৃগাঙ্ক-শুভ্র পিতার দিকে চেয়ে দেখলেন, স্মিত অপ্রস্তুত মুখে হংস-শুভ্র জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হ'ল, ওই

স্মিত-হাসির অন্তরাল ভেদ ক'রে তাঁর সারা জীবনের শোক-দুঃখ ক্ষোভ-পরাজয় যেন ঠেলে বেরুতে চেষ্টা করছে, হংস-শুভ্র আর যেন আত্মসম্বরণ করতে পারছেন না। স্মিত-হাসির সূক্ষ্ম পরদাটা কাঁপছে। আত্মীয়স্বজন, সমাজ, শাসনকর্ত্তা, অদৃষ্ট, ভগবান কেউ তাঁর প্রতি সুব্যবহার করে নি। তিনি আশা করেছিলেন, মৃগাঙ্ক হয়তো তাঁর মনের মত হবে। মৃগাঙ্ক নিজেও তাই আশা করেছিলেন, এতদিন পিতার অনুবর্ত্তী হয়েই আদর্শ পুত্রের জীবন যাপন ক'রে এসেছে সে, কায়মনোবাক্যে পিতাকে সুখী করাই এতদিন জীবনের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু···। হঠাৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হ'ল, পিতাকে সুখী করবার জন্যে নিজের আদর্শ ত্যাগও তো ত্যাগ—সে ত্যাগটাও তো কম বড় নয়, কিন্তু···। আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন, তিনি। পিতার সুখের জন্যে নিজের আদর্শ ত্যাগ করতে হৃদয় কুণ্ঠিত হচ্ছে কেন অনিবার্য্যভাবে যে কথাটা এর পর তাঁর মনে হ'ল, তাতে তিনি চমকে গেলেন। বাবাকে তিনি ভালবাসেন না, এতদিন ভালবাসার একটা ভান ক'রে এসেছে, শুধু। প্রাণ দিয়ে সত্যি সত্যি যাকে ভালবাসা যায়, তার জন্যে আদর্শ কেন, সমস্ত কিছু ত্যাগ ক'রে যে-কোন কষ্ট-স্বীকার করতে কুণ্ঠা হয় না, আনন্দ হয়। বাবার প্রস্তাবে মনে দ্বিধা জাগছে, মানে বাবাকে তিনি ভালবাসেন না। তিনিও বাবাকে ভালবাসেন না!···

অমন গম্ভীর হয়ে যাবার দরকার নেই। তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর। আমি আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি তাদের যে, তোমার বিয়ে করবার মত নেই। তোমার মতামত যে নিতে হবে, এটা খেয়াল হয় নি আমার। হওয়া উচিত ছিল।

হংস-শুভ্র উঠতে যাচ্ছিলেন, মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, আপনি যদি ঠিক ক'রে ফেলে থাকেন, তা হ'লে তাই হোক, আমার আপত্তি নেই।

মত বদলাবার আগে আর একটা কথাও শোনা দরকার তোমার। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে তোমাকে যেতে বাধ্য করছি, এ রকম কোন অপবাদ নিতে রাজি নই আমি। তুমি এ বিয়ে করলে আমি অবশ্য খুবই খুশি হব; কিন্তু না

করলে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করব, তা ভাববার দরকার নেই। এটুকু অন্তত জেনে রাখ, সাবালক হবামাত্র তোমার প্রাপ্য বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি নিয়মিত পাবে, শশাঙ্ক যেমন পাচ্ছে।

এই কথায় পিতার প্রতি এমন একটা গভীর শ্রদ্ধা মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে উৎসারিত হ'ল যে, ভাবাবেগে তিনি নিরুত্তর হয়ে রইলেন।

এ কথা শোনবার পরও তোমার আর আপত্তি নেই ?

না।

মৃগাঙ্ক-শুভ্র বেরিয়ে চ'লে গেলেন। হংস-শুভ্র চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি তাঁরও শ্রদ্ধা জেগেছিল ইদানীং। হঠাৎ মনে হ'ল, ছেলেকে ধর্মপথ থেকে বিরত ক'রে অন্যায় করলুম কি ? তখনই মনে হ'ল আবার, সে রকম নিষ্ঠা থাকলে ও রাজি হ'ত না কখনও। তা ছাড়া গার্হস্থ্য-ধর্মও ধর্ম…

উঠে চ'লে গেলেন।

সাত দিনের মধ্যেই কনকের সঙ্গে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের বিয়ে হয়ে গেল।

অল্পদিনের মধ্যেই হংস-শুভ্র অনুভব করলেন যে, আবার ভুল করেছেন তিনি। বুঝতে পারলেন, গরিবকে দয়া করাটা হৃদয়বত্তার পরিচায়ক হ'লেও গরিবের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেওয়াটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় সব সময়ে। দরিদ্র-কন্যা কনকের মনটাও যে দরিদ্র, তা তার অতি-পরিমিত আহার-ব্যবহারে, ব্যয়-সংক্ষেপ করবার চেষ্টায়, পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতনতার অভাবে, দাস-দাসীদের চুরি ধরবার আগ্রহে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা লক্ষণে অগোচর রইল না হংস-শুভ্রের কাছে। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন যদিও, বাইরে কিন্তু কনকের ধ্বজাটাকেই যখন তখন সাড়ম্বরে উচ্চে তুলে আস্ফালন ক'রে বেড়াতে লাগলেন তিনি সকলের কাছে। কনক মিতভাষিণী, শান্তপ্রকৃতির এবং কনকের বাবা কেরানী হ'লেও আচার-নিষ্ঠ হিন্দু, আপিসে যাওয়ার আগে টিকিতে ফুল বেঁধে

পূজো করেন প্রত্যহ—এই দুটো কারণকেই আঁকড়ে ধ'রে উচ্ছ্বসিত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকষে কনকের গিল্টিত্ব ধরা পড়লেও এই ব'লে তিনি সান্ত্বনা পাবার প্রয়াস পেলেন—খাঁটি সোনা দুর্লভ আজকাল, যা পাওয়া গেছে তাই যথেষ্ট। আর যাই হোক, বাসন্তীর মত পর-ভালানে উড়নচণ্ডে হবে না। পরে যদিও ঘা খেয়েছিলেন, গোড়ায় গোড়ায় কিন্তু গিল্টিরই গুণগান করলেন তিনি কিছুকাল। অসম্ভবও হয় নি। কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শেখার কল্যাণে কনকের বহিঃশোভাটা নিন্দনীয় ছিল না নেহাত।

আজন্মব্রহ্মচারী মৃগাঙ্ক-শুভ্র আত্মসমর্পণ করলেন রূপসী কনকের কাছে। কারও কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে তাঁর মন উন্মুখ হয়েই ছিল। কনকের ঔদার্য্য আছে কি নেই, আদর্শ জীবনসঙ্গিনী হবার উপকরণ তার চরিত্রে কতটুকু আছে, এসব বিশ্লেষণ করবার তিনি অবসরও পেলেন না, প্রয়োজনও বোধ করলেন না। তন্বী গৌরাঙ্গী অর্দ্ধ-স্ফুট-যৌবনা বধূকে বাহুপাশে বেঁধে আত্মহারা হয়ে গেলেন তিনি। আত্মস্থ হলেন যখন, তখন শুক্তি মুক্তা নবনী জন্মগ্রহণ করেছে।

ইতিমধ্যে ডাক্তারিটাও পাস ক'রে ফেলেছিলেন। যথারীতি প্র্যাক্‌টিস করবার জন্যে একটা ডিস্‌পেন্‌সারিও খোলা হ'ল। কিন্তু সেখানে জুটতে লাগল রোগী নয়, কংগ্রেস-কর্ম্মীর দল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-আন্দোলনে তখন সমস্ত ভারতবর্ষ তোলপাড় হচ্ছে।

খ

দাম্পত্য-জীবনের যে সময়টা নির্ব্বিঘ্নে কেটেছিল ব'লে কনকের বিশ্বাস, ঠিক সেই সময়টাতেই কিন্তু মৃগাঙ্ক-শুভ্র মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে। নিজের অজ্ঞাতসারেই বীজ তখনই উপ্ত হচ্ছিল, ফসলটা নয়ন-গোচর হ'ল পরে, অর্থাৎ যথাসময়ে। পরে যা অপ্রত্যাশিত, এমন কি অলৌকিক, ব'লে কনকের মনে হয়েছিল, নেপথ্যলোকে অনেক আগে থেকেই

তার যুক্তিযুক্ত একটা উদ্যোগ-পর্ব্ব গ'ড়ে উঠেছিল বইকি। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের আচরণে তা আভাসিতও হয়েছিল, কিন্তু কনকের চোখে তা পড়ে নি। আর একটু কম অহঙ্কারী কিংবা আর একটু বেশি কল্পনা-কুশলী হ'লে পড়ত। সেই সব সামান্য আভাস থেকেই মৃগাঙ্ক-শুভ্রের সম্ভাব্য পরিণামটা আন্দাজ ক'রে নেওয়া অসম্ভব হ'ত না। কিন্তু রূপ-গুণ-বিদ্যা দিয়ে তৈরি যে দুর্গে সে মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে বন্দী ক'রে রেখেছিল, তার দুর্ভেদ্যতা সম্বন্ধে কনকের লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। ভাবতেও পারে নি যে, ভূমিকম্পের এক নাড়াতেই দুর্গের দেওয়াল-গুলো হুড়মুড় ক'রে সব ভেঙে পড়বে একদিন। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের দিকে মনও সে তেমন দিতে পারে নি। মাতৃত্ব-ভার বহন করতে করতে এম. এ. পর্য্যন্ত পরীক্ষা দেবার ঝোঁক পেয়ে বসলে স্বামীর মনের দৈনন্দিন ছোটখাট বিক্ষোভগুলো চোখে না পড়াটাই স্বাভাবিক,—বিশেষত স্বামী যদি একনিষ্ঠ হন। ওই একটি বিষয়েই কেবল স্ত্রীলোকমাত্রেরই মন সদা-জাগরূক। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের নিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলে তাঁর শুষ্ক মুখের বা অনিদ্রার হেতু নির্ণয় করবার সঙ্গত কারণ ঘটত। কিন্তু রাউলাট অ্যাক্ট যে ব্যক্তির নিদ্রা বিঘ্নিত করছে অথবা চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা যার আহারের রুচি হরণ করছে, তার সম্বন্ধে চিন্তিত হওয়ার মত কল্পনাশক্তি কনকের ছিল না। অবসরও ছিল না। এসব নিয়ে আলোচনাও হয় নি কখনও স্বামীর সঙ্গে। স্বভাবতই মিতভাষিণী সে। চুপচাপ নিজের পড়াশোনা নিয়েই থাকত। স্বামী অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে খেয়ে শুয়ে পড়তেন। তাঁর সঙ্গে অহেতুক বাক্যালাপ করবার প্রয়োজনই অনুভব করত না সে। সে জানত, স্বামী তার রূপে মুগ্ধ, শ্বশুর গুণে উচ্ছ্বসিত, পাড়া-পড়শী বিদ্যায় বিস্মিত। এই রূপ-গুণ-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করাটাই তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। নীরবে অনন্যমনা হয়ে তাই সে ক'রে যাচ্ছিল। স্বামীর মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি সে লক্ষ্যই করে নি। তা ছাড়া বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বছর নীরবে নেপথ্যে যে দ্বন্দ্ব তাকে করতে হয়েছিল—খাপ-খাইয়ে-নেওয়ার সে দ্বন্দ্বেও তার সমস্ত চিত্ত ব্যাপৃত থাকত

অহরহ। এঁদো গলির খোলার-ঘর-বাসিনী কেরানী-কন্যাকে যখন হংস-শুভ্র-রূপী হারুন-অল-রশিদের খেয়ালে শুভ্র-পরিবারের বধূর কঠিন ভূমিকায় অকস্মাৎ অবতীর্ণ হতে হ'ল, তখন যেমন ক'রেই হোক, সে ভূমিকার মর্য্যাদা সে রক্ষা করবেই—এই জেদ তাকে পেয়ে বসল। শুধু মর্য্যাদা রক্ষা নয়, মর্য্যাদা বৃদ্ধিও সে করবে—এই হ'ল তার পণ। যদিও বাইরে সে স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল, ভেতরে কিন্তু সে ঠিক ক'রে ফেললে, সকলকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, কেরানীর মেয়ে ব'লে সে হেয় নয়। এই সঙ্কল্পের তাড়নাতেই সে এম. এ. পর্য্যন্ত পাস ক'রে ফেললে তিন-তিনটে সন্তান হওয়া সত্ত্বেও। এম. এ. পাস করা ছাড়া এ বাড়িতে কৃতিত্ব দেখাবার অন্য কোন পথ ছিল না। কেবল বিধিপ্রদত্ত রূপের জোরে এ বাড়িতে সম্মান আদায় করা শক্ত, কারণ এখানে শুধু যে মেয়েরাই রূপসী তা নয়, পুরুষরাও রূপবান। এম. এ. পাস করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই ডিগ্রী-অর্জ্জনের সাধনায় যে পরিমাণ একাগ্রতা তাকে পাঠ্যপুস্তকে নিবদ্ধ করতে হ'ল, ঠিক সেই পরিমাণ একাগ্রতা সে যদি মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ওপর নিবদ্ধ করতে পারত, তা হ'লে হয়তো তার ক্রমপরিবর্ত্তমান মনোবৃত্তির কিছু আভাস সে পেত। কিন্তু রূপ-মুগ্ধ যৌবন-লোলুপ যে ব্যক্তিটির পরিচয় সে বিবাহের কিছুদিন পরেই পেয়েছিল, তার সম্বন্ধে যে আর অধিক কিছু জানার প্রয়োজন আছে—এ কথা তার মনেই হয় নি। বহুবার-পড়া পুঁথির মত তাকে সে ঔদাসীন্যভরে সরিয়েই রেখেছিল। তারও যে বিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব, একনিষ্ঠ প্রেমিক যে একনিষ্ঠ বৈরাগী হয়ে উঠতে পারে—এ কল্পনাও সে করে নি। আর একটা জিনিসও তার কল্পনাতীত ছিল। এত কষ্টে অর্জ্জন করা এম. এ. ডিগ্রী তাকে ঠিক সেই মর্য্যাদা দিতে পারলে না, যা সে মনে মনে কামনা করেছিল। প্রভূত বিদ্যার অধিকারী হয়েও কৃষ্ণকায় খ্রীষ্টানকে শ্বেতকায় খ্রীষ্টান-সমাজে যেমন সসঙ্কোচে বাস করতে হয়, বিদ্যার তকমা প'রে তাকেও তেমনই এই অভিজাত পরিবারে স-সঙ্কোচেই বাস করতে হ'ল। নিজের মন থেকেই তার সঙ্কোচ গেল না। যদিও বাড়ির বড়রা তাকে যথারীতি স্নেহ করতেন, ছোটরাও

যথারীতি সম্মান দেখাতে ত্রুটি করত না, তবু তার কেমন যেন মনে হ'ত, এরা সব নিয়ম-রক্ষা করছে কেবল। মনে মনে তাকে সেই খোলার ঘরের আঁস্তাকুড়ের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ক'রে রেখেছে সবাই।

আই. এ. পরীক্ষার কিছুদিন আগে ইন্দু তো একদিন ঠাট্টাই ক'রে বসল খোলাখুলি।

কেন ওই বাজে বইগুলো মুখস্থ ক'রে মরছ বউদি?

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের লেখা।হিষ্ট্রি, বাজে হ'ল?

আমরা নিজেদের হিষ্ট্রি নিজেরা আগে লিখি, কতটা সত্যি কতটা বানানো আগে সেটা ঠিক হোক, তারপর প'ড়ো ওসব।

এতে যা লেখা আছে তা মিথ্যে?

অন্ধকূপ-হত্যাটা যে মিথ্যে তা তো প্রমাণ হয়েই গেল। ওদের লেখা ইতিহাসে আমাদের অতীত গৌরবের কথা কতটুকু পড়েছ? বুদ্ধ-অশোককে নেহাত চাপা দেওয়া যায় না ব'লেই ওদের সম্বন্ধে দু-চার কথা শুনতে পাওয়া যায়। ওদের দু-চারজনকে বাদ দিলে স্কুলপাঠ্য ইতিহাসগুলোতে আমাদের অতীত তো অন্ধকারময়। যা কিছু আলো ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে—

ইন্দুর চোখে বিদ্যুৎ দেখে কনক চুপ ক'রে রইল। তার মনে হ'ল, তার নিজের চোখের দৃষ্টিতে অমন বিদ্যুৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে ওঠে না—উঠবেও না কোন কালে—হাজার চেষ্টা করলেও উঠবে না। কেমন যেন ভীতু বাছুরের মত চোখ তার। আয়নায় দেখা নিজের চোখের প্রতিচ্ছবি মনের ওপর ফুটে উঠল নিমেষমধ্যে।

তা ছাড়া কি হবে প'ড়ে?

মৃদু হেসে কনক উত্তর দিয়েছিল, আর কিছু না হোক, ডিগ্রী হবে।

চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না।

ইন্দু উঠে চ'লে গেল। কিন্তু কথাগুলোর দাগ থেকে গেল কনকের মনে। সে তা হ'লে চেনা বামুন নয়, তাই উপবীতগুচ্ছটাকে আস্ফালন করবার চেষ্টা

করছে সাড়ম্বরে। কি স্পর্দ্ধা মেয়েটার! সত্যই মেয়েটার স্পর্দ্ধা অস্বস্তিকর। দুবার বিধবা হয়ে সকলের মাথা কিনে বসেছে যেন। কারও কিছু বলবার জো নেই। তা ছাড়া কি যে সব কাণ্ড করে গোপনে গোপনে, ভাবলেও শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়। একদিন দুপুরবেলা এক বোরখা প'রে এসে হাজির। বাড়িতে কেউ তখন নেই। কনক একা ব'সে পড়ছিল। ঘরে ঢুকে বোরখা খুলে ছোট একটা পুলিন্দা বার ক'রে বললে, রেখে দিতে হবে এটা লুকিয়ে। কাল এসে নিয়ে যাব। একটা প্রতিশ্রুতি কিন্তু চাই।

কি?

খুলে দেখতে পাবে না এর ভেতর কি আছে। এর সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলতেও পাবে না। বললে আমার মৃত্যু। রাজি আছ?

বেশ।

এইবার আমাকে তোমার জড়োয়া গয়নাগুলো আর একখানা বেশ রঙচঙে ভাল শাড়ি দাও। বোরখাটা এইখানে থাক। কাল তোমার গয়না শাড়ি ফেরত দিয়ে এইগুলো নিয়ে যাব।

গয়না শাড়ি প'রে গটগট ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেল—যেন একটা রাজরাণী। রাস্তায় নেবে একটা ট্যাক্সি ডেকে চেপে বসল। কি সপ্রতিভ! হাজার চেষ্টা করলেও কনক ও রকম পারত না। দেখলে হিংসে হয়, রাগও হয়। কনক নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে নি। কৌতূহল সম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল তার পক্ষে। পুলিন্দাটা খুলে দেখেছিল—দেখে শিউরে উঠেছিল। দুটো রিভল্‌ভার! যদিও কাউকে বলে নি সে কথা, তবু ইন্দুর কাছে ধরা প'ড়ে গিয়েছিল তার পরদিন।

সামান্য এ লোভটুকু সামলাতে পারলে না বউদি—কি তুমি!

ইন্দুর চোখের সে হাস্যপ্রখর ব্যঙ্গশানিত দৃষ্টি সে ভুলতে পারবে না কোনদিন। নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হয়েছিল সেদিন ইন্দুর কাছে। কার কাছেই বা নিজের মহত্ত্ব প্রমাণ করতে পেরেছে সে? বাসন্তীর মহিমার

তুলনায় সে তো নগণ্য। বাসন্তীর হাস্য-আলাপ দয়া-দাক্ষিণ্য দান-প্রতিদান উৎসব ঐশ্বর্য্য-অলঙ্কৃত সহস্রবিধ অজস্রতার উচ্ছ্বসিত কল-স্রোতের মুখে খড়ের টুকরোর মত ভেসে যায় তার সঙ্কুচিত ব্যক্তিত্ব। বাসন্তীর পাশে তাকে সূর্য্যকিরণ-লাঞ্ছিত চন্দ্রের মত ম্লান দেখায়। নিজেই সে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। শঙ্খ-রজত-হীরকের দিকেও সে ভাল ক'রে চোখ তুলে চাইতে পারে না, অথচ তাদের কত কচি কচি দেখেছে। দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল সব, তাকে ছাড়িয়ে উঠল। বর্দ্ধমান শালচারাদের দিকে বিস্মিত নয়নে চেয়ে রইল ছোট পেয়ারাগাছ সে। নিজের পেটের ছেলে নবনীকেই সে ভাল ক'রে বুঝতে পারে না। কেমন ক'রে যেন কথা কয়, কেমন ক'রে যেন চায়! অত শখ ক'রে অত দামী পিয়ানোটা কিনলে, অথচ একজন বন্ধু চাইবামাত্র দান ক'রে দিলে এক মুহূর্ত্তে! জিজ্ঞেস করাতে হাত উলটে কেমন ক'রে যেন হাসলে একটু! এরা ভিন্ন জাতের লোক, ভিন্ন জগতের, এদের সঙ্গে তার মেলে না। মেলে না, কিন্তু মেলাবার চেষ্টা করতেও ছাড়ে নি সে। পাদ-প্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা অভিনয় করতে করতেই সারাটা জীবন কাটল। অপটু অভিনেতা যেমন অত্যধিক বেশি হাত-পা নেড়ে বা অস্বাভাবিক চীৎকার ক'রে অভিনয়ের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করে, সেও তেমনই একটা বড়-রকম ডিগ্রী আস্ফালন ক'রে অনাভিজাত্যের কলঙ্ক স্খালন করবার চেষ্টা করেছিল এবং তা করতে গিয়ে স্বামীর দিকে পর্য্যন্ত ভাল ক'রে দৃষ্টি দিতে পারে নি। যে শ্বশুর তার গুণবত্তায় মুগ্ধ ব'লে তার ধারণা ছিল, সেই শ্বশুরকেও সে যে সন্তুষ্ট করতে পারে নি, তার প্রমাণ মিলল বি. এ. পরীক্ষা দিতে যাবার দিন। সকাল সকাল খেয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করতে গেছে—হংস-শুভ্র তখনও কলকাতার বাড়িতেই থাকতেন—তিনি প্রশ্ন করলেন, এত সকালে কোথাও বেরুচ্ছ নাকি?

আজ আমার পরীক্ষা যে।

ও। সমস্ত দিন তুমি বাড়ি থাকবে না, তোমার ছেলেমেয়েগুলোকে দেখবে কে?

শ্বশুরের কাছে সে প্রশংসা পাবে ভেবেছিল, এ কথা প্রত্যাশা করে নি। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

হংস-শুভ্র বললেন, সাহেবদের নকল ক'রে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করছ কেন বল দিকি? লেখাপড়া শেখ না, ডিগ্রীর জন্যে অত কাঙালপনা কেন?

কনক প্রত্যুত্তর দিতে পারত। কিন্তু চিরকাল মিতভাষিণী সে, চুপ ক'রে রইল। হংস-শুভ্র আবার বললেন, ভালও লাগে এসব করতে! তুমি বই কোলে ক'রে ব'সে থাকবে, আর তোমার ছেলেমেয়েদের কোলে ক'রে ব'সে থাকবে তোমার দাই-চাকরগুলো! মৃগাঙ্কটাও ডাক্তারি ছেড়ে কংগ্রেস ক'রে বেড়াচ্ছে বোধ হয় তোমার ডিগ্রীর ঝাঁজে বাড়িতে টিকতে না পেরে।

কনক আরও ক্ষণকাল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল।

পরীক্ষা দিয়ে ফিরে শুনলে, শ্বশুর দমদমে চ'লে গেছেন। শশাঙ্ক অনেক আগেই আলাদা বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন। সমস্ত বাড়িটা কেমন যেন শূন্য ব'লে মনে হ'ল। ইন্দু পর্য্যন্ত চ'লে গেছে বাবার সঙ্গে। সে লেখাপড়া শিখছে, এটাকে অপরাধ ব'লে গণ্য করছে সবাই? আশ্চর্য্য! মৃগাঙ্ক-শুভ্র প্রায় সমস্ত দিনই বাড়ির বাইরে থাকতেন, কখনও কখনও কলকাতারও বাইরে। সমস্ত দিন কি যে করতেন, তা জিজ্ঞাসা না করাটাই শ্রেয় মনে হ'ত কনকের। একদিন প্রশ্ন ক'রে যে উত্তর পেয়েছিল, তাতে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়েছিল তার পক্ষে। চরকা চালিয়ে ইংরেজকে তাড়াবেন এঁরা! যে ইংরেজরা নেপোলিয়নকে হারিয়েছে, কাইজারকে হারিয়েছে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাদের এঁরা খদ্দর বানিয়ে কাবু ক'রে দেবেন! উচ্ছ্বসিত হয়ে বক্তৃতা ক'রে গেল লোকটা! যারা বেকার, তারাই এই সব ক'রে বেড়ায়—কর্ত্তার প্র্যাকৃটিস বোধ হয় জমে নি এখনও, তাই এই সব ছেলেমানুষি ক'রে বেড়ানো হচ্ছে, প্র্যাকৃটিস জমলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ নিয়ে আর সে মাথাই ঘামায় নি, ভেবেছিল, দু দিনের খেয়াল দু দিনেই মিটে যাবে। এম. এ.

পড়ার আয়োজনে মত্ত হয়েছিল সে। তবু কিন্তু মাঝে মাঝে তার কেমন যেন একা মনে হ'ত। মনে হ'ত, সে যেন একঘরে হয়ে আছে, কেউ তাকে পোঁছে না, চায় না। মৃগাঙ্ক-শুভ্র প্রায়ই বাইরে থাকতেন। ফিরে এসে একদিন হঠাৎ বললেন, তুমি গিয়ে বাবাকে ফিরিয়ে আন। আমি সময় পাচ্ছি না। আজ আবার মেদিনীপুর যেতে হবে একটা দরকারে। ব'লেই বেরিয়ে গেলেন।

দমদম থেকে হতাশ হয়ে ফিরতে হ'ল। ফিরে দেখে, বাড়িতে কেউ নেই। জনবহুল কলকাতা শহরের বুকেও যে এমন নির্জ্জনতা, এতখানি নিঃসঙ্গতা থাকা সম্ভব, তা সেইদিনই সে প্রথম বুঝেছিল। প্রকাণ্ড বাড়িটায় কেউ নেই। ছেলেমেয়েরা স্কুলে, দাই-চাকরগুলো বাড়ি গেছে, বুড়ো দরোয়ানটা ঘুমুচ্ছে নিজের ঘরে খিল দিয়ে। খাঁ-খাঁ করছে প্রকাণ্ড বাড়িটা। তেতলার ঘরে উঠে প্রথমেই চোখে পড়ল কন্‌ভোকেশনের গাউনটা···ইন্দুর মুচকি হাসিটাও মনে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে···দমকা হাওয়ায় দড়াম ক'রে বন্ধ হয়ে গেল কপাটটা···।

গ

মৃগাঙ্ক-শুভ্রও প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ-আন্দোলনে তেমন আস্থাবান ছিলেন না। আত্মার শক্তিতে তিনি বিশ্বাস করতেন, কিন্তু সেটা আধ্যাত্মিক মার্গে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যে এ শক্তিকে অস্ত্রের মত প্রয়োগ করা সম্ভব, সম্ভব হ'লেও আপামর-ভদ্র সকলে যে সহসা এই তপস্বী-সুলভ শক্তির অধিকারী হয়ে উঠতে পারে, এ সম্বন্ধে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের সন্দেহ ছিল। তথাপি তিনি গান্ধীপন্থী হয়েছিলেন, তার কারণ, আদর্শবাদী শিক্ষিত ভারতবাসীর সামনে দ্বিতীয় আর কোন পথ ছিল না তখন। পর্ব্বতশিখর থেকে উৎপন্ন নদী যেমন ঢালু ভূমি অনুসরণ ক'রে অবশেষে সাগরে উপনীত হয়, সে যুগে তেমনই আত্মত্যাগমূলক উচ্চ-শিক্ষা-শিখর থেকে উৎপন্ন মন অনিবার্য্য যুক্তি-প্রবণতার অমোঘ আকর্ষণে অবশেষে যে সিদ্ধান্তসমুদ্রে গিয়ে আত্মহারা হ'ত, তার

নাম দেশসেবা। মৃগাঙ্ক-শুভ্র-জাতীয় সমস্ত লোকই তখন নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন যে, দেশসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেবা না করলে দেশকে গ'ড়ে তোলা যাবে না, আর দেশকে গ'ড়ে তুলতে না পারলে জীবনই বৃথা। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের বিবর্ত্তন একটু দেরিতে হয়েছিল। বৈষ্ণবীর গান এবং বিবেকানন্দের বাণীতে যে তরুণ চিত্ত একদা উদ্বুদ্ধ হয়েও পথ খুঁজে পায় নি, কনকের নিবিড়-সান্নিধ্য-সঞ্জাত ভোগরস পরম উপাদেয় হ'লেও যে ঠিক সেই কাম্য অমৃত নয়—এ কথা একদা সহসা উপলব্ধি ক'রে যে হতাশ মন দিশাহারা হয়ে পড়েছিল এবং দাম্পত্যজীবনের বাহ্যাড়ম্বর বজায় রেখেও গোপন পথে তৃপ্তি সন্ধান করতে করতে দেশসেবা-স্বপ্নে মগ্ন হয়েছিল, তার বিবর্ত্তন বিলম্বিত হ'লেও স্বাভাবিক পথেই হয়েছিল। বিবেকানন্দের আহ্বানেই তাঁর মন ছুটে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য-বিধাতার বিধানে তাকে ঠিক সেই জিনিসটিই বরণ করতে হ'ল, বিবেকানন্দ বারম্বার যা বর্জ্জন করতে বলেছেন। কনকের রূপ-যৌবনে তিনি মুগ্ধও হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর মুগ্ধ অন্তরে কিসের যেন ছায়াপাত হ'ত, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যুবতী পত্নীর পাশে শুয়ে মাঝে মাঝে সহসা যেন লজ্জিত হয়ে পড়তেন তিনি। যে বীর সন্ন্যাসীর বাণী মনের গ্লানিই মোচন করে নি শুধু, যাঁর জ্ঞানাঞ্জনশলাকা অন্ধত্ব মোচন করেছিল, যাঁর প্রদীপ্ত প্রতিভা ভারতের অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎকে দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি, প্রত্যেক ভারতবাসীকে আত্মসম্মান আত্মবিশ্বাস আত্মশক্তির প্রেরণা দিয়েছিল, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে না পেরে মৃগাঙ্ক-শুভ্র মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়তেন। চুম্বনমদির মধুযামিনীর স্বপ্ন হঠাৎ যেন ভেঙে যেত, জ্যোৎস্না নিবে যেত, প্রাসাদ মিলিয়ে যেত···মনে হ'ত, ঘনঘটাচ্ছন্ন অমাবস্যা-নিশীথে পঙ্কিল পিচ্ছিল পথে জীর্ণবসন শীর্ণকান্তি কারা সব চলেছে যেন দলে দলে···কঙ্কালের মিছিল। হঠাৎ সব মিলিয়ে যেত আবার···মনে হ'ত, না—না, আমি পারব না, আমি ভিন্ন পথের পথিক হয়েছি, ওদিকে চাইবারও অধিকার নেই আমার। নিবিড়তর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতেন কনককে।

…খবরের কাগজ এড়াবার উপায় ছিল না কিন্তু। ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস। পড়তেই হ'ত। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের উন্মাদনা, অরবিন্দ, বারীন, উল্লাসকর, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, রাণাডে, গোখলে, তিলক, আগারকর, আস্তে, স্থরেন বাঁড়ুজ্যে, বিপিন পাল, অ্যানি বেসাণ্ট, মবুলি-মিণ্টো রিফর্ম, মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট—সবই খবরের কাগজ থেকে পাওয়া। মনেও থাকে না যদিও তু'দিন পরে কিছু,—পুরনো খবরের কাগজ যথাসময়ে ওজন-দরে মুদীর দোকানে গিয়ে হাজির হয়—তবু খবরের কাগজ না পড়লে চলে না। খবরের কাগজের পাতাতেই হঠাৎ একদিন চোখে পড়েছিল, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামক এক ব্যক্তি আফ্রিকা থেকে দিগ্বিজয় ক'রে দেশে ফিরেছেন। প'ড়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। অদ্ভুত লোক তো! অহিংসা, সত্যাগ্রহ, ব্রহ্মচর্য্য, বুদ্ধ-চৈতন্য-যীশুখ্রীষ্ট-টলস্টয়-থোরার অসম্ভব কল্পনাবিলাসকে এই গুর্জ্জরবাসী আইনজীবী রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত ক'রে স্মাট্‌সের মত জাঁদরেল লোককে কাবু ক'রে দিয়েছে! সত্যি? প্রকাণ্ড পাগড়ি-পরা শীর্ণকান্তি লোকটার ছবির দিকে নীরব বিস্ময়ে তিনি চেয়েছিলেন খানিকক্ষণ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোকান থেকে এসে হাজির হ'ল একটা বিল। কনকের শাড়ি শেমিজ তেল পাউডার, ছেলেমেয়েদের পেনি নিকারবোকার প্যারাম্বুলেটার টফি—একগাদা বিলিতি জিনিসের লম্বা একটা বিল। গান্ধীর ছবির ওপরই 'চেক'-বইটা রেখে 'চেক'টা লিখে দিলেন। পরের দিন আর গান্ধীর কথা মনেই রইল না। কিছুদিন পরেই প্রবলভাবে মনে পড়ল আবার চম্পারণ জেলার আইন-অমান্য ব্যাপারে। বাধল যুদ্ধ। যুদ্ধের হিড়িকে গান্ধী কোথায় তলিয়ে গেলেন। একবার শোনা গেল, বিলেতে তিনি ইংরেজদের সাহায্যার্থে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ক'রে কাইজার-ই-হিন্দ্‌ মেডেল পেয়েছেন। কেমন যেন খটকা লাগল। কিন্তু তাও বেশিদিন রইল না। চলমান জীবন-যাত্রার নিত্য-আগন্তুক ঘটনাপুঞ্জে তাও চাপা প'ড়ে গেল তু'দিন পরে। গান্ধীর স্মৃতি মন থেকে যখন প্রায় মুছে এসেছে, প্রথম যৌবনের

আধ্যাত্মিক প্রেরণার শিখাও যখন নির্ব্বাণোন্মুখ, ব্যাঙ্কের মোটা টাকা, গৃহিণী-পুত্র-কন্যার স্নেহনিবিড় সঙ্গ মনকে যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে, তখন হঠাৎ যেন চাবুক খেয়ে জেগে উঠলেন তিনি। রাউলাট অ্যাক্ট এবং ঠিক তার পিঠ-পিঠ জালিয়ানওয়ালাবাগ। ভারতের আকাশে প্রদীপ্ত সূর্য্যের মতন উদিত হয়েছেন মিস্টার এম. কে. গান্ধী নয়—গান্ধী মহারাজ। তারপরই অমৃতসর কংগ্রেস। সেও আর এক বিস্ময়। ডায়ার-ওডায়ারের কাণ্ডের পর গান্ধী দুঃখ প্রকাশ করলেন নিজের দেশবাসীর বর্ব্বর আচরণের জন্যে—পাঞ্জাবে গুজরাটে উত্তেজিত জনতা মাথা ঠিক রাখতে পারে নি। গান্ধী বললেন, রাজপুরুষরা জালিয়ানওয়ালাবাগ করুক, কিন্তু আমরা কেন নিরীহ ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারকে হত্যা করব, ঘরে ঘরে আগুন লাগাব? সমস্ত দেশ পঞ্চমুখ হয়ে যখন ইংরেজদের সমালোচনা করছে, তখন আমাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যে লজ্জা প্রকাশ করা! গান্ধী কিন্তু বললেন, সত্যিই আমি লজ্জিত। এ তো সত্যাগ্রহ নয়। আমি গুণ্ডা চাই না, বক্তা চাই না, হুজুগে চাই না,—সত্যাগ্রহী চাই। ভীরু নয়, বীর চাই। শুধু তাই নয়, মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড স্কীমের সহযোগিতা করতেও প্রস্তুত হলেন তিনি। বললেন—"Do not return madness with madness, but return madness with sanity and the whole situation will be yours"—হিন্দু ভারতবাসীর আচরণে পরিস্ফুট হয়ে উঠল যীশুখ্রীষ্টের মহিমা—চিত্তরঞ্জনের মত প্রতিভাবান প্রতিপক্ষও অভিভূত হয়ে হার মানলেন। মৃগাঙ্ক-শুভ্রও শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন সেদিন। শিষ্যত্ব গ্রহণ করার মধ্যে আড়ম্বর ছিল না তেমন কিছু। কংগ্রেসের মেম্বার হলেন, খদ্দর পরলেন, চরকা কিনলেন। চরকা এবং খদ্দর নিয়ে বাড়ি ফিরে কিন্তু উৎসাহ পেলেন না। মনে হ'ল, যেন অন্য দেশে প্রবেশ করলেন, যে দেশে পরাধীনতার গ্লানি নেই, কংগ্রেস নেই, যাদের নিজেদের কোন দুঃখ নেই, অপরের জন্যে দুঃখবোধ নেই—মনে হ'ল, অন্ধ-বধির কতকগুলো লোক যেন দু হাত দিয়ে প্রাণপণ নিজেদের স্বার্থটুকু আঁকড়ে ধ'রে আছে, তার বেশি আর

কিছু দেখে না, দেখতে পায় না, শোনে না, শুনতে চায় না। চরকা দেখে কনক মুখ টিপে একটু হাসলে, ছেলেমেয়েরা ভাবলে, নতুন ধরনের একটা খেলনা বুঝি। শশাঙ্ক-শুভ্র বললেন, ননসেন্স! হংস-শুভ্র তখনও দমদমে যান নি, তিনি বললেন, এনেছ, দু দিন চালিয়ে দেখ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ও টিকবে না। বাঙালী-বাবুদের ধাতে ওসব সইবে না। শেষকালে ওটা মাকসা আর ধুলোর আড্ডা হবে। ডাক্তারি বিদ্যেটাও বিদেশী ব'লে বর্জ্জন করবে নাকি? তা যদি পার, তা হ'লে বুঝব, কিছু একটা হ'ল। তা কিন্তু পারবে না।—এই ব'লে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেলেন, খড়মের চটচট শব্দ যেন অট্টহাস্য করতে লাগল। ইন্দুটা পর্য্যন্ত ঠাট্টা ক'রে ব'লে গেল, আমাদের দেশে তো চরকা ছিলই ছোটদা, সেটা কি ক'রে উঠে গেল তার ইতিহাসটা আলোচনা ক'রে তারপর চরকা চালাবার চেষ্টা করলে ভাল হয় না? উঠে যাবার কারণটা না দূর করলে তোমার চরকা আবার থেমে যাবে যে! একমাত্র শঙ্খ-শুভ্রই একটু যা সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল। সে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে তখন, সেই প্রায় রোজ চুপি-চুপি তাঁর কাছে আসত আর সুতো কাটত। বেশি কিছু কথা বলত না। চুপ ক'রে শুনত সব আর চরকা ঘোরাত। বিশেষ উচ্ছ্বসিত হয় নি একদিনও। তার মা বাসন্তীই বরং উচ্ছ্বসিত হয়েছিল বেশি। খুব দামী একখানা খদ্দরের শাড়ি প'রে প্রায়ই আসত। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হ'ত, এরাই বোধ হয় তাঁর মনের কথাটা ঠিক বুঝেছে। বস্তুত এরা ছাড়া আর কেউ বড় আসত না তাঁর কাছে। কনক পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। বাজে ব্যাপারে মন দেবার অবসর ছিল না তার। যখন অবসর হ'ত, তখন মৃগাঙ্ক-শুভ্রের এই সব খদ্দরী খেলাকে সকৌতুক ঔদাসীন্যভরেই লক্ষ্য করত সে। খেলা যে শেষে জীবনমরণ-সমস্যায় রূপান্তরিত হয়ে উঠবে, তা সে ভাবতেই পারে নি। যেটাকে রবারের সাপ ভেবেছিল, সেটা সত্যিই যখন ফণা তুলে দংশন করতে উদ্যত হ'ল, তখন নির্ব্বাক হয়ে গেল সে।

খেলাফতের ওজুহাতে মহাত্মা গান্ধী পরের বছর যখন নন-কোঅপারেশন

শুরু ক'রে দিলেন এবং সেই অহিংস-যজ্ঞে চারিদিক থেকে দলে দলে উকিল শিক্ষক ছাত্র, রাশি রাশি খেতাব, বোঝা বোঝা বিলিতী কাপড় আহুতি প'ড়ে অগ্নি-শিখা যখন গগন-বিসর্পী হয়ে উঠল—চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, জওহরলাল, বিঠলভাই, বল্লভভাই, কেলকার, মুঞ্জে, মদনমোহন, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজগোপালাচারি, রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার, সত্যমূর্ত্তি, শওকৎ আলি, মহম্মদ আলি, আবুল কালাম আজাদ, আনসারি, সুভাষচন্দ্র—দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিরা যখন সমস্ত ত্যাগ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের কাজে, ঘরে ঘরে চরকা চলতে লাগল, গ্রামে গ্রামে তাঁত বসল, তখন মৃগাঙ্ক-শুভ্রও তাঁর উঠতি-পশারের মোহ ত্যাগ ক'রে গা ভাসিয়ে দিলেন সেই তুফানের মুখে। মদের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে মার খেলেন পুলিসের হাতে। জেল হয়ে গেল। জেলকে তখন ভয় করে কে? জেল তখন তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে।

জেলে গিয়েই কিন্তু তাঁর সর্ব্বপ্রথম খটকা লাগল। জেলে যাদের সঙ্গে বাস করতে হ'ল তাঁকে—যারা স্কুল-কলেজ-চাকরি-পশার বর্জ্জন ক'রে দেশের জন্য জেলে এসেছে, তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। এই ছ্যাবলা চ্যাংড়ার দল দেশোদ্ধার করবে! এদের না আছে নিষ্ঠা, না আছে গাম্ভীর্য্য, না আছে আত্মসম্মান! এদের দেখে তো শ্রদ্ধা হয় না, রাগ হয়। গৌরবে মন ভ'রে ওঠে না, লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ে। এদের ওপর নির্ভর ক'রে মহাত্মাজী এক বছরের মধ্যে স্বরাজ পাবেন আশা করেছেন নাকি! এদের কি তিনি ঠিকমত চিনতেন? এদের গান হাসি হুল্লোড়ের মাঝে, জেল-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এদের নানা রকম অশোভন অসঙ্গত আত্মসম্মানহানিকর আবদারের হীনতায় আদর্শবাদী মৃগাঙ্ক-শুভ্র কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। কিছুদিন কেমন যেন মুষড়ে গেলেন তিনি। তাঁর দ্বিতীয় খটকা লাগল অহিংস-আন্দোলনের চেহারা দেখে। জেলে ব'সেও খবর পাচ্ছিলেন তিনি। চারিদিকে দাঙ্গা বেধে উঠেছে, পুলিস গুলি চালাবার সুযোগ পাচ্ছে, প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের আগমন উপলক্ষ্যে বম্বেতে যে কাণ্ড হয়ে গেল তা লোমহর্ষণকর—

কোনমতেই অহিংস বলা চলে না তাকে। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের সেই প্রথম মনে হ'ল, টল্‌স্টয়ের আদর্শ সে যুগে এক টল্‌স্টয় ছাড়া আর কেউ যেমন পুরোপুরি পালন করতে পারে নি, এ যুগে তেমনই এক মহাত্মাজী ছাড়া আর কেউ বোধ হয় পারবে না। কায়মনোবাক্যে অহিংস থাকা অশিক্ষিত জনতার সাধ্য নয়। তাই যদি না হয়, তা হ'লে এ অসম্ভব অসাধ্য আন্দোলন চালাবার মানে কি ?...

মৃগাঙ্ক-শুভ্র জেল থেকে যখন বেরুলেন, তখন চৌরিচৌরা হয়ে গেছে। মহাত্মা গান্ধী জেলে। অসহযোগ-আন্দোলন বন্ধ। জেলের গেটে মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হীরক ও তার বন্ধুবান্ধবেরা। হীরকের মুখ উদ্ভাসিত। কাকা দেশের জন্যে জেল খেটে বেরুলেন, এ যেন বিশেষ ক'রে তারই গৌরব। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে মাল্য-ভূষিত হয়ে মোটরে উঠে বসলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। একটা কথা বার বার মনে হতে লাগল, কনক আসে নি। শুক্তি মুক্তা নবনী কেউ আসে নি। কারণটা মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে কেমন যেন লজ্জা হতে লাগল। কেউ একটা চিঠি পর্য্যন্ত লেখে নি! শুক্তি মুক্তা নবনী না হয় ছেলেমানুষ, কনকও লেখে নি। তিনি জেল থেকে কনককে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, তা যে তার জীবন-ধারা বদলে দেবে, এ কল্পনা তিনি করেন নি। কারণ স্ত্রী হ'লেও কনককে তিনি ঠিক চিনতেন না।

তিনি লিখেছিলেন, "আমার হঠাৎ যে জেল হয়ে যাবে, তা ভাবি নি। দেশের জন্যে এ ভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে আমি কিন্তু ধন্য হয়েছি। আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে, তা তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব না। কারণ তুমি বুঝতেই পারবে না। স্বামী-স্ত্রী হ'লেও আমাদের জীবনের আদর্শ যে ভিন্ন, তা আমি কিছুদিন থেকে অনুভব করছিলাম। বিশেষ ক'রে অনুভব করলাম সেই দিন, যে দিন তুমি আমার খদ্দরের কাপড়গুলোকে চট ব'লে ঠাট্টা করেছিলে। তারপর সবাই যখন দলে দলে স্কুল কলেজ পরীক্ষা বয়কট ক'রে চ'লে আসছে, তখন তোমার ডিগ্রী-লাভ করবার উৎকট আগ্রহ

দেখেও আমার মনে হয়েছিল, তুমি ভিন্ন জাতের লোক। আমার ছেলে-মেয়েদের আমি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারতাম অবশ্য, কিন্তু তারা কেবল আমার ছেলেমেয়ে নয়, তোমারও ছেলেমেয়ে। তুমি যখন জোর ক'রে বললে যে, তাদের তুমি এসব বাজে হুজুকে মাততে দেবে না এবং দরোয়ান সঙ্গে দিয়ে স্কুলে পাঠাতে লাগলে, তখন তোমার মান এবং দাবি বজায় রাখবার জন্যেই আমি কিছু বলি নি। কিন্তু তখনই নিঃসংশয়ে বুঝেছিলাম যে, আমার আদর্শ তোমার কাছে মূল্যহীন। তাই জেলে এসে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব না। এক হিসেবে অবশ্য তোমার ভাগ্য ভাল। কারণ আমি জেলে চ'লে আসার জন্যে আর যাই হোক, অন্নবস্ত্রের অভাবে তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। এই জেলে আমার সঙ্গেই এমন লোক আছেন, যাঁরা জীবিকা উপার্জ্জনের একমাত্র উপায় বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছেন। তাঁদের পরিবারবর্গকে হয়তো অন্নবস্ত্রের জন্যে পরের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। আমার পূর্ব্বপুরুষের দৌলতে সে ভোগ তোমাকে ভুগতে হবে না। ভালভাবে খেয়ে প'রে, এমন কি নভেল প'ড়ে সিনেমা দেখেও দিন কাটাতে পারবে। আমার ব্যাঙ্কের টাকা তোমার নামে ক'রে নিও। 'চেক' পাঠালাম। বাবাকেও লিখে দিলাম যে, তিনি যেন তোমার হিসাবেই টাকা দেন আমি যতদিন জেলে থাকব।..."

এর উত্তরে কনক কোন চিঠিই লেখে নি। বাসন্তীর চিঠিতেই মৃগাঙ্ক জানতে পারেন যে, কনক ভালভাবে এম. এ. পাস করেছে।

মোটর দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। গলা থেকে ফুলের মালাটা নামিয়ে রেখে মৃগাঙ্ক-শুভ্র জিজ্ঞাসা করলেন, শঙ্খ রজত কোথা?

দাদাকে বাবা কি একটা কাজে টাটা পাঠিয়েছেন। মেজদা বোধ হয় নৈনিতালে।

হীরকের মুখ আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

জানেন ছোটকাকা, মেজদার পেছনেও পুলিস লেগেছে!

জলজল করতে লাগল তার চোখ দুটো, মুখের হাসি আরও যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠল।

শুক্তি মুক্তা নবনীরা এল না যে ? খবর পায় নি নাকি তারা ?

জিজ্ঞাসা না ক'রে পারলেন না মৃগাঙ্ক-শুভ্র।

কি জানি ! খবর পেয়েও আসতে পারে নি হয়তো। হস্টেল থেকে সব সময় ছুটি দেয় না তো।

ওরা হস্টেলে নাকি ?

হ্যাঁ। কাকীমা দিল্লী চ'লে যাবার সময় ওদের হস্টেলেই তো রেখে গেলেন।

হীরক আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের দিকে। তার সদা-দীপ্যমান মুখের হাসি একটু অস্বচ্ছ হয়ে এল ক্ষণিকের জন্য। কেমন যেন সন্দেহ হ'ল, কাকা বোধ হয় জানেন না। চুপ ক'রে রইল। মৃগাঙ্ক-শুভ্রও চুপ ক'রে রইলেন। নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে মোটর ছুটতে লাগল। মোটর যখন শশাঙ্ক-শুভ্রের গাড়িবারান্দার নীচে থেমেছে, তখনও মৃগাঙ্ক-শুভ্র অন্যমনস্ক।... হঠাৎ অনেকগুলো শাঁখের শব্দে সচকিত হয়ে উঠলেন এবং তারপর বিব্রত হয়ে পড়লেন লাজবর্ষণের প্রাচুর্য্যে। লক্ষ্য করলেন, শুধু লাজ নয়, পুষ্পবৃষ্টিও হচ্ছে। ওপরের দিকে চেয়ে দেখতেই চোখে পড়ল, গাড়িবারান্দার ছাতে আনন্দে আত্মহারা বাসন্তী খই আর ফুল ছড়াচ্ছে। সঙ্গে পাড়ার এক দল মেয়ে, প্রত্যেকেরই অঙ্গে নানা উজ্জ্বল বর্ণের বিচিত্র সজ্জা, কারও হাতে ফুলের ডালা, কারও মুখে শাঁখ—একটা সাগ্রহ সম্বর্দ্ধনা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে যেন। ক্ষণিকের জন্যে সব ভুলে গেলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র, এমন কি অভ্যর্থনাকারিণীদের সাজসজ্জার কোন উপকরণই যে খদ্দর নয়, তাও নজরে পড়ল না তাঁর—তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মোটর থেকে নামতেই এক দল কিশোরী মেয়ে এগিয়ে এসে প্রণাম ক'রে মাল্য-চন্দন দিয়ে অভিনন্দিত করলে তাঁকে, সঙ্গে সঙ্গে কমনীয়কণ্ঠে

'বন্দে মাতরম্' শুরু হয়ে গেল ড্রয়িং-রুমে। অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন করেছিল বাসন্তী।

আদর-অভ্যর্থনা-অভিনন্দনের ধুম চলল কয়েক দিন ধ'রে পাড়ায় পাড়ায়, বন্ধুবান্ধব-মহলে। কেমন যেন নেশা লাগল। নিজেরই মনে হতে লাগল, কয়েক মাস জেলে বাস ক'রে সত্যিই একটা দিগ্বিজয় ক'রে ফিরেছেন যেন তিনি। এসব কিন্তু বেশি দিন ভুলিয়ে রাখতে পারলে না তাঁকে। পরাজয়ের গ্লানিটা ছাপিয়ে উঠতে লাগল সমস্ত মালা-গান-হাততালিকে। অসহযোগ-আন্দোলন থেমে গেছে। নিবে গেছে সব। রাগ হতে লাগল মহাত্মা গান্ধীর ওপর। এমন ক'রে সব থামিয়ে দিলেন কেন তিনি? মনে পড়ল তিলককে। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে কি এমন ক'রে থামিয়ে দিতেন সব? অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সেই লোকমান্য বীর কি এত বড় একটা ভুল করতেন? হ'লই বা চৌরিচৌরা, হ'লই বা একটু-আধটু ত্রুটি-বিচ্যুতি, সমস্ত দেশের জাগ্রত আত্মচেতনাকে এমন ভাবে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে মারবার কি অধিকার ছিল মহাত্মাজীর? ট্রুথ ট্রুথ ক'রেই গেলেন লোকটি। তিলকের কাছে কিন্তু ট্রুথের চেয়েও দেশ বড় ছিল। দাদাভাই নাওরোজি আর গোখ্‌লের শিষ্য গান্ধীর কাছে কিন্তু ট্রুথ বড়, দেশ নয়। এ রকম শুচিবায়ু-গ্রস্ত লোকের দেশের কাজে নাবার দরকার কি ছিল? একটা ভাষাহীন অবরুদ্ধ ক্ষোভে সমস্ত চিত্ত উন্মথিত হতে লাগল তাঁর। কোন অবলম্বন না পেয়ে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন তিনি। আবার ডিস্‌পেন্সারি ফেঁদে ডাক্তারি করবার প্রবৃত্তি আর ছিল না। পারিবারিক জীবনেও কোন আশ্রয় মিলল না। কনকের ব্যবহারে তাঁর পারিবারিক জীবনের মূলোচ্ছেদন হয়ে গিয়েছিল। কনক তাঁর ব্যাঙ্কের টাকার এক কপর্দ্দকও স্পর্শ করে নি—দিল্লীতে গিয়ে মাস্টারি শুরু করেছিল সে। শুক্তি-মুক্তা-নবনীর হস্টেলের খরচও নাকি সে-ই পাঠায়। সবাই আশা করেছিল, মৃগাঙ্ক গিয়ে কনককে ফিরিয়ে আনবেন। তিনি কিন্তু সেসব কিছুই করলেন না। তিনি

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হস্টেলে গিয়ে দেখা করলেন। এমন ভাব প্রকাশ করলেন, যেন তাঁরই নির্দ্দেশে তারা হস্টেলে এসেছে এবং কনকও চাকরি নিয়েছে তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে। তাঁর মনে হ'ল, যে ভাগ্যবিধাতা একদিন ভুলক্রমে তাঁর জীবনের সঙ্গে কনকের জীবন জড়িত করেছিলেন, সেই ভাগ্যবিধাতাই এখন বোধ হয় আবার নিজের ভুল সংশোধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রথম বার মৃগাঙ্ক আপত্তি করেন নি, এবারেও করলেন না।

দমদম থেকে হংস-শুভ্র আর ফেরেন নি। মৃগাঙ্ক যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখন অপ্রত্যাশিত রকম স্নেহপ্রবণ ব'লে মনে হ'ল তাঁকে। তাঁর দিকে এক নজর চেয়ে বললেন, বড্ড রোগা হয়ে গেছ দেখছি। অসুখ-বিসুখ করেছিল নিশ্চয়।

না।

তবে? খেতে দিত না?

মৃগাঙ্ক-শুভ্র মৃদু হাসলেন একটু, কোন উত্তর দিলেন না। হংস-শুভ্রও কিছু না ব'লে অন্য দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমার স্ত্রী যখন স্বাবলম্বী হয়েছে, তখন তোমার আর ভদ্রস্থ নেই।

মৃগাঙ্ক চুপ ক'রে রইলেন। ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে হংস-শুভ্র আশ্বাস এবং সান্ত্বনা দেবার সুরে শান্তকণ্ঠে বললেন, তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে অবশ্য ভাবনা নেই তোমার। টাকা দিয়ে যতটা করা সম্ভব, তা আমি করব। তারাপদকে পাঠিয়ে সব ব্যবস্থা করেওছি। বউমাও শুনেছি ওদের টাকা পাঠায়। তা পাঠাক—

হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন। তারপর বললেন, বউমা হঠাৎ চাকরি নিতে গেল কেন, বুঝলাম না। ঝগড়া হয়েছিল তোমার সঙ্গে?

ঠিক ঝগড়া নয়, মতের মিল ছিল না।

ও।

হংস-শুভ্রের চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল। ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে

বললেন, ভেতরে যাও, তারাপদ আছে। ইন্দু নেই। সে হঠাৎ দু দিন আগে কার এক টেলিগ্রাম পেয়ে কোথায় যেন চ'লে গেছে। কি যে করছ তোমরা, তা তোমরাই জান।

সমস্ত দিন আর কোন কথা হ'ল না।

বিকেলে ফেরবার সময় হংস-শুভ্র কেবল প্রশ্ন করলেন, কি করবে ঠিক করেছ ?

কিছু ঠিক করি নি এখনও।

ঠিক করতে বেশি দেরি হয় নি অবশ্য। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ডাক এসে পৌঁছল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। একটা কাজ পেয়ে তিনি বেঁচে গেলেন যেন। ভদ্রতার খাতিরেও কনকের সঙ্গে দেখা করবার যে ইচ্ছেটা মনে জাগছিল, তা ভেসে গেল উত্তর-বঙ্গের প্রবল বন্যায়। চার-চারটে জেলা ডুবে গেছে। ফসল গেছে, ঘর-বাড়ি গেছে, গরু-বাছুর পর্য্যন্ত নেই। অসংখ্য মানুষ মরেছে। যারা মরে নি, তারা গাছে গাছে ঝুলছে সাপের সঙ্গে। ঝুলেও নিস্তার পাবে না। অনাহার এবং মহামারী ব'সে আছে মুখব্যাদান ক'রে। পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র গ্রামে গ্রামে নৌকোয় নৌকোয়। অন্ন বস্ত্র ওষুধ অজস্র বিতরণ করলেন দু হাতে। তবু কিছু হ'ল না। যারা মরবার, তারা মরলই—এত অসংখ্য অসহায় লোকের অসংখ্য রকম দাবি মেটানো অসম্ভব একার পক্ষে। জিনিসটা যদিও অজ্ঞাত ছিল না, স্বচক্ষে দেখে আবার নতুন ক'রে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলেন যেন—সত্যিই কত অসহায় আমরা, সত্যিই কত পরাধীন! মানুষ নই, পশুর দল যেন। পশুরাও এমন ভাবে মরে না, পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। আমাদের পালাবার পথ নেই, পথ থাকলেও শক্তি নেই, সঙ্গতি নেই। দুঃখের দিনে ঝড়ে বন্যায় মহামারীতে অসহায়ভাবে মরি, সুখের দিনে ভয়ে ভয়ে প্রবল সবলের হস্তে আত্মসমর্পণ ক'রে বেঁচে থাকি কোনক্রমে। যে মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে আস্থা ক'মে আসছিল, সেই মহাত্মা গান্ধীকে মনে পড়ল হঠাৎ—ক্ষীণ-দেহ উলঙ্গ-প্রায় নাতি-দীর্ঘ সেই

লোকটিকে,—মনে হ'ল, জীর্ণশীর্ণ ভারতবর্ষের আত্মার মূর্ত্ত প্রতীক যেন তিনিই। বিলাতী-শিক্ষা-পুষ্ট মুষ্টিমেয় ড্রইং-রুম-বিলাসীদের কেউ নন তিনি। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, জর্জ্জরিত, বিদলিত কোটি কোটি ভারতবাসীর তিনি প্রতিনিধি। মনে পড়ল রেভারেণ্ড হোম্‌সের কথা—When Gandhi speaks it is India that speaks. When Gandhi acts it is India that acts. When Gandhi is arrested it is India that is outraged and humiliated. মনে পড়ল আহ্‌মেদাবাদের আদালতে গান্ধীর উক্তি। আদালত যখন প্রশ্ন করলে, তোমার পেশা কি? অকম্পিতকণ্ঠে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—Farmer and Weaver। সব যদিও থেমে গেছে, মহাত্মাজী জেলে, তাঁর অহিংস আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠে শত্রুপক্ষের হাসির খোরাক যুগিয়েছে, তবু কিন্তু এই ভীত ত্রস্ত অপমানিত অগণিত অসহায় ভারতবাসীর দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হ'ল, সত্যাগ্রহী মহাত্মাজী দেশের সত্যকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছেন ব'লেই থেমে গেছেন। এই সব ভীরু ভীতু লোভীরা কি সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের উপযুক্ত? এদের আত্মার সুপ্ত শক্তিকে জাগাতে হবে আগে। জাগাতে হবে ভারতবর্ষেরই শাশ্বত মন্ত্রে। সে মন্ত্র হিংসার নয়—প্রেমের, ভিক্ষার নয়—ত্যাগের, পরমুখাপেক্ষীর নয়—স্বাবলম্বীর, ভীতির নয়—শক্তির। সে মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতবাসী অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, কিন্তু গুলি-গোলা কামান-বন্দুক দিয়ে নয়, আত্মার শক্তি দিয়ে। প্রয়োজন হ'লে দলে দলে প্রাণ বিসর্জ্জন করবে, কিন্তু ভুলেও কখনও কারও প্রাণহননের চেষ্টা, এমন কি চিন্তাও, করবে না—অসম্ভব ব'লে নয়, অমানুষিক ব'লে। যে ভারতবর্ষ যুগে যুগে পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছে, সেই ভারতবর্ষ চরম দুর্দ্দশাতে প'ড়েও তার অতীত মাহাত্ম্যের গৌরব থেকে চ্যুত হবে না কিছুতেই। তখনই আবার মনে হ'ল, পারব কি আমরা এ মন্ত্রে দীক্ষা নিতে? মুখ বুজে পুলিসের মার খেতে পারবে কি সবাই? পারবে যে, তার প্রমাণ পরে অবশ্য তিনি পেয়েছিলেন ধরস্‌না লবণ-আইন-অমান্য আন্দোলনে।

·· উত্তর-বঙ্গের নানা স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। যেখানে যেখানে সম্ভব চরকাও বিতরণ করলেন। একটা অনিশ্চিত অসহায় উন্মাদনার মধ্যে দিন কাটতে লাগল। এই সময় হঠাৎ কাকামণির একটা পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। ব্রাহ্ম সোম-শুভ্রের প্রতি মনটা বরাবরই বিরূপ ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটা অঙ্গ, রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষেরই বৈদিক আর্য্যধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে নিজেদের ভারতীয়ত্বেরই যে পরিচয় দিয়েছিলেন—এ কথা অবিদিত ছিল না, তবুও ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে প্রসন্ন ভাব ছিল না তাঁর। বারম্বার মনে হ'ত, ওরা শ্রেষ্ঠম্মন্যতা-ভরে নিজেদের আলাদা ক'রে রেখেছে আমাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। ব্রহ্মের উপাসনাটা ছুতো মাত্র, আসলে ওরা উপাসনা করে বিদেশী সভ্যতার। সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ প'ড়ে এ কথা আরও বেশি মনে হচ্ছিল তাঁর। সমানে সমানে ছাড়া কোন মিলনই যে শোভন হয় না, এ কথা রবীন্দ্রনাথের মত লোকও যে বুঝতে পারেন নি, তার কারণ—মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে হয়েছিল—চাকচিক্যময় বিদেশী সভ্যতার ইন্দ্রজাল। সোম-শুভ্রের প্রতি বিরূপতার প্রধান কারণটা ছিল অবশ্য পারিবারিক, এমন কি ব্যক্তিগতও। কাকামণি বাবার বিরাগভাজন ছিলেন ব'লেই তাঁরও বিরাগভাজন ছিলেন। হঠাৎ একদিন পাঁচ হাজার টাকার একখানা 'চেক' এবং ছোট্ট একখানা চিঠি পেয়ে মতটা যেন বদলে গেল। মনে হ'ল, কাকামণিকে ঠিক যেন জানা যায় নি। অকারণে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে এতদিন। আড়ম্বরহীন ছোট্ট চিঠিখানা আরও মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। অতিশয় সংক্ষেপে এবং একটু যেন সঙ্কোচভরে তিনি লিখেছেন—দেশের এই দুর্দ্দিনে সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। তোমার আচরণ প্রশংসনীয়। ইচ্ছে থাকলেও তোমার সঙ্গে সশরীরে যোগ দেবার সামর্থ্য আমার নেই। সেজন্য লজ্জিত আছি। সামান্য কিছু পাঠালাম, যদি কাজে লাগাতে পার অতিশয় সুখী হব। আরও সুখী হব, আমার নামটা কোথাও যদি প্রকাশ

না কর। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—আশীর্ব্বাদক তোমার কাকামণি।…এই টাকা দিয়েই মৃগাঙ্ক-শুভ্র তাঁর দাতব্য চিকিৎসালয়ের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তারপর অবশ্য আরও অনেক টাকা দিয়ে বাড়িয়েছেন সেটাকে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সোম-শুভ্রের পাঁচ হাজার টাকা না পেলে হয়তো শুরুই করতে পারতেন না কাজটা। হাতে তখন কিছু ছিল না। বন্যাপীড়িতদের অন্ন বস্ত্র ওষুধ যোগাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর বাষিক বরাদ্দ থেকে এক কপর্দ্দকও উদ্বৃত্ত ছিল না হাতে।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে ডাক্তারি এবং অন্ন বস্ত্র চরকা বিতরণ করবার ফাঁকে ফাঁকে যে একবারও কনককে মনে পড়ত না, তা নয়। একাধিকবার পড়ত। কিন্তু কনকের দিক থেকে কোন সাড়া না পেলে তিনি যাবেন কোন্ ওজুহাতে? তাঁকে অবহেলা ক'রে যে চ'লে গেছে, বিনা আহ্বানে কিছুতেই তার কাছে ফিরে যাওয়া যায় না—তা হোক সে কনক। হংস-শুভ্রের পুত্র তিনি, আত্ম-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ ক'রে কিছু করা অসম্ভব তাঁর পক্ষে। পুত্রকন্যাদের সঙ্গে সম্বন্ধ অবশ্য বজায় ছিল, কিন্তু কনকের অভাবে তাও কেমন প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল যেন। এমন কি, কনক চ'লে যাওয়ার সময় তার কলিকাতাবাসিনী এক বোনকে ছেলেমেয়েদের লোকাল গার্জেন নিযুক্ত ক'রে গিয়েছিল, মৃগাঙ্ক-শুভ্র সে ব্যবস্থাও বদলাবার চেষ্টা করেন নি। অর্থাৎ কনক-সম্পর্কিত কোন ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করবার প্রবৃত্তি ছিল না তাঁর। কনক একটা চিঠি লিখেও যে তাঁর খোঁজ নেয় নি, এ খবর তিনি কারও কাছে প্রকাশ করতেন না। কনকের বিরুদ্ধেও কোন কথা বলতেন না কখনও। তাই অনেকের ধারণা ছিল যে, কনক বোধ হয় তাঁর সম্মতিক্রমেই চাকরি করছে। কনক কিন্তু একটি চিঠিও লেখে নি। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার প্রয়াসে ডিগ্রী-অর্জ্জনের দুরূহ কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হয়েও সে যখন এক দিনের জন্যেও কারও প্রশংসা পেল না—নিন্দা ব্যঙ্গ শ্লেষই যখন তার প্রাপ্য হ'ল, তখন মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মুখ চেয়েই সে সব সহ্য করেছিল—যে স্বাভাবিক প্রেরণা-বশে

স্ত্রী-মাত্রেই স্বামীর ওপর নির্ভর করে, সেই প্রেরণা-বশেই সে মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ঔদাসীন্যকে অগ্রাহ্য ক'রে তাঁর আনুকূল্যই প্রত্যাশা করেছিল। সেই মৃগাঙ্ক-শুভ্রও যখন একটা তুচ্ছ হুজুকে মেতে তাকে ফেলে চ'লে গেলেন, শুধু চ'লে গেলেন নয়, জেল থেকে চিঠি লিখলেন যে, ভয় নেই, অন্নবস্ত্রের জন্যে ভাবতে হবে না তোমাকে, তখন চাকরি নেওয়া ছাড়া আর গতি রইল না তার। ঝোঁকের মাথাতেই সে চাকরি নিয়েছিল। আশা করেছিল, মৃগাঙ্ক-শুভ্র তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন যথাসময়ে। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়েও যখন মৃগাঙ্ক তার প্রতি তেমন কোন মনোযোগ দেখালেন না, তখন তার মনে হ'ল, নীরবে দূরে স'রে থাকাই ভাল। বিগত দিনের মহিমময় স্মৃতিগুলো এখনও বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে যায় নি। প্রথম যৌবনের দিনে সম্রাজ্ঞীর মত কৃপা বিতরণ করে-ছিল যাকে, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ভিক্ষাপাত্র হাতে ক'রে উপযাচিকার মত? কখনও না। এখনও তার আশা আছে, মৃগাঙ্ক-শুভ্র একদিন ফিরে আসবেনই।

উত্তর-বঙ্গের বন্যার প্রাবল্য যখন ক'মে এল ক্রমশ, অসংখ্য লোকের অজস্র দুঃখ-দুর্দ্দশার একঘেয়ে কাহিনী শুনতে শুনতে মনও ক্রমশ অসাড় হয়ে এল যখন, তখন মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ক্লান্ত চিত্ত হয়তো কনকের সঞ্জীবনী স্পর্শ লাভ করবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠত, কিন্তু নূতন একটা উন্মাদনার ঘূর্ণি উঠল তখন বাংলা দেশে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ ক'রে স্বরাজ-পার্টি গড়বার জন্যে ডাক দিলেন দেশের লোককে। মনে হ'ল, গয়ার পরাজয় বাঙালীর আত্মসম্মানকেই যেন আঘাত করেছে। মেতে উঠল সবাই এর প্রতিবিধানকল্পে। অহিংস অসহযোগ-আন্দোলনের শবদেহের ওপর ব'সে শুরু হয়ে গেল নূতন রকম তান্ত্রিক সাধনা। সিদ্ধিও যে না মিলল, তা নয়। দিল্লী কংগ্রেস থেকে জয়ধ্বনি করতে করতে বাঙালী ভলান্টিয়ারের দল দেশে ফিরে এল। মৃগাঙ্ক-শুভ্র এতে যোগ দিলেন বটে, কিন্তু প্রাণে ঠিক সুরটি যেন বাজল না। মহাত্মা গান্ধীর পথ দুর্গম দুঃসাধ্য হ'লেও তাঁর আদর্শের নিষ্কলুষ নির্ভীকতায়, তাঁর কর্ম্মপদ্ধতির বৃহৎ বীরত্বে চিত্ত যে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল,

কাউন্সিলে ঢোকবার জন্যে যেন-তেন-প্রকারেণ ভোট-সংগ্রহ ব্যাপারে ঠিক সে ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'ল না। যদিও স্বরাজ-পার্টির আন্দোলন তির্য্যকপথগামী অসহযোগ-আন্দোলনই—এই হয়তো পলিটিক্সের সুসাধ্য রণকৌশল—কিন্তু মৃগাঙ্ক-শুভ্রের অন্তর স্বরাজ্য-পার্টির আহ্বানে ঠিক তেমন আবেগভরে সাড়া দিলে না, যেমন দিয়েছিল মহাত্মাজীর ডাকে। হয়তো একেবারেই দিত না। কিন্তু স্বরাজ্য-পার্টির আহ্বান যে চিত্তরঞ্জনের আহ্বান—যিনি দেশের ডাকে এক মুহূর্ত্তে ভোগের উচ্চ শিখর থেকে পথের ধূলায় এসে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর আহ্বান অমান্য করা যে অসম্ভব। যন্ত্রচালিতবৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন শহরে শহরে স্বরাজ্য-পার্টির ধ্বজা বহন ক'রে। মনে কিন্তু শান্তি ছিল না। মনে হচ্ছিল, এইবার বুঝি সব ভেঙে পড়বে। মুলতান, অমৃতসরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়ে গেল। স্থাপিত হ'ল 'তানজিম্', 'তাবলিগ', 'হিন্দু মহাসভা'। 'সংগঠন' আন্দোলন শুরু করলেন হিন্দুরা, 'শুদ্ধি'র সুর তুললেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। কেনিয়াতে ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার চলতেই লাগল। গৌরের 'রেসিপ্রোসিটি বিল', শাস্ত্রীর বিলেত যাওয়া, Wood-Winterton agreement ব্যর্থ হয়ে গেল সব। এসব সত্ত্বেও উন্মাদনা ছিল কিছু অবশ্য। গভর্মেণ্টের নিজের অস্ত্রেই বারম্বার তাকে পরাভূত ক'রে খবরের কাগজে তুফান তোলার মধ্যে হুজুকপ্রিয় উত্তেজনাপ্রবণ বাঙালীর মনের খোরাক কিছু ছিল বইকি। তা ছাড়া কলকাতা কর্পোরেশনের মত বিরাট প্রতিষ্ঠানের চেহারা দিন দিন বদলে যাচ্ছিল স্বরাজিস্টদের হাতে প'ড়ে। সীমাবদ্ধ কর্ত্তৃত্বের মদিরাতেও ধমনীতে ধমনীতে রক্তস্রোত একটু দ্রুতবেগেই বইছিল তখন। এমন সময় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, নাগপুরে জাতীয় পতাকা নিয়ে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন শুরু হয়েছে আবার। জাতীয় পতাকা নিয়ে পুলিস রাজপথ দিয়ে চলতে বাধা দেওয়াতে দলে দলে লোক জাতীয় পতাকা নিয়ে রাস্তায় বেরুচ্ছে আর জেলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল এ আন্দোলন।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রও একদিন জাতীয় পতাকা ঘাড়ে ক'রে বেরিয়ে জেলে চ'লে গেলেন।

অল্প দিন পরেই ছাড়া পেয়ে ভাবলেন, অবলুপ্তপ্রায় সত্যাগ্রহ-আন্দোলনকেই আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। জাতীয়-পতাকা-আন্দোলন দেখে তাঁর আশা হয়েছিল, অহিংস আন্দোলনের মর্ম্ম দেশের যুবকেরা উপলব্ধি করেছে এবার বোধ হয়। আশা কিন্তু বেশিক্ষণ টিকল না। গোপীনাথ সাহার গুলিতে শুধু মিঃ ডে-ই মারা গেলেন না, মৃগাঙ্ক-শুভ্রের আশা-ভরসাও নিঃশেষ হয়ে গেল যেন। পুলিস এসে তাঁর বাড়ি, শশাঙ্ক-শুভ্রের বাড়ি, দমদমের বাড়ি খানা-তল্লাসি ক'রে গেল। যদিও বিশেষ কিছু পেলে না, তবু এটা অস্পষ্ট রইল না যে, রজতকে তারা সন্দেহ করছে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে বেশিদিন অবশ্য নিষ্ক্রিয় থাকতে হ'ল না। দেশবন্ধু শুরু করলেন তারকেশ্বর-সত্যাগ্রহ। তার আবর্ত্তে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে আবার জেলে গিয়ে উঠলেন তিনি। বস্তুত জেলই তখন কাম্য মনে হচ্ছিল তাঁর। জেলের বাইরে যা কিছু হচ্ছিল, তা যেন প্রাণহীন প্রহসন। মহাত্মাজী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নির্জ্জনবাস করছিলেন সমুদ্রতীরে। তুরস্কদেশীয় যে খিলাফতের আঠায় মেড়ে হিন্দু-মুসলমানকে মেলাতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি, তুরস্কদেশীয় কামাল পাশা সে আঠাটুকু নিঃশেষে তুলে নেওয়াতে হিন্দু-মুসলমানের একতা-ইমাল্‌শন বেশিদিন টিকল না—তেল ও জল আত্মপ্রকাশ করল নিদারুণ রকম স্পষ্টভাবে। দেশ জুড়ে বাধল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। ভারতের স্বাধীনতার পথ অবরুদ্ধ ক'রে অভ্রভেদী হয়ে উঠল সারি সারি মন্দির আর মসজিদ। মুসলমানদের দিকে অযথা পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে দেশবন্ধু করলেন প্যাক্ট, মহাত্মাজী উপবাস। ফল কিছুই হ'ল না।

হ্যাঁ, জেলে গিয়ে যেন বেঁচে গেলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। জেলেই খবর পেলেন, দেশবন্ধু মারা গেছেন।

কিছুদিন পরে জেল থেকে যখন বেরুলেন, তখন তাঁর সমস্ত প্রাণ অসাড়

হয়ে গেছে। এত অসাড় হয়ে গেছে যে, দেশব্যাপী সাইমন কমিশন বয়কটে যোগ দিতে আর উৎসাহ পেলেন না। কালো পতাকা ঘাড়ে ক'রে ক'রে সভা-সমিতির ভড়ং করতে ভাল লাগল না আর। দেশের যে পরিচয় ক্রমশ পাচ্ছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল, আঁচলে গেরোর ওপর গেরো বেঁধে লাভ কি, সোনাই যদি বাইরে প'ড়ে থাকে? দেশের লোক যদি মানুষ না হয়, তা হ'লে কার জন্যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা? বাজে হৈ-চৈ না ক'রে গ্রামে গিয়ে দেশের লোককে শিক্ষিত সুস্থ সবল স্বাবলম্বী করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ব'লে মনে হ'ল। হৈ-চৈ করবার মত উত্তেজনাও ছিল না কিছু। দেশবন্ধু মারা গেছেন, মহাত্মাজী তন্ময় হয়ে আছেন All-India Spinners' Association নিয়ে। ফিরে গেলেন তিনি তাঁর দাতব্য চিকিৎসালয়ে। দেশকে গ'ড়ে তোলাই হ'ল উদ্দেশ্য। বিনা পয়সায় ওষুধ এবং চরকা বিলিয়ে, তাঁত বসিয়ে, নাইট স্কুল ক'রে দিন কাটতে লাগল গ্রামে গ্রামে একা। পরিচিত কারও সঙ্গে, এমন কি খবরের কাগজের সঙ্গেও, সম্পর্ক রইল না কিছুদিন। এর যা অবশ্যম্ভাবী ফল, তা ফলল। বিদ্যাসাগর-প্রমুখ পরোপকারী মহাজনদের অদৃষ্টে যা ঘটেছিল, তাঁর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। কৃতজ্ঞতার বদলে কৃতঘ্নতা, উপকারের বদলে উপহাস, এসব তো পেলেনই, স্থানীয় জমিদার এবং ডাক্তারের সঙ্গে শত্রুতাও হ'ল। ছোটলোকদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিচ্ছেন ব'লে চটলেন জমিদার, এবং বিনা পয়সায় চিকিৎসা ক'রে রুগী ভাঙিয়ে নিচ্ছেন ব'লে চটলেন ডাক্তার। পুলিসের নেক-নজর তো ছিলই। জমিদার, ডাক্তার, পুলিস এঁরাই মফস্বলের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এঁরা সমবেতভাবে রুষ্ট হ'লে গ্রামে টেকা যায় না। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ঘর পুড়ে গেল একদিন এবং যাদের তিনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছিলেন, তারাই আগুন নেবাবার ছুতোয় এসে যথাসর্ব্বস্ব লুঠ ক'রে নিয়ে গেল তাঁর। অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, দেশসেবার পুরস্কারই এই, দ'মে গেলে চলবে না, ভালবাসা দিয়ে এদের জয় করতে হবে, আমার মধ্যেই নিশ্চয় গলদ আছে কোথাও—মনে মনে এই সব আবৃত্তি করতে করতে মৃগাঙ্ক-শুভ্র

দ্বিতীয় বার প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একদিন তারাপদ এসে হাজির।

কোথায় আছিস তুই? ছি ছি! এ যে যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখছি!

তুমি হঠাৎ যে?

হঠাৎ হবে কেন? নবনীর ভয়ানক অসুখ। চল্।

নবনীর?

হ্যাঁ গো।

কি অসুখ?

পেটে ভয়ানক ব্যথা, ফিট হচ্ছে ক্রমাগত।

তাই নাকি?

শিয়ালদহ স্টেশনে নেবে তারাপদ ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান করলে, মৃগাঙ্ক-শুভ্র খুঁজে পেলেন না তাকে। নবনীর বোর্ডিঙে গিয়ে শুনলেন, সে কলেজে। কলেজে গিয়ে দেখা করলেন। নবনী বিস্মিত হয়ে গেল। কই, তার কিছু হয় নি তো! তারপর একটু মৃদু হেসে বললে, কিছু হ'লেও তোমাকে বিরক্ত করতে যাব কেন শুধু শুধু? ঢং-ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজল, ক্লাসে চ'লে গেল সে। কোঁচানো শান্তিপুরী কাপড় পরা, আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে চকচকে পাম্‌শু, কোঁকড়ানো চুল, ধপধপে রঙ—এই সুন্দর সুশ্রী যুবক যে তাঁরই ছেলে, এ কথা নিজেরই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। নবনী-শুভ্রের কাছে মোটা বকশিশ পেয়ে কলেজের যে চাকরটা তাকে শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে সেলাম করত রোজ, সেই চাকরটাই একটু রূঢ়কণ্ঠে এসে বললে, তুমি আবার কি চাও এখানে হে? হাঁটুর-ওপরে-ওঠানো-খদ্দরের-কাপড়, পরনে-আড়ময়লা-খদ্দরের-ফতুয়া ব্যক্তিটি যে নবনীবাবুর বাবা হতে পারেন, তা কল্পনা করা অসম্ভব ছিল তার পক্ষে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে চেহারাটাও তাঁর শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল।

কিছু না, আমি যাচ্ছি।

একটু অপ্রস্তুত হয়েই বেরিয়ে এলেন তিনি।

বেরিয়ে বাড়ির দিকে গেলেন এবং সেখানে পৌঁছে বুঝলেন, তারাপদর আসল উদ্দেশ্য কি। বাইরের ঘরে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে হংস-শুভ্র ব'সে ছিলেন। প্রণাম ক'রে মুখ তুলতেই প্রশ্ন করলেন, কোথা ছিলে তুমি এতক্ষণ ?

নবনীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

আমি তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছি সকাল থেকে।

আপনার কথা তো তারাপদ বলে নি। সে বললে, নবনীর অসুখ।

তারাপদ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সে কথা না বললে তুমি আসতে নাকি ?

হংস-শুভ্র ধমক দিয়ে বললেন, মিথ্যে কথা বলতে তো বলি নি তোমাকে।

তারাপদ কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ক্ষণকাল অস্বস্তিকর নীরবতার পর মৃগাঙ্ক-শুভ্র বললেন, আমি খবর পেলে দমদমেই যেতাম। আপনি কষ্ট ক'রে এখানে এলেন কেন ?

কষ্ট ক'রে আমাকে প্রায়ই আসতে হয়। না এলে তোমার বাড়ি ভূতের বাড়ি হয়ে উঠত এতদিন।

কথাটা মিথ্যে নয়। হংস-শুভ্র কিছুদিন থেকে প্রায়ই মাঝে মাঝে এই খালি বাড়িটাতে এসে চুপ ক'রে ব'সে থাকেন।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আমার কষ্টের কথা ভাবতে হবে না তোমাকে। যে জন্যে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি শোন। এ বাড়িটা তোমার নামে লিখে দিয়েছিলাম, তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করবে ব'লে। কিন্তু যা দেখছি, জেলে জেলে আর গ্রামে গ্রামেই কাটছে তোমার। তোমার বউ চাকরি করছে বিদেশে। তোমার ছেলেমেয়েরা বোর্ডিঙে। নবনীকে বলেছিলাম, বোর্ডিং ছেড়ে এখানে এসে থাকতে। কিন্তু সে তাতে রাজি নয়।

কেন ?

কেন যে, তাও খুলে বলে না। বাড়ির কারও সঙ্গে সে বিশেষ মেশেও না। ছুটি হ'লেই মায়ের কাছে চ'লে যায়।

মৃগাঙ্ক-শুভ্র চুপ ক'রে রইলেন। একটু আগে নবনীর মুখে যে কথাগুলো শুনেছিলেন, তা মনে পড়ল। কেমন যেন একটা অস্পষ্ট বেদনা সঞ্চরণ করতে লাগল মনের ভেতর। হংস-শুভ্র অস্পষ্টতাটাকে স্পষ্ট ক'রে দিলেন আরও।

পরের ছেলেমেয়েদের আপন করবার জন্যে তুমি প্রাণপাত ক'রে বেড়াচ্ছ শুনলাম; অথচ তোমার নিজের ছেলেমেয়েরা পর হ'য়ে যাচ্ছে। তোমার কর্ত্তব্য অবশ্য তুমিই ভাল বোঝ। আমি কিন্তু এ বাড়িটা নিয়ে কি করি এখন? বুড়ো বয়সে একটা শূন্য বাড়ি পাহারা দিতে হবে নাকি ব'সে ব'সে?

হংস-শুভ্র কণ্ঠস্বরে যদিও একটা ব্যঙ্গের সুর ফুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর শেষের কথাগুলো আর্ত্ত মিনতির মত শোনাল। সেটা তাঁর নিজের কানেই বাজল এবং বাজবামাত্রই তিনি চ'টে গেলেন।

ব'লে উঠলেন, তা ব'লে তোমার ভাববার কোন দরকার নেই যে, তোমার সাহায্য ভিক্ষা করবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি। আমার কর্ত্তব্য আমি নিজেই যথাসাধ্য ক'রে যাব। তোমার দিকটা সম্বন্ধে তোমাকে সচেতন ক'রে দেওয়া উচিত ব'লেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম তোমাকে। চিঠিতে সব কথা বলা যায় না। আচ্ছা, আমি চললাম এখন—জিনিসটা ভেবে দেখো।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই তিনি উঠে গেলেন। সম্ভাব্য উত্তরটাকে এড়িয়ে পালিয়ে গেলেন যেন।

মৃগাঙ্ক-শুভ্র চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। 'কিছু হ'লেও তোমাকে খবর দিতে যাব কেন শুধু শুধু?'—নবনীর কথাগুলো আবার কানের কাছে বেজে উঠল। আত্মসম্মানে আঘাত লাগল যেন। পরক্ষণেই ভাবলেন, এরা ভিন্ন জাতের লোক। এদের সঙ্গে মিলবে কেন? জোর ক'রে মেলাবার

চেষ্টা করা বৃথা। পরের ট্রেনেই স্বস্থানে ফিরে যাবার ইচ্ছে হ'ল। হঠাৎ পাঁচফোড়নের মৃদু গন্ধ ভেসে এল একটা। বাড়ির ভেতরে কেউ রাঁধছে নাকি? ভেতরে ঢুকে দেখলেন, চারিদিক তকতক ঝকঝক করছে। পুরনো ঠাকুর এবং চাকর কাজে লেগে গেছে। শোবার ঘরের পালঙ্কে ধপধপে বিছানা পাতা। বাথ-রুমে পরিষ্কার খদ্দরের ধুতি, তোয়ালে, সাবান, এমন কি জবাকুসুম পর্য্যন্ত। শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চায় টলটল করছে জল। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কৃচ্ছ্রসাধন-ক্লান্ত মন প্রলুব্ধ হয়ে উঠল। ঠিক ক'রে ফেললেন, কিছুদিন অন্তত থেকে যাই—শরীরটাকেও বিশ্রাম দেওয়া হবে, বাবার অনুরোধটাও পালন করা হবে। বাবার অনুরোধটা যে ঠিক কি, তা স্পষ্টভাবে না শুনলেও বুঝতে কষ্ট হয় নি। এখানে কিছুদিন থাকলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

এই কিছুদিনের মধ্যেই শশাঙ্ক-শুভ্র এলেন একদিন বাসন্তীকে নিয়ে। বাসন্তী পীড়াপীড়ি করতে লাগল তার কাছে গিয়ে থাকবার জন্যে। অল্প-দিন পরেই শঙ্খর বিয়ে, বিয়েতে মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে কি কি করতে হবে, তারই উচ্ছ্বসিত আলোচনা করতে লাগল সে। সোৎসাহে দীর্ঘ ফর্দ্দই বানিয়ে ফেললে একটা। তারপর বললে, আমি এখন উঠি, মিসেস হালদারের ওখানে যেতে হবে একবার। তোমাকে কিন্তু আমি পাকড়ে নিয়ে যাব এসে, কোন আপত্তি শুনব না। হেসে বেরিয়ে চ'লে গেল। শশাঙ্ক বাসন্তীর সামনে পারতপক্ষে মুখ খোলেন না। বাসন্তী চ'লে গেলে, দু-চার কথার পর শুরু করলেন নিজের প্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা। ঈষৎ অনুযোগভরে বললেন, কেন যে এমন ভাবে সময় নষ্ট ক'রে বেড়াচ্ছ তুমি, তা তো বুঝি না। স্বদেশী করতে মানা করছি না। কিন্তু সেটা ইকনমিক বেসিসে না করলে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই দাঁড়াবে না যে। তোমার ডাক্তারী বিদ্যেটাকে কাজে লাগাও না! কণ্টিকারি, আমরুল, শিলাজতু, কত সব দিশী ওষুধ রয়েছে, সেগুলো যদি সত্যিই উপকারী ব'লে মনে কর, পেটেণ্ট ক'রে চালান দাও বিদেশের

বাজারে। বিদেশের টাকা ঘরে না আনতে পারলে কোন দিনই উন্নতি হবে না আমাদের। এঁরা অবশ্য নানা রকম ডিউটি বসিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করবেন, আমাদের সন্দেহ নেই—কিন্তু উই মাস্ট ফাইট দ্যাট—ওই সব নিয়েই ফাইট করতে হবে। মালব্যজীর ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টিই ঠিক পথ ধরেছে, আমার মনে হয়। যাতে দেশের লোকের দু পয়সা লাভ হয়, তাই করতে হবে। শুধু চরকা চালিয়ে লাভ কি—ইকনমিকালি ওটা কি খুব একটা সাউণ্ড ব্যাপার? তোমাদের মহাত্মাজীর মাথায় কি যে আছে, তা জানি না। এবারকার ক্যালকাটা কংগ্রেসে কি ফার্স টা হ'ল দেখলে তো? মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ গভর্মেণ্টকে যে 'আল্‌টিমেটাম' দিলেন, এক বছরের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস না দিলে আবার নন-কো-অপারেশন করবেন তিনি—তাঁর কি ধারণা, বৃটিশ গভর্মেণ্ট ভয়ে ভয়ে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিয়ে ফেলবে? আর দিয়ে যদি না ফেলে, তা হ'লে তিনি ওই ভাড়া-করা কতকগুলো চ্যাংড়াকে নিয়ে দেশোদ্ধার ক'রে ফেলবেন? আই থিঙ্ক, দিস ইজ—

বাক্যটা সম্পূর্ণ না ক'রে তিনি পাইপটা ধরালেন। মৃগাঙ্ক-শুভ্র একটি কথাও বললেন না। পাইপ ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে শশাঙ্ক বললেন, ওদিকে জওহরলাল আর সুভাষ বোস ছোঁড়াগুলোকে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের হীরু লেবারের দুঃখে কাতর। একটি মাড়োয়ারীদের মিলে কি সব করেছে যেন শুনছি। রজত আউট অব কণ্ট্রোল। মুসলমান গুণ্ডাদের সঙ্গে মেশে, কে যেন বলছিল। মুসলমান গুণ্ডাদের সঙ্গে মেশবার মানে? ওদের জিন্না তো··· আঃ সিকেনিং।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ ক'রে রইলেন।

তুমি পেটেণ্ট মেডিসিনের কথাটা ভেবে দেখো। সিরিয়াস্‌লি যদি করতে চাও, আমি ফিনান্স করতে রাজি আছি। আমাদের ওখানে আসছ কি?

না, এইখানেই তো বেশ আছি।

সে তুমি আর বাসন্তী বোঝ, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।

পাইপটা কামড়ে 'শ্রাগ' করলেন।

মৃগাঙ্ক-শুভ্র জিজ্ঞেস করলেন, হীরু কোথা?

সে সারা ভারতময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গিয়েছিল বারদোলি, সেখান থেকে ফিরে জামসেদপুরে কাটাল কিছুদিন, এখন নরিম্যানের বক্তৃতা শুনতে বম্বে গেছে। বম্বেতে টেক্স্‌টাইল মিলগুলোতে স্ট্রাইক চলছে, তাতে মাতল কি না কে জানে! কাল আসবে শুনছি।

তারপর একটু থেমে বললে, তোমাকে ভক্তি করে। ফিরলে ওকে একটু বুঝিয়ে ব'লো দেখি যে, এ রকম হৈ-হৈ ক'রে লাভটা কি? তোমার কথা শুনলে হয়তো মত বদলাতে পারে।

আচ্ছা, আসুক।

আমি এখন উঠি। বাসন্তীকে তুলে নিতে হবে আবার।

শশাঙ্ক-শুভ্র চ'লে গেলেন।

হীরক আর ফেরে নি। মীরাট কন্‌স্‌পিরেসি কেসে ধরা পড়েছিল সে। শঙ্খও আর আসত না তাঁর কাছে। মৃগাঙ্কর মনে হ'ল, আসন্ন বিবাহের রোম্যাণ্টিক স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে হয়তো, নীরস চরকা কাটবার প্রবৃত্তি এখন নেই বোধ হয়। একা একাই দিন কাটতে লাগল তাঁর। পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে যতটা আরাম প্রত্যাশা করেছিলেন, ঠিক ততটা পেলেন না,—পারিবারিক আবেষ্টনীই ছিল না যে। কনককে ফেরবার জন্যে তিনি কিছু লিখলেন না, কনকও ফিরল না; শুক্তি মুক্তা নবনী এসে দেখা ক'রে যেত বটে, কিন্তু তারাও বাড়িতে থাকতে চাইল না, নানা অজুহাত দেখিয়ে বোর্ডিঙেই থেকে গেল। মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মৃগাঙ্ক-শুভ্র বুঝতে পারলেন যে, ভেতরে ভেতরে ওরা মায়ের দিকে। সব বুঝেও কিছুই বললেন না তিনি। সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে বহুকাল পূর্ব্বে তিনি অপ্রস্তুত বোধ করে-ছিলেন। এখন আর সে ভাব নেই। মনের ওপর কড়া প'ড়ে গেছে। জবাবদিহি ক'রে অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা ভিক্ষা করার প্রবৃত্তি আর ছিল না।

একটা নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য সমস্ত সত্তাকে যেন কুয়াশাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। বাড়িতেই থাকতেন সমস্ত দিন। নিয়মিতভাবে চরকা কাটতেন আর বই পড়তেন। নানা রকম বই—নভেল, নাটক, সাংখ্য, গীতা—তামিল ভাষাটাও শেখবার চেষ্টা করছিলেন, ইচ্ছে ছিল, দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলো আয়ত্ত ক'রে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরুবেন। নাড়ী টিপে ডাক্তারি করার ইচ্ছে আর ছিল না। গ্রামসংস্কারের বাসনাও মন থেকে অবলুপ্ত হয়ে আসছিল ক্রমশ। শশাঙ্ক-শুভ্রের কথায় ডাক্তারী রিসার্চ করবার ইচ্ছেটা হচ্ছিল বটে মাঝে মাঝে—ভাবছিলেন, তা করতে হ'লে জার্মান ভাষাটাও শেখা দরকার। কিন্তু প্রবল-ভাবে কোন কিছুতেই মন সায় দিচ্ছিল না। খবরের কাগজের মারফত রাজনৈতিক যেসব সংবাদ পাচ্ছিলেন, তা মোটেই আশ্বাসজনক নয়। লাহোরে পুলিস-ইনস্পেক্টর মিস্টার সণ্ডার্সকে খুন ক'রে গেল কে যেন। যদিও এই সণ্ডার্সই লাহোর অ্যান্টি-সাইমন-কমিশন শোভাযাত্রা ভাঙতে গিয়ে লালা লাজপত রায়ের মাথায় লাঠি চালিয়েছিলেন, যার ফলে অবশেষে তাঁর মৃত্যু হ'ল—তবু সণ্ডার্সের মৃত্যুতে ব্যথিত হলেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। তারপরই বম পড়ল অ্যাসেম্ব্লিতে। সরদার ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ধরা পড়ল। মহাত্মাজীর আদর্শকে এমন ভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখে হতাশ হয়ে পড়লেন মৃগাঙ্ক-শুভ্র। বাংলা দেশে সুভাষ বোসের গান্ধী-বিরোধী বামপন্থী সুরও ভাল লাগছিল না তাঁর। খবরের কাগজ পড়াই বন্ধ ক'রে দিলেন। তেতলার ঘরটাতে একা চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন, হঠাৎ দুপুরে একদিন ইন্দু সেখানে এসে হাজির। এক পিঠ কালো কোঁকড়ানো চুল, চোখ জ্বলছে, মুখে তীক্ষ্ণ হাসি—মূর্ত্তিমতী কালবৈশাখী যেন। চরকাটার দিকে অপাঙ্গে একবার চেয়ে সে বললে, আমি দাঁড়াতে পারব না, তোমাকে একটা খবর দিতে এলুম। তুমিও শুনেছ বোধ হয় এতক্ষণ—

কি খবর ?

লাহোর জেলে যতীন দাস মারা গেছে।

খবরটা ব'লেই ইন্দু বেরিয়ে চ'লে গেল।

মারা গেছে! যুবক যতীন দাসের মুখটা মনের ওপর ভেসে উঠল।

আলাপ ছিল তার সঙ্গে। হঠাৎ কশাহত হয়ে যেন উঠে দাঁড়ালেন। সামনে একটা ছোট স্যুটকেস ছিল, সেইটি হাতে ক'রে ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে লাহোরের একটা টিকিট কেটে চ'ড়ে বসলেন ট্রেনে। লাহোরে গিয়ে কি হবে, তা ভেবে দেখবার মত যুক্তি তখন মাথায় ছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল, অবিলম্বে কিছু একটা করা দরকার—যা হোক একটা কিছু—অন্ততপক্ষে লাহোরের দিকে ছুটে যাওয়া।...

লাহোর পর্য্যন্ত অবশ্য পৌঁছতে হয় নি তাঁকে। পথে এক গুজরাটী বন্ধুর সঙ্গে দেখা। দুজনে একসঙ্গে জেলে ছিলেন বহুকাল। তিনি মৃগাঙ্ক-শুভ্রের অসহায় ভাব, অসংলগ্ন ভাষা, উত্তেজিত চোখের দৃষ্টি দেখে জোর ক'রে তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেলেন বম্বেতে নিজের বাসায়। সেখানে কাটল কিছুদিন। শান্তিতেই কাটল। এমন কি, সেখানে একটা ডিস্‌পেন্সারিতে গিয়েও বসতেন মাঝে মাঝে।

তারপর মহাত্মাজী আবার হঠাৎ দেখা দিলেন রাজনৈতিক আকাশে। ৩১এ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। ২৬এ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালিত হ'ল সারা দেশ জুড়ে...কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের বার্ত্তা আবার প্রচারিত হ'ল দেশের আকাশে বাতাসে। ঠিক হ'ল, লবণ-আইন অমান্য করবেন মহাত্মাজী। এ শুনে হাসল অনেকে। 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' ঠাট্টা ক'রে লিখলে, মহাত্মা মে গো অন বয়েলিং সি-ওয়াটার টিল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ওয়াজ অ্যাটেণ্ড! মৃগাঙ্ক-শুভ্রেরও কেমন যেন একটু সন্দেহ জন্মাল। এ ক'রে কি হবে! যথাসময়ে কিন্তু শুরু হয়ে গেল মহাত্মাজীর দাণ্ডি-অভিযান আটাত্তরজন সঙ্গী নিয়ে। যাত্রা করলেন তিনি পদব্রজে, গ্রামে গ্রামে তাঁর অসহযোগবার্ত্তা প্রচার করতে করতে। অপ্রত্যাশিত রকম ফল ফলল। তাঁর পদস্পর্শে দেশের মাটি পর্য্যন্ত সজীব হয়ে উঠল

ষেন। প্রতি পদক্ষেপে পেলেন তিনি জাগ্রত জনতার বিপুল অভিনন্দন। দেশময় জাগল সাড়া। সর্ব্বত্র ধুম প'ড়ে গেল লবণ-আইন-অমান্য করবার। কলকাতায় নুন তৈরি করবার সুযোগ ছিল না। সেখানে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহন আইন অমান্য করলেন প্রকাশ্য সভায় রাজবিদ্রোহমূলক রচনা পাঠ ক'রে। শুরু হয়ে গেল ফের বিদেশী-বর্জ্জন, শুরু হয়ে গেল মদের দোকানে চৌকিদারি। ভদ্র-ঘরের পরদানশীন মেয়েরা পর্য্যন্ত দলে দলে এসে যোগ দিলেন দেশের কাজে। জারি হতে লাগল জরুরি আইনের পর জরুরি আইন। বর্ষণ হতে লাগল লাঠি আর গুলি সত্যগ্রহী জনতার ওপর। ফাটল অনেক মাথা, প্রাণও হারাল অনেকে—সত্যাগ্রহীরা থামল না কিন্তু। গুলির মুখেও নির্ভয়ে এগিয়ে গেল তারা। পেশোয়ারে একদিনেই মরল শত শত সত্যাগ্রহী, তবু তাদের আগ্রহ কমে না। এক দল স'রে গেলেই আর এক দল এসে দাঁড়ায়, তারা ম'রে গেলে আর এক দল। প্রতিবাদ করে না, হাত তোলে না, নীরবে এগিয়ে আসে খালি। গাড়োয়ালী সেনারা গুলি চালাতে অস্বীকার করলে শেষ পর্য্যন্ত। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের সমস্ত চিত্ত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। এই তো চাই, এরই স্বপ্ন তো দেখছিলেন এতদিন। ধরাসনায় চ'লে গেলেন তিনি কংগ্রেস-ক্যাম্পের ডাক্তার হয়ে। সেখানে অভিযান শুরু হবার পূর্ব্বে সরোজিনী নাইডু তাঁদের যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা অনেক-দিন পর্য্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মনে—মহাত্মাজীর দেহ যদিও আজ জেলে, কিন্তু তাঁর প্রাণ রয়েছে তোমাদের সঙ্গে। ভারতের মর্য্যাদা আজ তোমাদের হাতে। কোন হিংসা, কোন উগ্রতা যেন প্রকাশ না পায় তোমাদের ব্যবহারে। ধীর অনিবার্য্য গতিতে এগিয়ে যাও তোমরা, মার খাবে, কিন্তু প্রতিরোধ করবে না, লাঠির ঘা আটকাবার জন্যেও হাত তুলবে না কেউ, শান্ত দৃঢ় পদে এগিয়ে যাবে শুধু পুলিসের লাঠিকে তুচ্ছ ক'রে।

সরোজিনী নাইডুর কথা রেখেছিল সবাই। লোহা দিয়ে বাঁধানো লাঠি

অবিরাম পড়তে লাগল সত্যাগ্রহীদের নগ্ন শিরের ওপর, অজ্ঞান হয়ে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল দলে দলে, কিন্তু টুঁ শব্দটি করলে না কেউ। সকলের সাদা খদ্দর রক্তে রাঙা হয়ে গেল, স্টেচার-বেয়ারাররা নিঃশব্দে এসে তুলে নিয়ে গেল তাদের। আবার এগিয়ে এল আর এক দল। মার খেয়ে তারাও শুয়ে পড়ল, এল আর এক দল···তারপর আর এক দল···পুলিসের লাঠি সমানে চলতে লাগল···অজ্ঞান মৃগাঙ্ক-শুভ্র যখন চোখ খুললেন, তখন তিনি জেল-হাসপাতালে। বিচারে দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়ে গেল।

হাওড়া স্টেশনে থার্ড ক্লাস গাড়ির কামরা থেকে নামলেন যখন মৃগাঙ্ক-শুভ্র, তখন ভিড়ের মধ্যে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি। চারিদিকে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি। চটের মত কাপড়-পড়া মৃগাঙ্ক-শুভ্রকে সমীহ করবার প্রয়োজনই মনে করলে না কেউ। বরং কেউ কেউ তাঁর খদ্দরের দিকে অবজ্ঞাভরেই চাইলে দু-একবার। মহাত্মা গান্ধীর ওপর বাংলা দেশ তখন অপ্রসন্ন। বেহারে কংগ্রেস-মিনিস্ট্রির বাঙালী-নির্য্যাতন চলছে তখনও পুরোদমে—নামাবলীর মত খদ্দর এবং গান্ধীটুপি বাঙালীর চক্ষে ভণ্ডামির আবরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন। তা ছাড়া এক মুখ কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি, রোগজীর্ণ শরীর—মৃগাঙ্ক-শুভ্রের চেহারার মধ্যেও সম্ভ্রম উদ্রেক করবার মত কিছু ছিল না। অনেক কষ্টে কুলীর মাথায় নিজের বিছানা-বাক্স চাপিয়ে মৃগাঙ্ক-শুভ্র এদিক ওদিক চেয়ে ভাবলেন, দাদা টেলিগ্রামটা পান নি বোধ হয়। অগ্রসর হতে যাবেন, এমন সময় নিখুঁত সাহেবি-স্যুট-পরা শশাঙ্ক-শুভ্র এসে দাঁড়ালেন সামনে।

গড! আমি দু-দুবার এখান দিয়ে পাস করলুম, তোমাকে চিনতেই পারি নি।

মৃগাঙ্ক-শুভ্রের মুখে মলিন হাসি ফুটে উঠল, হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন অগ্রজকে।

এঃ, চেহারা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে!

হঠাৎ শশাঙ্ক-শুভ্রের চোখে জল এসে পড়ল, নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন।

বাই জোভ, হোয়াট'স দিস!

তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, চল, গাড়ি এনেছি। একটা সুখবর আছে, শঙ্খর ছেলে হয়েছে, একটু আগে খবর পেলুম। এখনও যাওয়া হয় নি সেখানে।

ও, তাই নাকি?

ছিপছিপে ফরসা সদাসঙ্কুচিত, মুখে-বিনীত-মৃদু হাসি শঙ্খর চেহারাটা মনে পড়ল মৃগাঙ্ক-শুভ্রের।

পাঁচ

শঙ্খ-শুভ্র

ক

যাঁরা স্থূল-দৃষ্টি-সম্পন্ন বাস্তববাদী, যাঁরা সব জিনিসের বাইরেটা দেখেই তার মূল্য নিরূপণ করেন, তাঁরা শঙ্খ-শুভ্রকে ঠিক বুঝবেন না। শঙ্খ-শুভ্র-চরিত্রের আসল সৌন্দর্য্যটা বারম্বার এড়িয়ে যাবে তাঁদের। কারণ সেটা স্থূল বস্তু নয়, সূক্ষ্ম রূপ। বস্তুত বস্তুর বাজারে শঙ্খ-শুভ্র মূল্যহীন। আস্ফালন করবার মত শব্দ-বহুল বা বর্ণ-বহুল এমন কিছুই নেই তার, যা তাক লাগিয়ে দিতে পারে সকলকে। সে মার্জ্জিত-রুচি ভদ্রলোক। ভদ্রতা জিনিসটা যদিও বিরল, কিন্তু এই বিরল গুণ কারও মধ্যে প্রত্যক্ষ করলে আমরা বাহবা দিয়ে উঠি না। ভদ্রতাটা আমরা যেন সকলের কাছে প্রত্যাশা করি। না পেলে ক্ষুণ্ণ হই, পেলে চমৎকৃত হই না। সত্যিকার ভদ্রলোক হতে হ'লে ছোট বড় যে সব ত্যাগ অহরহ করতে হয়, সে সব ত্যাগের মূল্য দিতে আমরা অভ্যস্ত নই। প্রকাণ্ড একটা কিছু প্রচণ্ডভাবে এসে আমাদের চৈতন্যলোককে নাড়া না দিলে আমরা সাড়া দিই না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগে আমরা হাততালি দিতে কার্পণ্য করি না, কিন্তু যদি কেউ নিজের একমাত্র মশারিটি অতিথিকে দিয়ে সারারাত মশার কামড় ভোগ করেন, তাঁর ব্যবহারে চমকপ্রদ কিছু অনুভব করবার প্রয়োজন আমাদের হয় না। শঙ্খ-শুভ্র আজীবন নিজের মশারিটি পরকে দিয়ে মুখে বিনীত হাসিটি ফুটিয়ে নীরবে মশার কামড় ভোগ করেছে। এ নিয়ে পাঁচজনের কাছে বাহাদুরি করতে তার ভদ্রতায় বেধেছে, পাঁচজনও এ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হবার কোন প্রেরণা পান নি।

ছেলেবেলায় প্রথম যখন সে ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে সানন্দে নিজের কৃতিত্বটা সম্যকরূপে উপভোগ করবার আয়োজন করছে, ক্লাসের মাস্টারেরা, বিশেষ

ক'রে থার্ডমাস্টার, যখন সবে তাকে ভালবাসতে শুরু করেছেন—শৈশবের সেই স্বর্গলোকে একদিন এসে হানা দিলেন ঠাকুরদা।

কথায় কথায় হংস-শুভ্র একদিন বললেন শশাঙ্ক-শুভ্রকে, আমার ইচ্ছে করে, শঙ্খ রজত হীরক তিনজনকেই হিন্দু আদর্শে গ'ড়ে তুলি, অবশ্য তোমার যদি না আপত্তি থাকে।

ষষ্ঠীচরণকে নিয়ে যা কাণ্ড ঘটেছিল, তার জের অনেকদিন গড়িয়ে গড়িয়ে মাত্র কিছুদিন আগে মিটেছে, ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু টাকারও দরকার তখন, শশাঙ্ক-শুভ্র সোজাসুজি আপত্তি করতে পারলেন না।

বললেন, আমার আর আপত্তি কি! তবে সে রকম আদর্শ হিন্দু স্কুল কোথা? রবিবাবুর শান্তিনিকেতনে অবশ্য—

না, শান্তিনিকেতনে পাঠাতে বলছি না। কাশীতে আমার একজন বাল্য-বন্ধু গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে একটি পাঠশালা খুলেছে—

কি হয় সেখানে?

সংস্কৃত পড়ানো হয়, ব্রহ্মচর্য্যের সব নিয়ম পালন করতে হয়। বাবুয়ানি চলবে না সেখানে, মাথা কামিয়ে টিকি রাখতে হবে।

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চুপ ক'রে রইলেন শশাঙ্ক-শুভ্র।

শঙ্খ ঠাকুরদার চোখের দিকে চেয়ে ছিল। মনে হ'ল, তাঁর চোখ দিয়ে আগ্রহ যেন ফেটে বেরুচ্ছে।

শশাঙ্ক-শুভ্র বললেন, হীরু অবশ্য মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না এখন, শঙ্খ রজত যদি যেতে চায়—

রজতও সেখানে ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল, আমি মাথা কামিয়ে টিকি রাখতে পারব না।

তুমি?

হংস-শুভ্র শঙ্খর দিকে ফিরে চাইলেন। তখন শঙ্খর বয়স যদিও খুব বেশি নয়, তবু সে যেন অনুভব করলে, ঠাকুরদার জীবন-মরণ যেন নির্ভর করছে তার

উত্তরের ওপর। মাথা কামিয়ে টিকি রাখবার ইচ্ছে তারও ছিল না, কিন্তু ঠাকুরদার মুখের দিকে চেয়ে সে ইচ্ছা সে প্রকাশ করতে পারলে না। তার এতবড় বীরত্বের আসল মূল্য কিন্তু কেউ দেয় নি। হংস-শুভ্র সগর্ব্বে ভাবলেন, যোগীশ্বরের বংশের ছেলে তো! এই ছেলেটাই বংশের মুখ রাখবে দেখছি। শশাঙ্ক-শুভ্র ভাবলেন, একটা নতুন জায়গায় যাবার লোভেই রাজি হয়েছে বোধ হয়। বাসন্তী ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু শ্বশুরের জেদ, স্বামী মুখ ফুটে বলেছেন—আপত্তি নেই, ছেলেও যেতে চাইছে, এই ঐক্যতানে বেসুর তুলে রসভঙ্গ করবার মেয়ে বাসন্তী নয়। পরে অবশ্য অন্য উপায় উদ্ভাবন ক'রে হংস-শুভ্রের হিন্দু আদর্শকে ভূশায়ী করেছিল সে; তখন কিন্তু মত দিতে হয়েছিল।

বাল্যবন্ধুর সংস্কৃতবহুল অতিশয়োক্তিপূর্ণ চিঠির উপর নির্ভর ক'রে স্বয়ং হংস-শুভ্র শঙ্খকে নিয়ে কাশী গেলেন। জটা-বল্কল-ধারী মুনি-ঋষি-পূর্ণ মৃগ-ময়ূর-অধ্যুষিত তপোবন অবশ্য তিনি প্রত্যাশা করেন নি; কিন্তু ভদ্রগোছের কিছু একটা দেখতে পাবেন, এ আশা ছিল তাঁর। কিন্তু কাশীর সেই গলিতে পদার্পণ ক'রে একটু কেমন যেন হতাশ হয়ে গেলেন তিনি। আবর্জ্জনাপূর্ণ অত্যন্ত নোংরা একটা গলি। পিছন দিক থেকে পাচক ব্রাহ্মণের মত যে লোকটিকে ডেকে তিনি বললেন, ওহে, পণ্ডিত মশায় কোথায় আছেন একবার ডেকে দাও তো। সে লোকটি যখন মুখ ফেরালে, তখনও হংস-শুভ্র চিনতে পারলেন না। কপালে-শির-ওঠা কোটরগত-চক্ষু এই ব্যক্তিটিই যে তাঁর বাল্যবন্ধু মথুরামোহন, সংস্কৃত কলেজে এঁরই বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে তিনি যে একদা মুগ্ধ হতেন, এ সত্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রেও বিশ্বাস করতে একটু দেরি হ'ল তাঁর। পরিচয় হতেই অবশ্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন উভয়ে। ক্রমশ আলাপ ঘনিষ্ঠতর হ'ল। মথুরামোহন অবশেষে হংস-শুভ্রকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, নিদারুণ দারিদ্র্য, বিমুখ রাজশক্তি, উদাসীন সমাজ—এই ত্রিবিধ দুরতিক্রম্য বাধাকে অতিক্রম ক'রে বহুকষ্টে তিনি সনাতন-হিন্দু-আদর্শমূলক এই যে প্রতিষ্ঠানটি খাড়া ক'রে তুলেছেন, তা আয়তনে ক্ষুদ্র হ'লেও আদর্শে ক্ষুদ্র নয়। চারটি ছাত্রকে তিনি

খেতে দেন এবং সংস্কৃত পড়ান। ছাত্রের অভিভাবককে কোন খরচ দিতে হয় না, তিনিই সমস্ত ভার বহন করেন। অর্থাৎ বিদ্যা বিক্রয় করেন না তিনি, দান করেন। ছাত্রদের শুধু পড়তেই হয় না, সমস্ত হিন্দু আচার শিখতে হয়, সমস্ত গৃহকর্ম্মাদি স্বহস্তে করতে হয়। হংস-শুভ্র ঠিক মুগ্ধ না হ'লেও ক্ষুব্ধ হতে পারলেন না। তাঁর মনে হ'ল, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় একজনের চেষ্টায় এর চেয়ে বেশি আর কি হবে! মথুরামোহন ইচ্ছে করলেই রাজসরকারে চাকরি নিতে পারত, বিদ্যা এবং সুযোগ দুইই ছিল তার, কিন্তু সে সব না ক'রে নিজের ব্রাহ্মণত্ব বজায় রেখে হিন্দু-সংস্কৃতির সেবায় সে আত্মনিয়োগ করেছে, হাততালির লোভে নয়, কর্ত্তব্যবোধে। মথুরামোহনের চোখের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টি দেখে এবং উদ্দীপনাপূর্ণ আলাপ শুনে হংস-শুভ্রের মন থেকে সমস্ত দ্বিধা মুছে গেল। শঙ্খকে তো রেখে এলেনই টোলে, কিছু সাহায্যও ক'রে এলেন। আর একটা অপ্রত্যাশিত কাজও তিনি ক'রে এলেন, ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে যা ঠিক খাপ খায় না। শঙ্খ-শুভ্রকে নিকটবর্ত্তী পোস্ট-অফিসে নিয়ে গিয়ে তার নামে হাজারখানেক টাকা জমা ক'রে পাস-বইটা তার হাতে দিয়ে ব'লে এলেন, দরকার হয় তো খরচ করিস।

শঙ্খ-শুভ্রকে অবশ্য এক মাসের বেশি থাকতে হয় নি।

এই এক মাসের মধ্যেই সে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিল কিন্তু। ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে 'ব্রহ্ম মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারি' মন্ত্র জপ ক'রে শয্যাত্যাগ করতে, নিজের হাতে কাপড় কাচতে, বাসন মাজতে, গো-সেবা করতে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের দুরূহ সূত্রগুলো আয়ত্ত করতে কষ্ট হ'ত তার খুবই; কিন্তু সপ্তাহে যে দুখানা চিঠি সে বাড়িতে লিখত, তাতে তার আভাসমাত্র থাকত না। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হ'ত তার এক সহপাঠীর আচরণে। শঙ্খ-শুভ্রের নিরীহ নম্র ব্যবহার, অভিজাতসুলভ ভদ্রতা, মূল্যবান কাপড় জামা বালিশ তোষক ছেলেটাকে হিংস্র ক'রে তুলেছিল যেন। সে সুযোগ পেলেই আড়ালে শঙ্খ-শুভ্রকে অশ্লীল কথা শোনাত অদ্ভুত অশ্লীল ভঙ্গীভরে। এমন সব

অদ্ভুত অসভ্য কথা বলত, যা শঙ্খ-শুভ্র শোনেও নি কোনদিন। একদিন ছুরি গলিয়ে তার বালিশটা কেটে দিলে, কালি ঢেলে দিলে বিছানার চাদরে। শঙ্খ-শুভ্র কোন নালিশ করে নি এ নিয়ে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবার, সকলকে ভালবাসবার। ঠাকুরদার স্বপ্নকে সফল ক'রে তোলবার আগ্রহ সত্যিই জেগেছিল তার মনে। গায়ত্রী পাঠ করবার সময় সত্যিই সে মনকে যথাসম্ভব প্রসারিত ক'রে বরেণ্য সবিতার জ্যোতি কল্পনানেত্রে দেখবার চেষ্টা করত। পরিবর্ত্তিত অবস্থায় প'ড়ে শুধু সে যে নুয়ে পড়ে নি তা নয়, ওই আদর্শে ওই অল্প সময়ের মধ্যেই সে বেশ খানিকটা অনুপ্রাণিতও হয়েছিল, এবং হয়তো তার জীবন ওই ছাঁচেই ঢালা হয়ে যেত, যদি না বাসন্তী হঠাৎ এসে হাজির হ'ত সে সময়।

বাসন্তীর মামা যেই সিভিল সার্জন হয়ে বদলি হয়ে এলেন কাশীতে, অমনই বাসন্তী এসে হাজির হ'ল একদিন। যে কারণে শঙ্খ ঠাকুরদার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল, ঠিক সেই একই কারণে তাকে বাসন্তীর প্রস্তাবেও রাজি হতে হ'ল, এবং তখন যদিও তার স্পষ্টভাবে বোঝবার বয়স হয় নি, তবু আভাসে সে অনুভব করেছিল বোধ হয় যে, নিজের অন্তরতম আদর্শকে অক্ষত রাখতে হ'লে ভদ্রতা নামক সর্ব্বরঞ্জন সুকুমার বৃত্তিটিকে মনের সদর থেকে সরিয়ে দুর্মুখ দুর্দ্ধর্ষ কোন দারোয়ান সেখানে বসানো প্রয়োজন। সারাজীবন ধ'রে সে এই চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি। ভদ্রতার খাতিরে অনেক কিছুই বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে বার বার।

বাসন্তী এসে তাকে দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে বললে, তোকে পেটব্যথার ভান করতে হবে।

শঙ্খ বিস্মিত হয়ে গেল।

সে কি! পেটব্যথার ভান করতে হবে কেন?

অসুখের ভান না করলে তোকে নিয়ে যাই কি ক'রে এখান থেকে? তোর ঠাকুরদাকে চিনিস তো।

নিয়ে যাবে কেন? আমার বেশ তো লাগছে এখানে। গুরুদেব গুরুমা দুজনেই খুব ভালবাসেন, যত্ন করেন। আমার কিছু তো কষ্ট হয় না।

কিন্তু আমার যে বড্ড কষ্ট হয় বাবা, তোকে ছেড়ে থাকতে। সে আমি পারব না।

বাসন্তীর কণ্ঠস্বরে কি যে একটা বেজে উঠল, শঙ্খ-শুভ্রের সমস্ত বিরুদ্ধতা অবলুপ্ত হয়ে গেল নিমেষে। মায়ের চোখের দিকে চেয়ে নির্ব্বাক হয়ে রইল সে। চোখে জল টলটল করছে।...স্বয়ং সিভিল সার্জন যখন বললেন যে, কাশীর জলহাওয়া এ ছেলের সইবে না, তখন হিন্দু আদর্শের ওজুহাতে শঙ্খ-শুভ্রকে মথুরামোহন আটকে রাখতে সাহস করলেন না। হংস-শুভ্রেরও আপত্তি করবার পথ রইল না আর। পারিবারিক আবহাওয়া অনুকূল থাকলে হংস-শুভ্র হয়তো কলকাতা শহরে কোন টোল বার করতেন বা সৃষ্টি করতেন, কিন্তু শশাঙ্ক-শুভ্রের ওপর মর্ম্মান্তিক চ'টে ছিলেন তিনি তখন। এত টাকা লোকসান দিয়েও ছেলেটার চৈতন্য হ'ল না, আবার আমলকির মোরব্বা ক'রে বিলেতে চালান দেবার আয়োজন করছে! মানা করলে শুনবে না। ওর কোন সংস্রবেই আর থাকবেন না তিনি। শঙ্খ নির্ব্বিবাদে এসে হিন্দুস্কুলে ভরতি হয়ে গেল। হংস-শুভ্র টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলেন না।

খ

যথাসময়ে হিন্দুস্কুলের গণ্ডি পার হয়ে শঙ্খ-শুভ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে ঢুকল এবং পরীক্ষার পর পরীক্ষা পাস করতে লাগল সসম্মানে। কিছুদিন পরে হঠাৎ যেন সে আবিষ্কার করলে নিজেকে। নানাবিধ সহপাঠীর সংস্রবে এসে, নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাতে আহত-প্রতিহত হয়ে, বহু প্রকার আলাপ-আলোচনা শুনে, হরেক রকম বই প'ড়ে, পারিবারিক আনন্দ-উত্তেজনার দোলায় দুলে, ব্যক্তিগত হর্ষ-বিষাদের কারণ অনুসন্ধান করতে করতে নিজের অজ্ঞাতসারেই

সে যেন নিজের জগৎ তৈরি করছিল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে, সে জগতে সে ছাড়া আর কেউ নেই—সেখানে নিজেই সে নিয়ন্তা এবং নিয়ন্ত্রিত। সেখানকার আকাশ বাতাস ফুল পাখী, রঙ রূপ সুর, সবই তার নিজের সৃষ্টি, বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে যে, নিদারুণ ভিড় এবং কলরবের মধ্যেও সে তার এই স্বতন্ত্রলোকে নির্জ্জনবাস করছে।...কলেজের কমন-রুমে হৈ-হৈ করছে যখন সবাই মোহনবাগানের খেলা নিয়ে, ডিবেটিং ক্লাবে মাক্সিজ্‌মের স্বপক্ষে-বিপক্ষে বক্তৃতার তুমুল ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে যখন, নন-কো-অপারেশনের উত্তেজনায় সমস্ত কলেজ যখন আন্দোলিত, তখন শঙ্খ-শুভ্র সে সবের মধ্যে থেকেও কেমন যেন অন্যমনস্ক। সব সময় অন্যমনস্ক থাকা সম্ভবপর হ'ত না অবশ্য, আলোচনায় যোগ দিতে হ'তই, কিন্তু যা দু-চার কথা বলত সে, তা অত্যন্ত সাবধানে, অত্যন্ত অনাসক্ত অনাবদ্ধভাবে। ফরসা-জামা-কাপড়-পরা শৌখিন বিলাসীকে পায়ে হেঁটে কোন কর্দ্দমাক্ত গলি যদি পার হতে বাধ্য করা হয়, তা হ'লে সে যেমন কোঁচাটি তুলে সাবধানে এটা ওটা ডিঙিয়ে কাদা বাঁচিয়ে সেটা পার হয়ে যায়, শঙ্খ-শুভ্রও অনেকটা তেমনই করত। গলিটা কেমন তা ভাল ক'রে দেখবার আগ্রহ হ'ত না তার, গলিটা নোংরা এ জ্ঞান মনে স্পষ্ট হবামাত্রই তার সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়ে উঠত ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যে। ভদ্রতার খাতিরে যদিও তাকে ঢুকতে হ'ত মাঝে মাঝে নানা নোংরা গলিতে, কাদার ছিটেও লাগত মাঝে মাঝে গায়ে, কিন্তু গলি-জাতীয় সঙ্কীর্ণ নোংরামিকে কোন দিন প্রশ্রয় দেয় নি সে নিজের জগতে। পারতপক্ষে এড়িয়েই চলত ওসব। দলবদ্ধ জনতার জয়ধ্বনি-মুখরিত অন্তঃসারশূন্য উৎসব অথবা সীমাবদ্ধ পরিচিত গোষ্ঠীর অতিশয় মামুলী আলাপ কোনটাই তার চিত্ত স্পর্শ করত না। জয়ধ্বনি-মুখরিত উৎসবগুলো বরং খানিকটা সহ্য করতে পারত সে—অন্তঃসারশূন্য হ'লেও ওগুলো প্রাণের আবেগ-প্রসূত, এবং যা প্রাণের আবেগ-প্রসূত তা প্রাণকে খানিকটা স্পর্শ করেই; কিন্তু তথাকথিত বন্ধুবান্ধবদের তথাকথিত বিশ্রম্ভালাপ অসহ্য ছিল তার পক্ষে। টমসন সাহেব

মিস্টার চ্যাটার্জিকে কি বললেন, কার মোটরের রেডিয়েটার ফেটে কি হ'ল, কে কোন্ কথা ব'লে কাকে থ ক'রে দিয়েছে অথবা কে কত সস্তায় চাল কিনতে পারে—এই সব আলোচনার আবর্ত্তে পড়লে সত্যিই কষ্ট হ'ত তার। সবচেয়ে ভয় করত সে সেই সব নিরীহ লোকগুলিকে, যারা দেখা হ'লেই হাসি-মুখে এগিয়ে আসে এবং শুরু করে—খবর সব ভাল তো, তারপর আছ কেমন বল। পালিয়ে আত্মরক্ষা করত সে। পালিয়ে যেত সেই জগতে, যেখানে একটা বিশেষ ব্র্যাণ্ডের সিগারেট নীরবে জ্বলছে পছন্দ ক'রে-কেনা হোল্ডারটির মুখে, বিশেষ ধরনের চা ধূমায়িত হচ্ছে চাঁপারঙের পেয়ালাটিতে, বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কবি গ্রন্থকার চিত্রকর বিশেষ ধরনের জীবন-দর্শনে পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছেন সেখানকার বিশিষ্ট মানসিকতাকে, সেখানকার নির্জ্জন নিঃসঙ্গতা মধুর হয়ে ওঠে কল্পনার সাহচর্য্যে, যেখানে বিশেষ একটি বন্ধুর সামান্য একটু হাসি বা ছোট্ট একটু কথা আলোক-রেখা বা শিশির-বিন্দুর মত পরিস্ফুট ক'রে তোলে প্রাণ-পুষ্পকে। এই কাম্য জগতে সে আবিষ্কার করলে নিজেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢোকাবার কিছুদিন পরেই।

···এবং তার কিছুদিন পরেই সেই জগতের দ্বারে এসে অহিংস সত্যাগ্রহ শুরু ক'রে দিলেন মহাত্মা গান্ধীর দল এবং সে দলের শীর্ষদেশে দণ্ডায়মান—অপর কেউ নয়, তার নিজের কাকা। মৃগাঙ্ক-শুভ্র অবশ্য নিজে মুখ ফুটে বাড়ির কাউকে কিছু করতে বলেন নি। কিন্তু তাঁর অশরীরী আত্মা নীরব ভাষায় যা বলছিল, শঙ্খ-শুভ্রের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। তা ছাড়া মহাত্মা গান্ধীর আবেদন যে একেবারে তার চিত্ত স্পর্শ করে নি, তা নয়। প্রথমে শ্রদ্ধাই হয়েছিল।

সে স্বতন্ত্র জগতে একক বাস করত ব'লে যে পৃথিবীর আর সকলকে অবজ্ঞার চোখে দেখত, তা নয়। বরং ঠিক তার উলটো। ট্রেনে সহযাত্রীদের বাক্স-বিছানা সম্বন্ধে অধিকাংশ ভদ্রলোকের যে মনোভাব, তারও ঠিক সেই মনোভাব ছিল সকলের সম্বন্ধে, এমন কি নিজের পরিজনদের সম্বন্ধেও। সে

মনোভাব ঠিক অবজ্ঞা নয়, ঠিক ঔদাসীন্যও নয়, তা শিক্ষিত স্বাতন্ত্র্যবাদীর মনোভাব। যদি কোন কারণে অপরের স্যুটকেসের ডালা খুলে যায় এবং তার প্রতি অনিবার্য্যভাবে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তা হ'লে সেদিকে যে দৃষ্টি সে নিক্ষেপ করবে, তা অবজ্ঞার দৃষ্টি নয়, কৌতূহলের দৃষ্টি। তার সঙ্গে সম্ভ্রম থাকাও সম্ভব। কিন্তু কোন কারণেই সে অপরের স্যুটকেস ঘাঁটকাবে না, কিংবা নিজের স্যুটকেসের জিনিসের সঙ্গে পরের স্যুটকেসের জিনিস মিলিয়ে মিশিয়ে ফেলবে না, কিংবা উচ্ছ্বসিত হয়ে অপরের স্যুটকেসের নকলে নিজের স্যুটকেসের চেহারা বদলে ফেলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে না। নিজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তার মন যেমন সজাগ, অপরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও সে তেমনই সশ্রদ্ধ। নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঢাক পেটাতে তার যেমন লজ্জা, অপরের বৈশিষ্ট্যকে বিধ্বস্ত করতে তার তেমনই সঙ্কোচ। প্রকৃতির প্রত্যেক সৃষ্টিই যে স্বতন্ত্র মহিমায় মহিমান্বিত, প্রত্যেক মতবাদের মূলেই যে কিছু না কিছু মহৎ প্রেরণা আছে—এ কথা সে যেমন স্বীকার করত, তেমনই এ কথাও সে মনে মনে জানত যে, তার স্বকীয় মহিমা, স্বকীয় মতবাদও তুচ্ছ নয়. তা বর্জ্জন ক'রে অপরের মহিমা অপরের মতবাদ গ্রহণ করলে কিছুতেই তার জীবন সার্থক হবে না। তাই ইতরের মত হুড়োহুড়ি ক'রে সে যেমন নকলও করতে যেত না, ইতরের মত হৈ-হৈ তর্ক ক'রে নিজেকে জাহির করবার দুরন্ত আগ্রহে অপরকে নিষ্প্রভ ক'রে দেবার প্রবৃত্তিও তার হ'ত না কখনও। বরং নিজের রুচির সঙ্গে নিজের জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাইরে থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতে পারলে সে যেন কৃতার্থ হয়ে যেত। তাই ব'লে তার অন্তরলোকে যে বাণীমূর্ত্তি সে ধীরে ধীরে গ'ড়ে তুলেছিল, তার মুকুটে যে কোন চকচকে রত্ন বহুমূল্য ব'লে লাগিয়ে দিলেই যে তার তৃপ্তি হ'ত তা নয়, সামান্য পালকেও তার মন ভ'রে উঠত যদি মুকুটের সঙ্গে ঠিক মানিয়ে যেত সেটা।

ছন্দ-পতন হ'ল ব'লেই মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কাছে গিয়ে ফিরে এল সে। চারিদিকে যখন স্কুল-কলেজ বয়কট. চলছে, কলেজের গেটে গেটে যখন পিকেটিঙের ধুম,

তখন সে কলেজ যায় নি বিদেশী শিক্ষা বর্জ্জন করা উচিত মনে করেছিল ব'লে নয়—যায় নি ইতরামি এড়াবার জন্যে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তুচ্ছ কলেজ যাওয়া নিয়ে একটা নাটকীয় কাণ্ড করবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না তার, মনে হয়েছিল, এর চেয়ে কামাই ক'রে জরিমানা দেওয়া বরং ভাল। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কাছে কিন্তু চরকা ঘোরাতে গিয়েছিল সে সত্যিকার প্রেরণা নিয়ে। সত্যিকার প্রশ্ন জেগেছিল মনে। কিন্তু মৃগাঙ্ক-শুভ্র নিজেই অজ্ঞাতসারে তার সে প্রেরণার মূলে কুঠারাঘাত করলেন একদিন। তর্কপ্রসঙ্গে তাঁর এক বন্ধুকে যখন বললেন তিনি যে, চরকা চালানোই এখন আমাদের একমাত্র পথ, নিরস্ত্র জাতের পক্ষে এই এখন প্রুডেন্স, তখন—প্রুডেন্স কথাটা শোনামাত্রই তার মনে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ব্লেকের একটা লাইন মনে প'ড়ে গেল—"Prudence is a rich ugly old maid courted by Incapacity"....আলোটা টপ ক'রে যেন নিবে গেল হঠাৎ। চরকা যদি এই হীনতার প্রতীক হয়, তা হ'লে চরকার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তা ছাড়া সব দুয়ার এঁটে বন্ধ ক'রে দিয়ে বাইরের পৃথিবীকে বর্জ্জন করলেই কি আমাদের ভারতীয়ত্ব বেশি ক'রে ফুটবে? সে ছেলেবেলায় টিকি রেখে সন্ধ্যাহ্নিক করতে শিখেছিল, এখনও তার টিকি আছে, এখনও সে সন্ধ্যাহ্নিক করে, ভাল লাগে ব'লেই করে। নির্জ্জন ঘরে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব'সে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে অনন্ত কল্পলোকে উড়ে বেড়াতে ভাল লাগে তার বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তিকে কেন্দ্র ক'রে, একটা অদ্ভুত রকম আনন্দ পায় সে। অনেক উপহাস অনেক ব্যঙ্গ সহ্য ক'রেও তাই সে এখনও আঁকড়ে আছে এসব—ভারতীয় ব'লে নয়, ভাল লাগে ব'লে। কি এসে যায় অপরের উপহাসে বা ব্যঙ্গে! সে সিগারেট খায়, চা-ও খায়। বাঁধা গতের সঙ্গে মিলত থেলো হুঁকোয় তামাক এবং পাথরের গ্লাসে গুড়ের শরবত খেলে—আরও বাহবা পেত হয়তো জুতো না প'রে খড়ম পায়ে দিলে। কিন্তু বাঁধা গতে 'সংগত' ক'রে সকলের কাছে হাততালি পাওয়াই তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়—বস্তুত, তার বিশেষ কোন উদ্দেশ্যই নেই, নিজের জীবন নিজের

মত ক'রে যাপন করতে চায় সে কারও কাছে কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে। গীতা-উপনিষদের সঙ্গে বায়রন-কীট্স কেন পড়ছে—এ জবাবদিহি করবার হীনতা সে কিছুতেই স্বীকার করবে না, বায়রন-কীট্স বিদেশী ব'লে তাদের ত্যাগও সে করতে পারবে না। বিদেশী-বর্জ্জনের ওই আস্ফালনের মধ্যেই একটা হীনতা আছে। কোন রকম হীনতার সংস্পর্শে এলেই মনের সমস্ত আনন্দ ম্লান হয়ে যায় যেন। প্রুডেন্স-এর জন্যে চরকা চালাতে হবে শুনেই শঙ্খ-শুভ্রের সমস্ত উৎসাহ নিবে গেল। আর একটা হেতু গোড়া থেকেই তার মনকে বিরূপ ক'রে রেখেছিল। যে কোন হাল্লা-হৈচৈ-আস্ফালন-আড়ম্বর পীড়াদায়ক মনে হ'ত তার কাছে। আমরা স্বদেশী, আমরা আত্মিক-শক্তিসম্পন্ন, আমরা অহিংস, আমরা সত্যাগ্রহী, আপিসে-আদালতে দোকানে দোকানে কলেজের গেটে গেটে পতাকা ঘাড়ে ক'রে সেটা সগর্জ্জনে প্রকাশ করার মধ্যে কেমন যেন একটা নোংরামি আছে সে অনুভব করত। তবু মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কাছে সে গিয়েছিল মৃগাঙ্ক-শুভ্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশত। কিন্তু ফিরে আসতে হ'ল। মন কিছুতেই পাখা মেলতে চাইল না। কতকগুলো বাঁধা বুলি আউড়ে ব্রাহ্মণত্বের ভড়ং ক'রে অতি স্থূল আধিভৌতিক সংগ্রামে লিপ্ত হবার উৎসাহ মোটেই পেলে না সে। অহিংস সত্যাগ্রহের নানা রকম ব্যাখ্যা শুনেও এ বিশ্বাস তার মন থেকে কিছুতে ঘুচল না যে, ওটা বিপক্ষকে জব্দ করার ফাঁদ মাত্র এবং অনন্যোপায় হয়ে সে ফাঁদ পাতা হয়েছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। তার মনে হ'ল, যীশুখ্রীষ্টের প্রেমের বাণীকে সেণ্ট পল যেমন ক্রিশ্চ্যানিটিতে পরিণত করেছিলেন, বুদ্ধ-চৈতন্যের অহিংসানীতিকে মহাত্মাজী তেমনই রাজনীতিতে পরিণত করতে চান। সেণ্ট পলের ক্রিশ্চ্যানিটির উপর তার যেমন শ্রদ্ধা ছিল না, এর ওপরও তেমনই কোন শ্রদ্ধা হ'ল না। কিন্তু না হ'লে কি হবে, চরকা তবু ঘোরাতে হ'ল কিছুদিন। হঠাৎ ছেড়ে চ'লে আসতে ভদ্রতায় বাধল কেমন যেন। তা ছাড়া মাও আসতে দিলে না। কাশীতে বাসন্তী যেমন তাকে মিথ্যাচরণ করতে বাধ্য করেছিল, এখানেও ঠিক তেমনই

করলে। মা তাকে এমন বিপদে ফেলে মাঝে মাঝে! অথচ মায়ের মুখের দিকে চাইলে তার অনুরোধ অগ্রাহ্য করবার শক্তিই যেন হারিয়ে ফেলে সে। বস্তুত, কারও সকাতর অনুরোধ উপেক্ষা করবার শক্তি তার নেই। রুচিবিরুদ্ধ হ'লেও পরের অনুরোধে বারম্বার তাকে এঁদো গলিতে ঢুকতে হয়েছে। মাসখানেক চরকা ঘোরাবার পর তার ক্লান্ত মন যখন চরকা-পর্ব্বে যবনিকা-পাত করবার আয়োজন করছে, তখন হঠাৎ বাসন্তী একদিন ব'লে বসল, তুই তবু ছোটকাকার মান রক্ষে করেছিস বাবা। আর তো কেউ চরকা ছুঁলেও না।

আমিও আর পেরে উঠছি না।

তা ব'লে তুমি থামতে পাবে না। মন ভেঙে যাবে তা হ'লে বেচারীর। কাল তোর কত প্রশংসা করছিল আমার কাছে।

শঙ্খ-শুভ্র সত্যি কথাটা বলতে গিয়ে সসঙ্কোচে চুপ ক'রে গেল।

মনে হ'ল, মা যদি আবার ব'লে দেন, কষ্ট পাবেন তিনি। আসল কথাটা না ব'লে ইতস্তত ক'রে তাই সে কেবল বললে, ভাল লাগছে না খুব।

তা হোক। একটু আধটু চরকা ঘোরালে কি আর এমন কষ্ট হবে তোমার? ঠাকুরপোর মনে কত বড় একটা গর্ব্ব যে, তুই রোজ চরকা কাটিস। বাসন্তীর প্রশংসা-লোলুপ মন কিছুতেই থামতে দিলে না শঙ্খ-শুভ্রকে। যদিও তা'র নিজের জগতে চরকার ঘর্ঘর-ধ্বনিকে সে ঢুকতে দিলে না, কিন্তু বাইরের জগতে ভদ্রতার খাতিরে রোজ তাকে চরকা কেটে যেতে হ'ল দিনের পর দিন। নিজের 'প্রিন্সিপ্‌ল' আস্ফালন ক'রে রজত বা হীরকের মত স'রে থাকতে পারলে না সে কিছুতে। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের জেল হবার পর সে যেন কারা-মুক্ত হ'ল, এবং সহসা সন্দেহ-মুক্তও হ'ল যেন। জেলে যাবার দিন কাকামণির যে মুখচ্ছবি দেখেছিল সে, তা অপরূপ। পুলিসের ব্যাটনের ঘায়ে ফাটা মাথায় রক্ত-ভেজা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো, নাকটা থেঁতলে গেছে, মুখে কিন্তু কি প্রশান্ত হাসি! তার মনে হ'ল, না না, ভুল করেছি বোধ হয়। এই তো বীরত্ব! এর মধ্যে লেশমাত্র হীনতা থাকতে পারে না। এ কথা স্বীকার ক'রেও কিন্তু

সে কাকার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারলে না। সেই কারণে পারলে না, যে কারণে সবুজ-রঙের পক্ষপাতী লোক চুনিকে ভাল পাথর স্বীকার ক'রেও কেনবার বেলায় পান্না কেনে। তার মন যে আকাশে উড়ে আনন্দ পেত তা সাহিত্যের আকাশ, যে সমুদ্রে অবগাহন ক'রে তৃপ্তি পেত তা রসের সমুদ্র। সে আকাশে সে সমুদ্রে কোন গণ্ডি নেই, কোন সীমা নেই, কোন জাতিভেদ নেই। সেখানে গল্‌স্‌ওয়ার্দি, শেক্‌স্‌পিয়র, কালিদাস, ভল্‌টেয়ার, গেটে, ভার্জিল, চণ্ডীদাস, ইয়েট্‌স, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রেম্‌ব্র্যাণ্ড, র‍্যাফেল অবলীলাক্রমে এক পংক্তি-ভোজনে বসতে পারেন, রসস্রষ্টা সাহিত্যিক গান্ধীরও সেখানে অবাধ গতি। কিন্তু যে গান্ধী সি. আর. দাশকে হারিয়ে দেবার জন্যে ভোটারদের সহযোগিতা কামনা করেন, লেফ্‌ট উইংকে নিষ্প্রভ ক'রে দেবার জন্যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবি থেকে লম্ফ দিয়ে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে উপনীত হন, যাঁর নেতৃত্বে ভাড়া-করা ভলাণ্টিয়ারের দল অহিংসার ভড়ং ক'রে বেড়ায় যেখানে সেখানে, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানকে মেলাবার জন্যে যিনি তুরস্কদেশীয় খিলাফতের সহায়তা নিতে ইতস্তত করেন না—সেই মহাত্মা-নামধেয় কৌশলী গান্ধীর সঙ্গে—তাঁর অতি বিশুদ্ধ স্বদেশ-হিতৈষণা সত্ত্বেও, তাঁর মহত্ত্ব বীরত্ব আত্মত্যাগ স্বীকার ক'রে নিয়েও—শঙ্খ-শুভ্র কিছুতেই নিজের সুর মেলাতে পারে নি। এ নিয়ে কোন কলহ বা আস্ফালন সে করে নি, সসঙ্কোচে পাশ কাটিয়ে স'রে দাঁড়িয়েছে মাত্র। যে জগৎ তার মানস-লোক, সে জগতেও মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা আনন্দ-উদ্বেগ সবই আছে—তা মানুষেরই জগৎ—কিন্তু তা কোন এক বিশেষ দেশের মানুষের নয়। সে জগতেও উদারতা প্রশংসনীয়, কিন্তু তা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বিশেষ রকম ছাপ-মারা উদারতা নয়, ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারবাসীর দুর্দ্দশায় তা অবিচলিত থেকে গুর্জ্জরবাসী চাষার দুর্দ্দশায় তা বিচলিত হয় না শুধু, সে উদারতা সর্ব্বজনীন সহজ সহৃদয় উদারতা—স্বয়ম্প্রভ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহজবেদ্য; ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে এই উদারতা যখনই সে দেখেছে,

তখনই তার অন্তর জয়ধ্বনি ক'রে উঠেছে। কিন্তু তাঁর 'ইনার ভয়েস'-এর বিচিত্র আচরণে আবার কেমন যেন অস্বচ্ছ হয়ে গেছে সব—এমন কথাও মনে হয়েছে, লোকটা ভণ্ড নয় তো! অর্থাৎ শঙ্খ-শুভ্র ন্যাশনালিস্ট নয়, কবি; রাজনৈতিক নয়, সাহিত্যিক। দেশকে সে যে ভালবাসে না, তা নয়; খুবই বাসে, তার স্বাধীনতার স্বপ্নও সে দেখে, কিন্তু সে স্বপ্নের সুনির্দ্দিষ্ট কোন রূপ নেই। পত্রান্তরালচারিণী সুর-স্বরূপিনী নাইটিংগেলের প্রতি কীট্‌সের যে মনোভাব, স্বাধীনতার সম্বন্ধে শঙ্খ-শুভ্রেরও অনেকটা সেই মনোভাব যেন। তা অরূপা, অলব্ধা, কল্পলোকবিহারিণী। তা রূপ ধ'রে আছে আদর্শের যে ঊর্দ্ধলোকে, সেখান থেকে তাকে নাবিয়ে আনতে চায় না সে। তার আশা, নিজেই সেখানে সে যাবে একদিন। আকুল আগ্রহে তাকে পেতে চায়, কিন্তু কোন রকম নোংরামির মধ্যে দিয়ে নয়।

"Away! away! for I will fly to thee
Not charioted by Bacchus and his pards
But on the viewless wings of Poesy
Though the dull brain perplexes and retards."

এ স্বপ্ন অনবদ্য, নিষ্কলুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—
আমার সুরগুলি পায় চরণ তোমার,
আমি পাই না তোমারে।"

শঙ্খ-শুভ্র কবি বটে, কিন্তু অদ্যাবধি একটিও কবিতা লেখে নি সে। চমৎকার যে খাতাখানা কিনে এনে রেখেছিল, তার সবগুলো পাতাই সাদা আছে এখনও। কি লিখবে? যে মেয়েটিকে ভাল লেগেছিল, সে আলেয়ার মত স'রে গেল। যে বন্ধুটি প্রাণে সুর তুলেছিল, সে ম'রে গেল হঠাৎ একদিন। তা ছাড়া যা কিছু ধরতে যায় ছুঁতে যায়, হাতে কালি লাগে। সাবান দিয়ে সে কালি ওঠাতেই অবসরটুকু কেটে যায়। হতাশা বেদনা কালি আর সাবানের

কবিতা সে লিখবে না। মনের মধ্যে বিচিত্র বর্ণের পাখা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি উড়ে আসে মাঝে মাঝে, আসে আবার চ'লে যায়। ভাষার ফাঁদ পেতে তাদের ধরতে ইচ্ছে করে না, ভয় হয়, ডানা খ'সে যাবে, রঙ ঝ'রে যাবে, ম'রে যাবে হয়তো···। কোন্ পথে তারা নিজে এসে ধরা দেবে, তারই সন্ধান সে করে স্বপ্নাতুর নয়নে আপন নিভৃত জগতে ব'সে ব'সে। একাগ্রচিত্তে ধ্যান করে, প্রতীক্ষা করে। ভয় হয়, রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপার মত পরশমণি পেয়েও হয়তো সে হারিয়ে ফেলবে অন্যমনস্ক হয়ে। উন্মুখ সমনস্কতা সব সময়ে বজায় থাকে না যে! বাইরের জগতে নিরন্তর কলরব কোলাহল উঠছেই। একটু ফাঁক পেলেই কাব্যকুঞ্জে দুদ্দাড় ক'রে এসে হাজির হয় মত্ত মাতঙ্গ, তাকে সামলাতেই সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে—নিমেষের মধ্যে সব তছনছ ক'রে দিয়ে চ'লে যায়। এই মত্ত মাতঙ্গদের এড়াবার সামর্থ্য নেই তার। এসে পড়লে ভদ্রতা ক'রে চেয়ার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে হয় এবং তাদের শুষ্ক আস্ফালন শুধু দেখতে হয় নয়, দেখে মুগ্ধ হয়েছি—এ ভাবও চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলতে হয়। তা ছাড়া মত্ত মাতঙ্গ সব সময় যে বাইরে থেকে আসে তা নয়, পরিবারের মধ্যেও মত্ত মাতঙ্গের অভাব নেই। রজত একদিন হুড়মুড় ক'রে এসে হাজির হ'ল। বাঁ হাত দিয়ে অ্যাশ-ট্রেটাকে টেবিলের কোণ থেকে সরিয়ে দিলে—খানিকটা ছাই যে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়ল; সেদিকে লক্ষ্যই করলে না—টেবিলের কোণটাতে ব'সে তার শৌখিন মালক্কা বেতের চেয়ারের হাতলে স্যাণ্ডাল-সুদ্ধ পাটা তুলে দিয়ে উদ্ভাসিত চক্ষে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, বুঝলে দাদা, ভোটে জিতেছি। তোমাকেই এবার আমাদের অ্যাথ্‌লেটিক ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হতে হবে।

শঙ্খ-শুভ্র বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানত না। সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। মনে ঈষৎ আতঙ্কেরও সঞ্চার হ'ল। বুক-পকেট থেকে একটা কাগজ বার ক'রে রজত বললে, এই কাগজটায় সই ক'রে দাও—এইখানটায়।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটু অধৈর্য্যভরে রজত-শুভ্র টেবিলের কোণটায় বাগিয়ে বসতেই সে তাড়াতাড়ি নিজের ফাউণ্টেন-পেনটাকে সরিয়ে নিলে টেবিল থেকে।

হরেনবাবু এবার প্রেসিডেণ্টশিপ থেকে রিটায়ার করেছেন, শুনেছ তো?

শঙ্খ কিছুই শোনে নি। চুপ ক'রে রইল।

রজত বলতে লাগল, বিজন জগদীশবাবুকে প্রেসিডেণ্ট করবে ব'লে খাড়া করেছিল। জগদীশবাবুকে! লোকটা চিঁ-চিঁ ক'রে কথা বলে—এক নিশ্বাসে দুটো কথা বলবার ক্ষমতা নেই। আমি তাই বিশুকে দিয়ে তোমার নামটা প্রোপোজ করিয়েছিলাম—ভোটে আমরা জিতেছি।

শঙ্খ মনে মনে উদ্বিগ্ন হ'লেও রজতের মুখের দিকে চেয়ে 'না' বলতে পারলে না। অনেক ক্লাবেই সে নিয়মিত চাঁদা দেয়, রজতের ক্লাবেও দেয়। স্কুলে পড়বার সময় স্বাস্থ্যচর্চ্চাও করেছিল অবশ্য কিছুদিন; কিন্তু তাই ব'লে স্বাস্থ্য-চর্চ্চা-সমিতির পাণ্ডাগিরি করবার কল্পনাও সে করে নি কখনও। কিন্তু রজতকে থামানো শক্ত। তবু একটু ইতস্তত ক'রে বললে, আমি কি তোমাদের প্রেসিডেণ্ট হবার উপযুক্ত? আমাকে কেন—

বাঃ, তুমি হ'লে ভাদুড়ী-মেডেল উইনার। তা ছাড়া ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। তোমার চেয়ে বেশি উপযুক্ত লোক আর কে আছে?

স্কুল-জীবনে সে একবার ভাদুড়ী-মেডেল পেয়েছিল, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্টও হয়েছে।

কিন্তু ওসব তো অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমাকে আর ওসবের মধ্যে টানছ কেন?

কাতর দৃষ্টিতে সে রজতের দিকে চাইলে।

না না, সেসব শুনব না, সই ক'রে দাও।

সই ক'রে দিতে হ'ল। শুধু তাই নয়, 'কাব্যে অভিনবত্ব' নাম দিয়ে সে যে প্রবন্ধটা লিখবে ভেবেছিল, তার মালমসলা সরিয়ে রেখে 'স্বাস্থ্যচর্চ্চা' নামে নূতন একটা প্রবন্ধ ফাঁদতে হ'ল কিছুদিন পরে। শুধু ফাঁদতে হ'ল নয়, মাততেও

হ'ল তা নিয়ে। কোন জিনিস অসম্পূর্ণ ক'রে করা তার স্বভাব নয়। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে বাধ্য হ'লেও সেটা সুন্দর ক'রে করাই তার স্বভাব। তাই প্রবন্ধে শুধু অ্যাকিলিস অ্যাগামেম্‌নন ভীম অর্জ্জুন থেকে শুরু ক'রে আশানন্দ-গামা-গোবরের ফর্দ্দ দিয়েই ক্ষান্ত হ'ল না, দেহের স্বাস্থ্যের সঙ্গে মনের স্বাস্থ্য এবং মনের স্বাস্থ্যের সঙ্গে জাতির স্বাস্থ্যও যে কিরূপ জড়িত, এমন কি সাহিত্যও যে স্বাস্থ্যেরই বিকাশ, তা নানা উদাহরণ-সম্বলিত ক'রে লিখতে হ'ল তাকে। লিখতে লিখতে এমন তন্ময় হয়ে গেল যে, নিজেরই মনে হতে লাগল, স্বাস্থ্যচর্চ্চা করাই সম্ভবত মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। প্রবন্ধ শেষ হয়ে যাবার পর অনুতাপও হ'ল—ছি ছি, বাজে জিনিস লিখে অনেক সময় নষ্ট হ'ল! রজতের ওপর রাগও হ'ল একটু। কিন্তু কারও ওপর রাগ ক'রে থাকা তার স্বভাব নয়, বিশেষত রজতের ওপর। তার যে রূপটা চোখে পড়ে, তা এমন বলিষ্ঠ এমন আবেগময় এমন দৃপ্ত যে, তাকে ভাল না বেসে পারা যায় না। কি সুন্দর ছবি আঁকতে পারে, কিন্তু কিছুতেই ছবি-আঁকায় মন দেবে না। আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজে ব্যাপার নিয়ে। পুলিসের সন্দেহ, ও বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নাকি! হতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয় ওর পক্ষে। সব দোষ সত্ত্বেও কিন্তু এমন একটা কি আছে ওর মধ্যে, যা কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না—সতেজ প্রদীপ্ত প্রাণবান নির্ভীক কি একটা যেন। একটা ছবি শঙ্খ-শুভ্র কখনও ভুলবে না। কিছুদিন আগে একবার রজত হীরক আর সে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছিল এক জায়গা থেকে। পায়ে হেঁটেই ফিরছিল। সে একটু এগিয়ে এসেছিল। হীরক আর রজত পেছনে ছিল। কড়েয়ার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ চার-পাঁচজন গুণ্ডা এসে ঘিরে ধরলে তাকে। আংটি বোতাম ঘড়ি খুলে দিতে বললে। শঙ্খ যে দুর্ব্বল তা নয়, মারামারি করলে হয়তো ও ওদের দু-একজনকে ঘায়েল করতে পারত, কিন্তু মারামারি জিনিসটারই ওপর ওর বরাবর বিতৃষ্ণা, ভাবছিল, কি করা যায়—আংটিটা খুলে দিয়ে দেব না কি—

এমন সময় রজত আর হীরক এসে পড়ল। সেই গুণ্ডার দলে রজতের যে সিংহমূর্ত্তি সে দেখেছিল সেদিন, তা ভোলবার নয়। গুণ্ডাগুলো সহজে রণে ভঙ্গ দেয় নি, রীতিমত লড়েছিল। কিন্তু রজতের কাছে তারা দাঁড়াতে পারে নি। তাদের একজন ছোরাও বার করেছিল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে জুজুৎস্থর এক প্যাঁচে রজত ছোরাটা কেড়ে নিলে তার হাত থেকে এবং যুগপৎ ঘুষি আর লাথি চালিয়ে ঘায়েল ক'রে ফেললে দুটো লোককে। 'বাপ রে' ব'লে শুয়ে পড়ল তারা, বাকিগুলো পালাল উর্দ্ধশ্বাসে। হাতের খানিকটা কেটে গিয়েছিল, নির্ব্বিকারভাবে তাতে রুমালটা বেঁধে একটু ঝুঁকে ভূশায়ী লোক দুটোর দিকে চেয়ে বললে, না, মরে নি ব্যাটারা। চল, এবার যাওয়া যাক; পুলিস মহাপ্রভুরা আসবেন এইবার। যেন কিছুই হয় নি।

রজত যদিও নিজের বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায় সাধারণত, কিন্তু মাঝে মাঝে আঁধির মত আচমকা এসে শঙ্খ-শুভ্রের সাজানো বাগান ওলট-পালট ক'রে দিয়ে চ'লে যায় সে। হীরক বড় একটা ঘেঁষে না। কিন্তু সেও অস্বস্তিজনক। সে তার মার্ক্‌স এবং এংগেল্‌স ডাংগে এবং নরিম্যান, জওহরলাল এবং যোশী নিয়ে নিজের জগতেই থাকে। অত্যন্ত বেশি নীরব হয়ে থাকে ব'লে কেমন যেন ভয় করে তাকে। তার যে বিশেষ কোন একটা মতবাদ আছে, তা জানাই ছিল না কারও। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, সে একটা মিলের কুলীদের ধর্ম্মঘটের নেতা হয়েছে। তাদের মাইনে বাড়িয়ে তবে ছাড়লে। অথচ বাড়িতে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক দূরে থাক্‌, একটি কথাও বলে না। চুপচাপ আসে, চুপচাপ থাকে। বাবা একদিন বকলেন, হাসিমুখে চুপ ক'রে রইল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল শুধু। কিন্তু মনে হ'ল, সে দৃষ্টিতে জ্বালা নেই, ব্যঙ্গ নেই, আছে আত্মপ্রত্যয়। একটু করুণার এবং ক্ষমার আভাসও আছে ব'লে মনে হ'ল। তার ভাবটা যেন—তোমরা কেন যে বুঝতে পারছ না বা বুঝতে চাইছ না তা আমি জানি; কিন্তু এও আমি জানি যে, একদিন তোমাদের বুঝতে হবেই। তখন তোমাদের যে কি দশা হবে,

তাই ভেবে কষ্ট হচ্ছে আমার। যখনই কেউ বকে তাকে, তার চোখে এই দৃষ্টি ফুটে ওঠে। তার হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টির এই অমোঘ অর্থ অনুভব ক'রে শঙ্কিত হয়ে পড়ে শঙ্খ-শুভ্র। তার নিজের জগতে কেমন যেন ছায়া নামতে থাকে, ফুল ঝ'রে যায়, প্রজাপতি উড়ে যায়···মনে হয়, কোদাল কাস্তে হাতুড়ি শাবল নিয়ে পিলপিল ক'রে ঢুকছে যেন চাষাভুষো-কামার-কুমোরের দল·· ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনের ছবিটা মনে পড়ে···মনে পড়ে রাশিয়ার বিদ্রোহ। হীরককে শত্রু ব'লে মনে হয়। তখনই আবার মনে হয়, হীরক—আমাদের হীরু—সে কি শত্রু হতে পারে? কিন্তু সে কি যে হতে পারে আর কি যে হতে পারে না, তা বোঝবার উপায় নেই—সে দূরে দূরে থাকে, কাছে ঘেঁষে না।

ইন্দু-শুভ্রাও পরিবারের মধ্যে আর এক অদ্ভুত প্রাণী, যার চালচলন আচার-ব্যবহার কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন সঙ্গত অর্থ খুঁজে না পেয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে শঙ্খ-শুভ্র। ছোট পিসী যে নিষ্ঠাবতী বিধবা, তার রাজনৈতিক মতামত যে একটু উগ্র রকমের স্বদেশী, এই কথাই জানা ছিল তার। হঠাৎ সেদিন মেছুয়াবাজারে নজরে পড়ল, এক ট্যাক্সিতে এক পুলিস অফিসারের পাশে ইন্দু-শুভ্রা ব'সে আছে! তার চোখ-মুখ দিয়ে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাকে প্রেম-বিহ্বলতা বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু তা ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে! ভূমিকম্প হ'লে মনের যেমন অবস্থা হয়, শঙ্খ-শুভ্ররও ঠিক তেমনই হ'ল। আরও বেশি অস্থির হয়ে পড়ল এ কথা কাউকে বলতে পারলে না ব'লে। মায়ের কাছে প্রায়ই কোন কথা গোপন করে না সে, কিন্তু এ কথাটা বলতে বাধল। ইন্দু-শুভ্রার প্রদীপ্ত মুখখানা মনের মধ্যে প্রেতের মতন ঘুরে বেড়াল কয়েক দিন। রাত্রে ঘুম হ'ল না। একদিন দমদমে চ'লে গেল। গিয়ে দেখলে, ইন্দু-শুভ্রা কোণের ঘরটাতে ব'সে নিবিষ্ট চিত্তে কানাইলালের জীবনী পড়ছে। পরনে সাদা থান, মাথার চুল রুক্ষ। মেছুয়াবাজারের ছবির সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নেই। সে ঘরের ভেতর ঢুকল, বেরিয়ে এল, ইন্দু মুখ তুলে চাইলে না পর্য্যন্ত। একেবারে অন্য লোক যেন। দুটো ছবিই এত সত্য ব'লে মনে হ'ল তার কাছে যে

কোনটাকেই অস্বীকার করতে পারলে না সে। ফলে অস্বস্তি বাড়ল। দুটো ছবিকে মেলাতে পারলে না ব'লে অস্বস্তি। তার শুচি-বাই নেই। কুন্দ-শুভ্রার সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধাই আছে। বাড়ির লোক কেউ যদিও কুন্দ-শুভ্রার নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত করে না, কিন্তু তারাপদর কাছে কুন্দ-শুভ্রার গল্প শুনেছে সে একদিন লুকিয়ে। এক মুসলমান ওস্তাদের প্রেমে প'ড়ে তার সঙ্গে চ'লে গেছেন তিনি। শঙ্খ-শুভ্র মাঝে মাঝে ভাবে, এর জন্যে বাড়িসুদ্ধ সকলের এত লজ্জা কেন? প্রেমের জন্যে লজ্জা? তা হ'লে রাধাকৃষ্ণের ছবি ঘরে ঘরে টাঙিয়ে রাখার অর্থ কি? মুসলমান ব'লে লজ্জা? তা হ'লে সভায় সভায় কাগজে কাগজে হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্যে এ আগ্রহ কেন? চ'লে গেছে ব'লে লজ্জা? সমাজে সম্মানের আসন না দিলে চ'লে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? শঙ্খ-শুভ্র নিজের অন্তরে কিন্তু কুন্দ-শুভ্রাকে যে আসনে বসিয়ে রেখেছে, তা শ্রদ্ধার আসন। না, এসবের জন্যে নয়, ইন্দু-চরিত্রের রহস্য উদ্ভেদ করতে না পেরে মনে মনে উৎসুক হয়ে আছে সে, অস্বস্তি ভোগ করছে। তা ছাড়া এই জাতীয় কোন ঔৎসুক্য তাকে অন্যমনস্ক ক'রে দিলে সে ভীতও হয়ে পড়ে। ভয় হয়, পরশমণিটা কখন হাতে এসে হয়তো চ'লে যাবে, কিংবা গেছে।...বহির্জগতের রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়াও এই ধরনের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা কুশাঙ্কুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কণ্টকিত ক'রে তোলে তার নিভৃত জগতের নির্জ্জন পায়ে-চলার-পথটিকে—যে পথটি মাঠের মাঝ দিয়ে, ঝাউবনের পাশ দিয়ে, নদীর আঁকে-বাঁকে চ'লে গেছে রূপকথা-লোকে। কিছুতেই এড়াতে পারে না সে এই কুশাঙ্কুরদের। রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত পা নিয়ে হা-হুতাশ করতেও লজ্জা করে তার। নীরবে সহ্য করে সমস্ত। রাজনৈতিক মতামতকে আর সে তত ভয় করে না। ওদের এড়াবার মস্ত বড় একটা উপায় আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে সে। তর্ক করে না, সায় দিয়ে যায় স্মিত মুখে। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কাছে সে গান্ধী-ভক্ত, রজতের কাছে সে সুভাষ-পন্থী, হীরকের কাছে কমিউনিস্ট। হীরক অবশ্য কাছে আসে না বড় একটা। কিন্তু হীরক-জাতীয় আরও অনেকে আসে।

রাজনীতির ধ্বজা নিয়ে কেউ এলে নিজের মনটাকে সাময়িকভাবে জলবৎ ক'রে ফেললেই গোল থাকে না আর। যখন যে পাত্রে ঢুকতে হয়, তখনই তার আকার ধারণ করলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় সহজে। চেষ্টা ক'রে মনকে যে জলের মত করতে হয় তাও নয়, জলের মতই স্বচ্ছ সাবলীল মন তার। পাত্র না থাকলে তা ঝিরঝির ক'রে ঝ'রে পড়ে নিজের নির্জ্জনলোকের পাহাড়ী ঝরনায়, ব'য়ে যায় শুভ্র সিকতার উদার আবেষ্টনীর মাঝ দিয়ে অজানা সাগরের উদ্দেশ্যে।

তাতেও উপলখণ্ড প'ড়ে বাধা সৃষ্টি করে মাঝে মাঝে। যে দুটি উপল পর পর এসে হাজির হ'ল একদিন অনিবার্য্যভাবে, সে দুটি যেমন অনড় তেমনই দুরতিক্রম্য। তার সাধ ছিল, সারাজীবন সাহিত্যসাধনা নিয়েই থাকবে। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা ক'রেই কাটাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জোরে ভাল একটা অধ্যাপকের চাকরিও জুটেছিল, কিন্তু শশাঙ্ক-শুভ্র বাধা দিলেন।

বললেন, চাকরি করতে হবে না, 'বিজ্‌নেসে' ঢোক। চাকরির মোহ ত্যাগ না করলে বাঙালীর ভদ্রস্থ ইনে।

শঙ্খ-শুভ্র চুপ ক'রে রইল। শশাঙ্ক-শুভ্র তার মুখের দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে পাইপটা ধরিয়ে বললেন, এদিকে তো স্বাধীনতার লম্বা লম্বা 'লেকচার' দিয়ে বেড়াও তোমরা, কিন্তু চাকরি করবার কোন সুযোগই তো ছাড়তে চাও না দেখি।

শঙ্খ-শুভ্র কোন দিনই স্বাধীনতা নিয়ে 'লেকচার' দিয়ে বেড়ায় নি, কিন্তু নির্ব্বাক হয়ে রইল সে। বাদ-প্রতিবাদ করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। চাকরি করলেই যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তথাকথিত স্বাধীন ব্যবসায়ীরাই যে সত্যিকারের দাসখৎ-লেখা গোলাম—এ কথা তার মনে এল, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুল না। বাবা শেষ পর্য্যন্ত কি বলেন, তাই শোনবার জন্যে সভয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল সে।

শশাঙ্ক-শুভ্র বললেন, রজত ছবি আর গুণ্ডামি নিয়ে মেতেছে, হীরক

লেনিন-ট্রট্স্কি-স্টালিনের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করছে। আমার আশা ছিল, বুড়ো বয়সে তোমার হাতে 'বিজ্‌নেসে'র ভারটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারব, কিন্তু তুমি যদি চাকরি করবে ঠিক ক'রে থাক, তা হ'লে আমাকেই শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত ঘানি টানতে হবে। উপায় কি! কেবল দেখবার লোকের অভাবে আমলকীগুলোতে ছাতা ধ'রে গেল। আমি একা আর কত দিক দেখি!

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, চাকরিতে মাইনে কত?

দুশো।

বেশ, আমিই তোমাকে মাসে দুশো টাকা দেব, আমারই কাজ কর তুমি। শাকৃচিতে একটা 'নিগোশিয়েট' করতে হবে, কালই চ'লে যাও।

শশাঙ্ক-শুভ্রের গাম্ভীর্য্য ভেদ ক'রে একটা চাপা হাসি ফুটে বেরুবার চেষ্টা করছিল। বাছাধন এইবার কি করেন দেখা যাক! শঙ্খ একটি কথারও প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু শশাঙ্ক-শুভ্র প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করছিলেন, শঙ্খ প্রতিবাদ করবে ঠিক। রজত-হীরককে যেমন জোয়ালে জোতা গেল না, একেও যাবে না। চাকরি করবার ছুতোয় এও ঠিক ফসকে পালাবার চেষ্টা করছে। আসল উদ্দেশ্য—কাব্য ক'রে বেড়ানো। কিন্তু টাকা না হ'লে যে আজকালকার জগতে কিছু হবার উপায় নেই এবং 'বিজ্‌নেস'ই যে সে টাকার মূল—এ কথা কিছুতে বুঝবে না আজকালকার ছোকরারা। শঙ্খ কোন প্রতি-বাদই করলে না। মাসিক দুশো টাকা বেতন নয়, সাহিত্যই যে তার চাকরি নেবার প্রেরণা—এ কথা সে তার অতিশয়-বস্তুতান্ত্রিক পিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলে যে বিফলকাম হ'ত, তা নয়। শশাঙ্ক-শুভ্র প্রতিবাদ প্রত্যাশাই করছিলেন মনে মনে। কিন্তু তাঁর একটা কথা শঙ্খ-শুভ্রের সমস্ত যুক্তিকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছিল—'আমাকেই শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত ঘানি টানতে হবে। উপায় কি!' সে চুপ ক'রে রইল।

শশাঙ্ক-শুভ্র আর একবার আড়চোখে তার দিকে চেয়ে আর একবার পাইপ ধরালেন। তা হ'লে কি ঠিক হ'ল, শাকৃচি যাচ্ছ তো কাল?

বেশ।

শশাঙ্ক-শুভ্র পুত্রের এই সুমতিতে বাইরে খুব উল্লসিত হয়ে উঠলেন অবশ্য, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলেন একটু। সে রুখে দাঁড়ালে তিনি যেন খুশি হতেন। শঙ্খ চ'লে যাবার পর পাইপটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে তিনি ভাবলেন, ছেলেটা কেমন যেন গোবরগণেশ-গোছের। 'বিজ্‌নেস' ও ঠিক পারবে কি?

দ্বিতীয় উপল এল বাসন্তী—বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

একটি মাত্র মেয়েকে একবার ভাল লেগেছিল তার, তাও দূর থেকে। অবিরাম সান্নিধ্যের সংঘর্ষে সে ভাল-লাগা বিবর্ণ হয়ে যায় নি। তাই ভাল-লাগা ব্যাপারটা ঘিরে মনে মোহ ছিল। তার ধারণা ছিল, চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, আলোর কাছে যেমন ছুটে আসে বিচিত্র-পক্ষ পতঙ্গ অজানা অন্ধকার থেকে, তার মনের টানে তেমনই আবির্ভূত হবে তার জীবনসঙ্গিনী অকস্মাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে। কোথায় কখন তা ঠিক নেই, এবং ঠিক নেই ব'লেই স্বপ্নটা আরও মধুর, প্রত্যাশাটা আরও মদির। দোকানে গিয়ে বাছাই ক'রে জুতো-জামা কেনার মত কুমারীদের হাটে গিয়ে সে পাত্রী-নির্ব্বাচন করবে না কখনও, করতে দেবেও না কাউকে। মানসী মূর্ত্ত হবে নিজেই একদিন সহসা। সে আহরণ করবে না, অভ্যর্থনা করবে। বাসন্তীর প্রস্তাব শুনে স্বপ্নচারীর হঠাৎ জাগরণ হ'ল যেন রূঢ় বাস্তব-লোকে। সব ঠিক হয়ে গেছে! হয়তো সে প্রত্যাখ্যান করত—এই একটি বিষয়ে অন্তত নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখবার চেষ্টা হয়তো করত সে; কিন্তু ছোট দাদু এতে জড়িত আছেন শুনে তার উদ্যত রসনা সংযত হয়ে গেল। ছোট দাদুর সম্বন্ধে শঙ্খর যে দুর্ব্বলতা আছে, তা অজ্ঞাত ছিল না বাসন্তীর। কতদিন কত আলোচনা হয়েছে এ নিয়ে তার সঙ্গে। সোম-শুভ্রের চিঠিখানা বাসন্তী হাতে ক'রেই এনেছিল। পাত্রীর মাতামহের সঙ্গে সোম-শুভ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই তিনি সোম-শুভ্রকে প্রথমে একখানা চিঠি লিখেছিলেন, যদি তিনি বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারেন এই আশায়।

উত্তরে সোম-শুভ্র যা লিখেছিলেন, তা মোটেই আশ্বাসজনক নয়। পাত্রী-পক্ষ ভিন্ন পথে গিয়ে হংস-শুভ্র, শশাঙ্ক এবং বাসন্তীকে ধ'রে সফলকাম হন। কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়ে যাবার পর সোম-শুভ্রের চিঠিখানা তাঁরা দেখিয়েছিলেন শশাঙ্ক এবং বাসন্তীকে। বাকি ছিল শঙ্খর মত নেওয়া। বাসন্তী সোম-শুভ্রের চিঠিখানা অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করলে।

সোম-শুভ্র লিখেছিলেন—

সুহৃদ্বরেষু, আপনার দৌহিত্রী শ্রীমতী তনিমার সহিত শঙ্খ-শুভ্রের বিবাহ হইলে আমি অতিশয় সুখী হইব। কিন্তু আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে করা কঠিন—প্রায় অসম্ভব। যাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহাকে কোন বিষয়ে অনুরোধ করা তত কঠিন নয়, কারণ সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইলে অপমানের বেদনাটা তেমন নিদারুণভাবে বাজে না, যেমন বাজে প্রত্যাখ্যানটা নিকটতম প্রিয়জনের নিকট হইতে আসিলে। শশাঙ্ককে আমি কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি, কিন্তু বিধির বিধানে তাহার পুত্র শঙ্খর সহিত আমার পরিচয় পর্য্যন্ত নাই। দেখা হইলে পরস্পর পরস্পরকে চিনিতেই পারিব না। কিন্তু তাই বলিয়া সে আমার কম প্রিয় নয়। বরং তাহাকে কাছে পাই নাই বলিয়া সে প্রিয়তর। তাহার অনেক গুণের কথা নানা লোকের মুখে শুনিয়াছি। জীবনে হয়তো কখনও তাহাকে কাছে পাইব না ভাবিয়া মাঝে মাঝে সত্যই আমার ক্ষোভ হয়। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। তনিমা যে সর্ব্ববিষয়ে তাহার উপযুক্তা পাত্রী, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিবাহ হইলে আমি খুবই সুখী হইব। কিন্তু এ বিষয়ে তাহাকে অথবা তাহার অভিভাবকদের আমি কোন অনুরোধ করিতে পারিব না। সে অধিকার স্বেচ্ছায় আমি একদিন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। পরিত্যক্ত বেদখল ভূমিতে পদার্পণ করিবার লোভ থাকিলেও সাহস আমার নাই। এ বিবাহ হউক, সর্ব্বান্তঃকরণে আমি ইহা ইচ্ছা করি। আমার এ ইচ্ছার মর্য্যাদা তাহারা দিবে কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে

জানি না বলিয়াই এ বিষয়ে তাহাদের কোন অনুরোধ করিতে পারিলাম না। আমার অবস্থা বুঝিয়া আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার লউন। কল্যাণীয়দের আশীর্ব্বাদ দিবেন। ইতি

ভবদীয়—

শ্রীসোম-শুভ্র মুখোপাধ্যায়

চিঠি প'ড়ে তার মনের যে অবস্থা হ'ল, তা অবর্ণনীয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাটা সহসা যেন বহুগুণ বেড়ে গেল। ইতিপূর্ব্বে ছোট দাদুর আর একখানি চিঠিও সে দেখেছিল তার এক ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়িতে। ধর্ম্ম ও কুসংস্কার সম্বন্ধে তাতে তিনি সুন্দর একটি উপমা দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, পুঁজের সমস্ত উপকরণ যেমন রক্তের মধ্যে আছে, কুসংস্কারের সমস্ত উপাদানও তেমনই ধর্ম্মের মধ্যেই আছে। একটা মৃত এবং আর একটা জীবন্ত, তফাত শুধু এইটুক।...কেবল এই উপমাটির জন্যেই ছোট দাদুকে সে মাথায় ক'রে রেখেছে মনে মনে। বড় দাদু যে ছোট দাদুর প্রতি অবিচার করেছেন—এ কথাও বারম্বার মনে হয়েছে তার। অনেক বার ইচ্ছে হয়েছে ছোট দাদুর সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রে আসবার। বড় দাদুর কথা ভেবে পারে নি। বড় দাদুর রাগটাকেও না হয় অগ্রাহ্য করা যায়, কিন্তু সত্যি সত্যি দুঃখ পান যদি! বড় দাদুর দোষ অনেক আছে, কিন্তু তাঁর মনে দুঃখ দেওয়ার কল্পনাও সে করতে পারে না। তাঁর কত অসঙ্গত আবদার যে রক্ষা করেছে সে! বি. এ.তে ইকনমিক্স নিলে আরও ঢের বেশি ভাল করতে পারত, কিন্তু তাঁর অনুরোধে সংস্কৃত নিতে হ'ল। হিঙ্গুল গ্রামে জগদ্ধাত্রী-পূজো উপলক্ষ্যে কলেজের দলবল নিয়ে গিয়ে অভিনয় করতে হ'ল 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। সেই পাড়াগাঁয়ে সংস্কৃত কে বুঝবে! অবুঝ বড় দাদু কিন্তু ছাড়লেন না। ছোট দাদু কখনও কোন অনুরোধ করেন নি, করবার সুযোগই পান নি। নির্ব্বাসিত ছোট দাদুর অদেখা মুখটা ভাববার চেষ্টা করলে

সে। মনে হ'ল, সে যেন দেখতে পাচ্ছে, আত্মসম্মানী ছোট দাদু অপ্রতিভ অপ্রস্তুত মুখে কি যেন একটা বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না।...

অনুক্ত অনুরোধটা মূর্ত্ত হয়ে উঠল যেন চোখের সামনে।

গ

তনিমা এঁদো গলি নয়, বরং ঠিক উলটো। সে যেন মোগল-হারেমের অতি সুসজ্জিত বিশ্রাম-কক্ষ—অপরূপ, কিন্তু রহস্যময়। প্রবেশপত্র নিয়ে প্রবেশ করলেও মনে হয়, অনধিকার-প্রবেশ করেছি। গা ছমছম করে। সম্মানিত অতিথির আসনে ব'সেও এ সম্ভাবনা মন থেকে তিরোহিত হয় না যে, যে কোনও মুহূর্ত্তে একটু বেচাল হ'লেই চক্ষের ইঙ্গিতে পরদার অন্তরাল থেকে ছোরা-হাতে হাবসী খোজা বেরিয়ে আসতে পারে। রূপসী বিদুষী মিষ্টভাষিণী ধনীর দুলালী তনিমাকে স্পর্শ করা যায়, কিন্তু ধরা যায় না; তার সঙ্গে আলাপ করা যায়, কিন্তু অন্তরঙ্গতা জন্মে না। ভাবে ভঙ্গীতে, ভ্রূর ঈষৎ কুঞ্চনে, আঁখি-পল্লবের সামান্য কম্পনে তার যে সত্তা আত্মপ্রকাশ করে, তা অবজ্ঞা করাও যেমন কঠিন, তার অস্পষ্টতায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করাও তেমনই শক্ত। তার ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু সে ব্যক্তিত্বের আসল স্বরূপটি যে ঠিক কি, তা সে নিজে পুরোপুরি কখনও ব্যক্ত করে না—হয়তো নিজেই জানে না; বস্তুত, এ সম্বন্ধে তার সঙ্কোচই আছে যেন, আভাসে ইঙ্গিতে তা প্রকট হয়ে পড়লে যেন লজ্জিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সে ব্যক্তিত্বের মর্ম্মোদ্ঘাটন না করতে পারলে তো কিছুই করা যাবে না—পারলেও কিছু করা যাবে কি না, এ ভয়ও শঙ্কর হয় মাঝে মাঝে।...রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতাটা একদিন আবেগভরে তাকে প'ড়ে শোনাচ্ছিল, হঠাৎ লক্ষ্য করলে, তার চোখের দৃষ্টিতে নাসিকার আকুঞ্চনে যে ভাব প্রকাশিত হয়েছে, তাকে কিছুতেই ভাল-লাগা বলা চলে না—নিতান্ত নিরূপায় হয়ে ওষুধ গিলছে যেন! কবিতাটি প'ড়ে শেষ করতে হ'ল, কিন্তু কণ্ঠস্বরের

আবেগটা শেষ পর্য্যন্ত রইল না। পড়তে পড়তেই সে ভাবতে লাগল, রবীন্দ্রনাথের এমন কবিতা ওর ভাল লাগছে না! কেন? অত্যন্ত বেশি যৌন ব'লে? বিবস্ত্রা রমণীটির পদপ্রান্তে নিরস্ত্র মদন যে পরাজয় স্বীকার করলে, তা রমণীটির মানসিক কোন উৎকর্ষে মোহিত হয়ে নয়, তা তার "ললাটে অধরে উরু 'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়" মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের ঝলক দেখে—এতেই ওর রাগ হ'ল নাকি! আজকালকার আল্‌ট্রা মডার্ন মেয়েদের মত এও নিজের দেহটাকে উপেক্ষা ক'রে মন-সর্ব্বস্ব হয়ে উঠেছে বোধ হয়। কবিতা শেষ ক'রে কিন্তু তার দিকে যখন চেয়ে দেখলে, তখন সে চোখ নীচু ক'রে মুচকি মুচকি হাসছে। শঙ্খর মনে হ'ল, এটা বোধ হয় ও ভণ্ডামি করছে তার খাতিরে। ওর আসল রূপ পরিস্ফুট হয়েছিল ওর অজ্ঞাতসারে একটু আগে। তার গালে ছোট্ট একটি টোকা মেরে অন্তরঙ্গতার অভিনয় ক'রে সে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু সহধর্ম্মিণীর স্বধর্ম্মের কোন পরিচয় না পেয়ে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে রইল সে। তাকে খোশামোদ ক'রে বশ করা অথবা জোর ক'রে দখল করা এ দুয়ের কোনটাই শঙ্খ শুভ্রের মনঃপূত নয়। সে চাইছিল মুগ্ধ হতে এবং মুগ্ধ করতে কোন কিছু আস্ফালন না ক'রে। কিন্তু কি করলে যে তা হবে, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না সে।...মোগল-হারেমের সুসজ্জিত কক্ষে একা ব'সে সে অধীর চিত্তে অপেক্ষা করছিল পরদা সরিয়ে শাহ্‌জাদী কখন আসবেন...তনিমার অপরূপ দেহ-দেহলীতে কখন এসে দাঁড়াবে তনিমার সেই প্রকৃতি, যার আসার অপেক্ষা ক'রে আছে তার সংযত পৌরুষ অবিচল নিষ্ঠাভরে। কিন্তু কিছুতেই সে আসছে না। পরদার ওপার থেকে কখনও নূপুর-শিঞ্জনে, কখনও পাদুকার শব্দে, কখনও কলহাস্যে, কখনও হঠাৎ-চীৎকারে, কখনও সোহাগ-বচনে, কখনও ভর্ৎসনার সুরে, কখনও সরবতায়, কখনও নীরবতায় যে মূর্ত্তি আভাসিত হচ্ছে, তা এত পরস্পর-বিরোধী যে, কোন একটা বিশেষ ছবিতে সেগুলোকে শঙ্খ-শুভ্র খাপ খাওয়াতে পারছে না। একটা ছবি যেই গ'ড়ে তোলে, অমনই আর একটা ছবি এসে অবলুপ্ত ক'রে দেয় সেটাকে। 'বিজয়িনী'

পড়ার পরদিনই সে শুনতে পেলে, পাশের ঘরে শুক্তি-মুক্তার কাছে সে খুব আবেগভরে 'গীতিগোবিন্দ' পড়ছে—'অহহ কলয়ামি বলয়াদি মণিভূষণম্।' আগের দিনের ধারণাটা ঘুচে গেল। 'গীতগোবিন্দ' যার ভাল লাগে, 'বিজয়িনী' তার খারাপ লাগবার কথা নয়। আর একদিন দেখলে, কীট্‌সের 'ওড টু সাইকি' পড়ছে মন দিয়ে, তার পরদিন 'ওমর খৈয়াম'। তার পরদিন আবার অন্য রকম—একেবারে 'হেল্‌প্‌স এসেজ'। ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানও পাওয়া গেল একদিন বালিশের তলা থেকে। হীরকের সঙ্গে কমিউনিজ্‌ম নিয়ে একদিন খুব তর্ক করলে, মনে হ'ল, ওসবের প্রতি তার কোন শ্রদ্ধাই নেই বুঝি। হঠাৎ একদিন উপবাস করলে। কেন—জিজ্ঞেস করাতে বললে, খেতে ইচ্ছে করছে না। সন্ধ্যেবেলায় দেখা গেল, জওহরলাল নেহেরুর ছবিতে একটা মালা ঝুলছে। তখন শঙ্খর মনে হ'ল, আজ জওহরলালকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু উপবাসের কারণ যে জওহরলাল, কিংবা ফুলের মালা যে তনিমাই ঝুলিয়েছে, তা কিছুতেই সে স্বীকার করলে না। জিজ্ঞেস করাতে মুচকি হেসে বললে, আমার ব'য়ে গেছে জওহরলালকে নিয়ে মাথা ঘামাতে!···কিছুতেই যেন ধরা-ছোঁয়া যায় না তাকে। এমন কি সে গম্ভীরপ্রকৃতির, না লঘুপ্রকৃতির, শান্ত, না চঞ্চল, তাও ঠিক ক'রে বোঝবার উপায় নেই। শুক্তি-মুক্তা যখন আসে (এবং প্রায়ই আসে তারা, তনিমা তাদেরই কলেজের নাম-করা মেয়ে), তখন তাদের সঙ্গে নিজের তেতলার ঘরে হাসি-গান-হুল্লোড়ে মেতে থাকে যে ব্যাক্তি, শঙ্খর কাছে তার আর এক রূপ—টিপটপ কেতাদুরস্ত। আবার শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে, এমন কি ছোট পিসীর কাছেও, একেবারে নিরীহতার প্রতিমূর্ত্তি সে যেন। অথচ যে রকম ছেলেমানুষির সঙ্গে এ ধরনের দুষ্টুমি ঠিক মানায়, ততটা ছেলেমানুষ যে সে নয়, তার প্রমাণেরও অভাব নেই। রজত-হীরকের সম্পর্কে পুলিস যখন বাড়ি খানাতল্লাসি করতে এল, তখন একমাত্র তনিমাই বাড়ির মধ্যে মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিল। পারিবারিক মর্য্যাদা বজায় রেখে পুলিস-অফিসারের

সঙ্গে যে ভাবে সে কথা কইলে, তাতে শুধু শঙ্খ নয়, সবাই অবাক হয়ে গেল। মা এই নিয়েই কিছুদিন পরিচিত-মহলে সাড়ম্বরে গল্প করবার সুযোগ পেলেন। তারপর রজত যখন অপ্রত্যাশিতভাবে কাজলকে বিয়ে ক'রে বসল, তখন তনিমা সব দিক বাঁচিয়ে যে ভাবে তাকে ভদ্র রূপ দিলে, তা কোন ছেলেমানুষের পক্ষে সম্ভব হ'ত না। না, তনিমাকে ছেলেমানুষ বলা যায় না। আড়াল থেকে শঙ্খ লক্ষ্য করেছে, সে যখন আপন মনে গুন-গুন ক'রে গান গাইতে গাইতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়, কিংবা যখন একলা ব'সে সেলাই করে বা পড়ে, তখন তার মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে তা তরলমতি কিশোরীর নয়, রহস্যময়ী যুবতীর। কিন্তু সে রহস্যলোকে প্রবেশের পথ শঙ্খ খুঁজে পাচ্ছে না কিছুতেই। সে ওর প্রেমে পড়তে চায়, কিন্তু কিছুতেই তা হয়ে উঠছে না—ক্রমাগত ভদ্রতা ক'রে অভিনয় ক'রে যেতে হচ্ছে খালি।

বাবার 'বিজ্‌নেসে' ঢুকেও তার ঠিক এই একই দশা। সে ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করছে নিজেকে উপযোগী ক'রে তোলবার, চেষ্টার কোন ত্রুটি তার নেই, কিন্তু কিছুতেই যেন পেরে উঠছে না। শশাঙ্ক-শুভ্র মাঝে মাঝে বাহবা দিয়ে উঠলেও তার নিজের বিবেকের কাছে সে একবারও বাহবা পাচ্ছে না। দোষ যে সব সময়ে তার নিজের তাও নয়, সে কিন্তু দোষী করছে নিজেকেই। অসৎ কর্ম্মচারীকে বিশ্বাস ক'রে প্রথমবার ঠ'কে সৎকর্ম্মচারীকে অবিশ্বাস ক'রে ঠকতে হচ্ছে দ্বিতীয় বার। তৃতীয় বার ঠকছে নিজেই সব করতে গিয়ে সব দিক সামলাতে না পেরে। বহু চোরের মাঝখানে একজন সাধুর, বহু ইতরের মাঝখানে একজন ভদ্রলোকের, বহু মূর্খের মাঝখানে একজন পণ্ডিতের যে দুর্দ্দশা, 'বিজ্‌নেস'-জগতে ঢুকে শঙ্খ-শুভ্রেরও ঠিক সেই দুর্দ্দশা হয়েছে। সে কিন্তু হার মানবে না। সেই ছেলেবেলায় কাশীতে সে যেমন ভেঙে পড়ে নি, নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, সারা জীবন ধ'রে নানা বিরুদ্ধ অবস্থাতেও সে যেমন পরাজয় স্বীকার করে নি, এখানেও করবে

না। ব্যবসাতে যখন নামতে হয়েছে, নিখুঁতভাবেই করবে সেটা। ভেঙে পড়লে চলবে না। তাই সে কাব্যগ্রন্থের ওপর ব্লু-বুক রেখে রেডিওতে গানের বদলে 'কমার্শ্যাল নিউজ' শুনে, পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় বাড়ির নির্জ্জন ছাদের পরিবর্ত্তে সারা হ্যারিসন রোড ক্লাইভ স্ট্রীটে ঘোরাঘুরি ক'রে, নানা জাতের দালাল-ফড়ে-গোলাদার-আড়তদারদের ন্যক্কারজনক সান্নিধ্যে এসে প্রাণপণে চেষ্টা করছে বাণিজ্য-রসে নিমগ্ন হতে। কিন্তু নিমগ্ন হবার মত সাগর সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। সর্ব্বত্রই হাঁটু-জল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্যাচপেচে কাদা। কিন্তু তবু সে সাহেবী স্যুট পরে, পোর্টফোলিও বগলে ক'রে এই কর্দ্দমাক্ত পথেই ছপাং ছপাং ক'রে হেঁটে চলেছে সেই সাগরের উদ্দেশ্যে, জনশ্রুতি—যার তলায় লক্ষ্মী থাকেন।...হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে কিন্তু এখনও সে নিজেকে আবিষ্কার করে নিজের সেই নির্জ্জন জগতে, যেখানে কালো-ধবল পালক-মেঘ সূর্য্যালোক-স্পর্শে মহিমময় হয়ে উঠেছে নির্ম্মল নীল আকাশের বুকে, যেখানে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে সমস্ত প্রকৃতি, এমন কি মধ্যগগনের জ্বলন্ত সূর্য্য পর্য্যন্ত, তন্ময় হয়ে শুনছে কপোতকণ্ঠের মৃদু করুণ কাকলী-ধ্বনি।...হঠাৎ আবার আত্মস্থ হয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে।

৫

তনিমাকে সে পেয়েও পায় নি, 'বিজ্‌নেস'-জগতে ঢুকেও সে ঢুকতে পারে নি। তবু একদিন জানা গেল, তনিমা সন্তান-সম্ভবা এবং তার বিজ্‌নেসে লাভ হয়েছে। সবাই উল্লসিত হ'ল, সে কিন্তু অপ্রস্তুত মুখে চুপ ক'রে রইল। ...এই সময় শোনা গেল, রজত-শুভ্রের একখানা ছবি বন্ধুমহলে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। মানুষের ছবি নয়, কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও ছবি নয়, একটা ছোরার ছবি। প্রকাণ্ড একখানা ছোরা বিরাট একটা হৃৎপিণ্ডকে যেন বিদীর্ণ করেছে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। শঙ্খর মনে হ'ল, রজত কি নিজের মনের মত পথ খুঁজে পেয়েছে? কে জানে! অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি।

ছয়

রজত-শুভ্র

ক

রজতও নিজের মনের মত পথ খুঁজে পায় নি। তার স্বভাবের মধ্যে বিধাতা যে দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির সমাবেশ করেছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই সে দুই শক্তির বিপরীত আকর্ষণে সে কেবল বিপর্য্যস্তই হয়েছে, এক পাও অগ্রসর হতে পারে নি। ছেলেবেলা থেকেই সে শিল্পী, ছেলেবেলা থেকেই সে গোঁয়ার। সৃষ্টির স্বপ্নে তন্ময় হয়ে যাবার ক্ষমতা তার যেমন ছিল, ধ্বংসের তাণ্ডবে মেতে ওঠবার ক্ষমতা তার চেয়ে কিছু কম ছিল না। প্রবল এই দুই শক্তির দুর্নিবার তাড়নায় সে কখনও সৃষ্টি করত, কখনও ধ্বংস করত। স্কুলে যখন পড়ে, তখন একবার তাল তাল মাটি নিয়ে ভারা বেঁধে দিনরাত খেটে বিরাট এক মহাবীরমূর্ত্তি খাড়া করেছিল সে বাড়ির উঠানে। মূর্ত্তি শেষ হয়ে গেলে সবাই প্রশংসা করতে লাগল। রজত নিজে কিন্তু একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে দেখলে, তারপর বললে, না, কিছু হয় নি। ব'লেই ক্ষান্ত হ'ল না, তার পরদিন লাঠি দিয়ে ঠেঙিয়ে সে মূর্ত্তিকে চুরমার ক'রে ফেললে। কারও মানা শুনলে না। সে যে কত ছবি এঁকেছে আর ছিঁড়েছে, কত পুতুল গড়েছে আর ভেঙেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আর ধ্বংসকর্ত্তা মহেশ্বর যেন পাশাপাশি বাসা বেঁধেছেন তার মনের মধ্যে, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুকে বয়কট ক'রে। ভয়ানক খুঁতখুঁতে মন, কিছুতেই কোন জিনিস পছন্দ হয় না। তা ছাড়া আত্মসম্মানজ্ঞান অতিশয় প্রবল। কোন কিছু খারাপ, তা ছবি বা পুতুল যাই হোক, তার নামে চলবে—এ সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব। কল্পনায় যা ফুটছে, বাস্তবে ঠিক যতক্ষণ সেটা না ফোটাতে পারছে, ততক্ষণ তৃপ্তি নেই, ক্রমাগত ছিঁড়বে আর ভাঙবে সে। গোঁয়ার ব'লে কারও সঙ্গে মিলত না তার।

ক্লাসের অধিকাংশ ছেলের সঙ্গে ভাব ছিল না, বাড়িরও অধিকাংশ লোকের সঙ্গে না। বিরক্তি চেপে রেখে কারও সঙ্গে ভদ্রতা করতে পারত না সে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যে হয় গাড়োল, না হয় চোর, না হয় চাকর, না হয় পাজি, তার এই বদ্ধমূল ধারণাকে বাঙ্ময় করতে কোন সঙ্কোচ হ'ত না তার। কাউকে গ্রাহ্যই করত না, স্কুলের মাস্টারের সঙ্গে মারামারি ক'রে বসল একদিন। বাড়ির মধ্যে একটি লোককে সে সম্ভ্রম করত, ইন্দু-পিসীকে। ইন্দু-পিসীর প্রদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে, পরিমিত কথাবার্ত্তায় এমন একটা আত্মসম্মানের আভা ফুটে বেরুত যে, রজত মুগ্ধ হয়ে যেত মনে মনে। আর ভালবাসত দুটি লোককে—দাদাকে আর দাদুকে, তাদের নানা দোষ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও। বাবা-মাকে ভয় করত এবং তাদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত যথাসাধ্য। শঙ্খ-শুভ্রের ভালমানুষি দুচক্ষে দেখতে পারত না, কিন্তু চমৎকৃত হয়ে যেত তার অনাড়ম্বর বীরত্ব দেখে। চুপচাপ থাকে, কিন্তু ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট হয়। কোন উচ্চবাচ্য না ক'রে নীরবে কাশী চ'লে গিয়ে মাথা কামিয়া টিকি রেখে টোলে ভরতি হয়ে যেতে পারে, কেবল দাদুর মান রাখবার জন্যে! স্পোর্টসে নামতে চায় না, কিন্তু নামলেই ফার্স্ট। অথচ মুখে কথাটি নেই, সর্ব্বদাই যেন সঙ্কুচিত হয়ে আছে। দিনরাত বই নিয়ে লাইব্রেরিতে ব'সে থাকত যে ব্যক্তি, সে বাবার কথায় সাবানের কারখানায় আর পাটের গুদোমে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং নাম করছে সেখানেও। মনে মনে তারিফ করত সে দাদাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে করত, বেশ ক'রে ঝাঁকানি দিয়ে বুঝিয়ে বলে, এ কি করছ তুমি? কেন করছ? একবার পরের মন যুগিয়ে চলতে শুরু করলে কি অন্ত পাবে তার? ইচ্ছে করত, কিন্তু বলতে পারত না। শঙ্খ-শুভ্রের চোখে-মুখে অনির্ব্বচনীয় কি যে একটা আছে, যার বিরুদ্ধে কিছু করা যায় না। মৃগাঙ্ক-শুভ্রের ওপর তেমন শ্রদ্ধা ছিল না তার। মহাত্মা গান্ধীর ওপরই ছিল না। ওটেন সাহেবকে ঠেঙিয়ে দিলে যে সুভাস বোস, সেই ছিল তার আদর্শ। সুভাস বোসের সঙ্গে গান্ধীর যখন মিলছে না, তখন গান্ধীর কথা শোনবার

দরকার নেই, এই ছিল তার সোজা হিসেব। অত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ফ্যাখ্যার ধার ধারত না সে। স্থবিধে পেলেই সায়েব ঠেঙাত। এ বিষয়ে দাদুর সহানুভূতি আছে ব'লেই দাদুর সঙ্গে তার ভাব। একবার ফুটবলের মাঠে এক গোরার সঙ্গে মারামারি ক'রে যখন পুলিস-কেসে পড়ল সে, তখন গোঁয়ার্তুমির জন্যে উপদেশ আর বকুনি দিতে কেউ কসুর করেন নি, গান্ধী-ভক্ত ছোটকাকার চোখ দিয়ে জলই বেরিয়ে পড়েছিল, দাদুই কেবল হঠাৎ ব'লে বসলেন, বংশের মুখ রক্ষা করেছিস তুই। অনর্গল টাকা খরচ ক'রে বড় বড় ব্যারিস্টার লাগিয়ে মকদ্দমা লড়লেন এবং জিতলেন। বাড়ির মধ্যে দাদুই তার বন্ধু। দাদুর কাছে কোন কথা গোপন করে না সে। ইন্দু-পিসীর কাছেও অবশ্য করে না। দাদুর সঙ্গে সৌহার্দ্দ্যের ফলেই কিন্তু পলিটিক্সে ঢুকতে হ'ল তাকে। দাদু সেদিন কথাটা অমনভাবে মাথায় ঢুকিয়ে না দিলে সে এসব নিয়ে মাথাই ঘামাত না বোধ হয় জীবনে। গুণ্ডামি আর ছবি আঁকা নিয়েই জীবন কাটত তার। ঘটনাটা সামান্যই। এক বন্ধুর বিয়েতে মদ খেয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারে নি সে। মা-বাবাকে মিছে কথা বলেছিল। কিন্তু দাদু আর ইন্দু-পিসী যখন জিজ্ঞেস করলেন, তখন মিছে কথা বলতে বাধল। এঁদের কাছে কখনও সে মিছে কথা বলে নি। ইন্দু-পিসী শুনে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেলেন, দাদু কিন্তু বোমার মত ফেটে পড়লেন। সামনে থেকে স'রে পড়তে হ'ল। চুপচাপ কাটল সমস্ত দিন। রজত ভাবলে, দাদু মা-বাবাকেও ব'লে দেবেন বোধ হয়। কিন্তু কাউকে কিছু বললেন না তিনি। সন্ধ্যের সময় তাকে আড়ালে ডেকে বললেন, দেখ্, বাজে মদ খেয়ে শরীর নষ্ট করিস নি। মদ যদি খেতেই চাস, আমার পরামর্শ নিস। এককালে আমি ও-বিষয়ে ওস্তাদ ছিলাম। মুগ্ধ হয়ে গেল রজত। ইন্দু-পিসীও কিছু বললে না। কিছু দিন পরে তার আর্টিস্ট বন্ধুদের একটা পার্টি দিয়েছিল সে। আর্টিস্ট বন্ধুদের পার্টিতে মদের ব্যবস্থা না করলে অঙ্গহানি হয়। দাদুর পরামর্শ চাইতে তিনি শুধু ভাল ভাল মদের নামই ব'লে দিলেন না, সে সবের দামও দিয়ে দিলেন, একটুও আপত্তি

করলেন না, কোন নীতি-উপদেশ দিলেন না। একটু হেসে কিন্তু যে কথাটি বললেন, তা রজতের আত্মসম্মানকে আঘাত করল হঠাৎ। বললেন, আজকাল খদ্দর-চরকার দিনে এ বিলিতী নেশাটা আউট অব ডেট। বড় পেছিয়ে আছিস তুই দেখছি। সে পেছিয়ে আছে? সেই তো অগ্রণী! সবাই যখন হয় ডিগ্রী, না হয় বিজনেস, না হয় পলিটিক্স, না হয় ধর্ম্ম নিয়ে উন্মত্ত, তখন সেই তো বাড়ির মধ্যে একা আর্টের সাধনায় তন্ময় হয়ে আছে, যে আর্টে টাকা নেই, নাম নেই, যা গতানুগতিক নয় এবং সেইজন্যেই যা সর্ব্বযুগের সভ্যতম মানুষের ধ্যানের বিষয়, যা মানুষকে সৃষ্টিকর্ত্তার সমকক্ষ ক'রে তোলে, সেই আর্টের চর্চ্চা করছে সে, সে আউট অব ডেট! দাদু বলে কি!

হংস-শুভ্রের কথাটা কিন্তু টাইম-বমের মত নীরবে প্রচ্ছন্ন হয়ে রইল তার মনে। বিস্ফোরণ হ'ল প্রায় মাসখানেক পরে মেকলে সাহেবের লেখা বাঙালী-বর্ণনাটা পড়বার পর। সঙ্গে সঙ্গে হাতের আস্তিন গুটিয়ে ব'লে উঠল সে, স্পর্দ্ধা তো কম নয় লোকটার! সেই দিনই স্বদেশী হয়ে গেল সে। মদ ছাড়লে, কলেজ ছাড়লে, খদ্দর ধরলে। সাহেব গ্রন্থকারদের লেখা সমস্ত ইতিহাসের বইগুলো পুড়িয়ে ফেললে স্তূপাকার ক'রে। এর পর থেকে চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, তেমনই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ত বিশেষ ক'রে সাহেবদের সেই কীর্ত্তিগুলির ওপর, যা শুনলে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে, বলতে ইচ্ছে করে—ভগবতি বসুন্ধরে, দ্বিধা হও। সাহেব দেখলেই হাত নিসপিস করত, রাগে গিসগিস ক'রে উঠত আপাদমস্তক। যারা আমাদের এতটা হীনচক্ষে দেখে, কিছুতেই তাদের সঙ্গে আপোস চলতে পারে না। যারা আমাদের টিকিট থাকা সত্ত্বেও ফার্স্ট ক্লাস গাড়ি থেকে কান ধ'রে নামিয়ে দেয়, লাথি মেরে পিলে ফাটায়, জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ক'রেও যারা আস্ফালন করে, মিস মেয়োকে দিয়ে বই লেখায়, আমাদের দেশের সম্মানিত বড়লোকেরা যাদের দেশের হোটেলে পয়সা দিয়েও স্থান পায় না কেবল কালো রঙের জন্য, আমাদেরই শিল আমাদেরই নোড়া নিয়ে উপকার করবার ছুতোয় যারা

আমাদের দাঁত ভাঙছে অহরহ, তাদের মহত্ত্ব দেখে আর যে-ই মুগ্ধ হোক, রজত-শুভ্র হবে না। যে পলিটিক্স সম্বন্ধে তার বিতৃষ্ণা ছিল, যার জন্যে সে ছোট-কাকাকে, হীরককে কত ঠাট্টা করেছে, সেই পলিটিক্সেরই জালে সেও জড়িয়ে পড়তে লাগল ক্রমশ। ছবি আঁকা ছেড়েই দিলে দিনকতক। তার কেবলই মনে হতে লাগল, এই লাথি, জুতো, অপমানের হাত থেকে পরিত্রাণ না পেলে তো কিছুই করা যাবে না। এ অবস্থায় আর্ট-চর্চ্চা করা খাঁচার পাখির বুলি-কপচানোর মত হাস্যকর ব্যাপার। তবু কিন্তু এই হাস্যকর ব্যাপারেই উন্মত্ত হয়ে পড়ত সে মাঝে মাঝে এসব সত্ত্বেও। খাঁচার কোকিল যেমন নিজের বন্দীত্ব ভুলে কুহু কুহু ক'রে ওঠে মাঝে মাঝে, সেও তেমনই মেতে উঠত রঙ আর তুলি নিয়ে। ঘরে খিল দিয়ে আপন মনে এঁকে যেত ছবির পর ছবি—বাস্তব ছবি, অবাস্তব ছবি, সম্ভব অসম্ভব কত রকম ছবি। ভুলে যেত পরাধীনতার গ্লানি, ভুলে যেত বাইরের জগৎ, এমন কি নাওয়া-খাওয়ার কথাও মনে থাকত না তার সব দিন। মনের আকাশে ইংরেজ-বিদ্বেষের মেঘ বজ্রবিদ্যুতে ঘন-ঘোর হয়ে উঠত কিছুদিন, তখন অস্বস্তিতে অধীরতায় অনিদ্রায় পাগলের মত অবস্থা হ'ত তার, হঠাৎ তারপর কোথাকার এক খেয়ালী দমকা হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত সেসব, কোথা থেকে ছুটে আসত রঙিন আলোর বন্ধ-হারা প্রবল বন্যা, কালো মেঘের টুকরোগুলোকে বিপর্য্যস্ত ক'রে দিত বহুবর্ণের তরঙ্গ-তাণ্ডবে। কিছুদিন পরে আবার থেমে যেত সব। ছবির ছেঁড়া টুকরোগুলো উড়ে বেড়াত বাগানে উঠোনে ছাতে রাস্তায়। প্রতিবাদ করতে সাহস করত না কেউ। প্রতিবাদ সে সহ্য করতে পারত না। উলটো ফল হ'ত। কলেজ যাওয়া নিয়ে শশাঙ্ক-শুভ্র একদিন বকাঝকা করলেন খুব। বললেন, কলেজ যেতেই হবে তোমাকে।

কিছুতেই যাব না আমি।

কলকাতার বাড়ি ছেড়ে হাজির হ'ল গিয়ে দমদমে দাদুর বাড়িতে এবং সেই দিনই দীক্ষা হ'ল তার।

হংস-শুভ্র সহাস্যে প্রশ্ন করলেন, হঠাৎ এত অনুগ্রহ! এ কি, খদ্দর প'রে ভদ্দরলোক হয়েছ দেখছি!

মদও ছেড়ে দিয়েছি।

বাঃ!

কলেজও।

কলেজও? এখন কি করবে তা হ'লে? খালি সাহেব ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে বেড়াবে? রজত-শুভ্র হাসলে একটু।

সমস্ত দিনটা করবে কি? ছবি আঁকবে? ভাল।

নাতিকে হংস-শুভ্র চিনতেন, বেশি ঘাঁটাতে সাহস করলেন না।

বাবার মত আপনিও কলেজ যাবার জন্যে পেড়াপিড়ি করবেন নাকি? তা যদি করেন, তা হ'লে এখান থেকেও পালাব।

পেড়াপিড়ি করবার মত জোর নেই আমার, বুড়ো হয়েছি।

রজত-শুভ্র আর অধিক বাক্যালাপ না ক'রে সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। বাড়ি ঢোকবার মুখেই তারাপদর সঙ্গে দেখা।

তারাপদ, আমি এসেছি, মাংস আনতে দাও।

তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? ইন্দু এখানে রয়েছে যে!— ব'লেই তারাপদ শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে, ইন্দু কাছাকাছি কোথাও নেই তো! সে শুনতে পেলে আবার এক কাণ্ড ক'রে বসবে। তার বৈধব্যের জন্যে যে বাড়ির কারও সামান্যতম অসুবিধে হবে, এ কিছুতেই বরদাস্ত করবে না সে। আশ্চর্য্য মেয়ে! তার দ্বিতীয় স্বামী কিছুদিন আগে মারা গেছে। এমন মেয়ে যে, মরবার সময় একফোঁটা চোখের জল পর্য্যন্ত ফেলে নি এবং তার পর থেকে বরাবর এমন হাসিমুখে রয়েছে যে, ওর সামনে যেতে তারাপদর ভয় করে। ও যদি গলা ফাটিয়ে কাঁদত, তারাপদ করবার মত কিছু একটা পেত। কিন্তু নিজের জন্যে ও কাউকে কিছু করতে দেবে না, এমন

কি সান্ত্বনা দেবার সুযোগ পর্য্যন্ত দেবে না। ইন্দু কাছাকাছিই ছিল। তারাপদর কথাও শুনতে পেয়েছিল সে।

বেরিয়ে এসে বললে, ও, রজত এসেছিস! মাংস আনাও না তারাপদ, আমার নাম ক'রে হাঙ্গামার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছ বুঝি! আমার কোন আপত্তি নেই।

না, এতে আর হাঙ্গামাটা কি?

পাশ কাটিয়ে স'রে পড়ল তারাপদ।

রজত গিয়ে ঢুকল ইন্দুর ঘরে।

হঠাৎ এসে পড়লি যে?

বাবা কলেজ যাবার জন্যে রোজ তাড়া দিচ্ছেন। পালিয়ে এলাম।

আর কলেজ যাবি না?

না।

কেন? মহাত্মা গান্ধীর ওপর ভক্তি হয়েছে?

ওরকম নিরামিষ লোকের ওপর আমার ভক্তি হয় না।

তবে?

যে কারণে মদ ছেড়েছি, খদ্দর পরেছি, সেই কারণে কলেজও আর যাব না।

কি সেটা?

ইংরেজদের ওপর রাগ। যারা প্রতি পদে আমাদের এত অপমান করে, তাদের কোন রকম সংস্পর্শে থাকতে চাই না।

তা হ'লে ছবি আঁকাও ছাড়তে হয়, রঙগুলোও সব বিলিতী।

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে রজত বললে, তাও ছাড়ব তা হ'লে।

ঝোঁকের মাথায় ব'লে বসল।

ইন্দু খানিকক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। চোখের দৃষ্টি তার উজ্জ্বল হয়ে এল ক্রমশ—ভেতরে যেন একটা আলো জ্ব'লে উঠল ধীরে ধীরে।

ওদের সংস্রব ত্যাগ করলেই কি আমাদের দুঃখ কমবে?

কি করতে বল তা হ'লে?

সত্যিই যদি এর প্রতিকার করতে চাও, তা হ'লে মরবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। আবেদন-নিবেদনে কিছু হবে না, অহিংসার ঢং ক'রেও কিছু হবে না। যে তোমার গালে চড় মারবে, তার নাকে ঘুষি লাগাবার মত সাহস সংগ্রহ করতে হবে।

সাহসের অভাব নেই। কিন্তু সাহস প্রকাশ করি কোথায়? খেলার মাঠে গোরা ঠেঙিয়ে মন ভরে না।

উপায় ব'লে দিতে পারি। কিন্তু শোনবার আগে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

কি?

এ কথা কাউকে বলতে পাবে না।

বেশ।

সেই দিনই দুপুরবেলা অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা নিলে রজত-শুভ্র। সমস্ত শুনে বললে, বেশ, রাজি আছি।

ভাল ক'রে ভেবে দেখ, যদি না পার, এ কাজে নেবো না।

নিশ্চয়ই পারব।

মুখ বুজে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে।

পারব।

আচ্ছা, দেখি কেমন পারিস। বাঁ হাতের একটা আঙুল কপাটের ফাঁকে ঢুকিয়ে দে দিকি।

বাঁ হাতের আঙুল? কেন, কি করবে?

তুই দে না।

রজত আঙুল ঢুকিয়ে দিলে।

এবার বন্ধ করি কপাট?

ও, আচ্ছা, কর।

আঙুলটা পিষে গেল। রজতের মুখের একটি পেশী বিচলিত হ'ল না। রক্তাক্ত আঙুল টিংচার আয়োডিনের পট্টি বাঁধতে বাঁধতে ইন্দু-শুভ্রা বললে, তুই পারবি মনে হচ্ছে।

রজত-শুভ্রের আর্টিস্ট সত্তা নেপথ্যে তখন হাসছিল মুখ টিপে।

খ

ঠিক কিছুদিন আগে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গেছে। সে অধিবেশনে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেলেই সন্তুষ্ট থাকব—মহাত্মাজীর এই প্রস্তাবে দেশের যুবকদের, বিশেষত বিপ্লবপন্থীদের মন একেবারে ভেঙে গেল। তারা যেন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলে, এই নিরীহ আপোস-উন্মুখ ব্যক্তিটির নেতৃত্বে এ দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার কোন আশা নেই। স্বাধীনতা পেতে হ'লে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। এঁর ভরসায় ব'সে থাকলে চলবে না। সারা দেশময় দেখা দিতে লাগল নানা নামের যুবক-সঙ্ঘ। কলকাতায় মহাসমারোহে হয়ে গেল 'ইউথ কংগ্রেস', উদ্দীপনা আরও বাড়ল যতীন দাসের মৃত্যুতে। রজত মেতেছিল এই সব নিয়ে, হঠাৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্র অন্তর্দ্ধান করলেন একদিন তাঁর তেতলার ঘর থেকে। কিছুদিন আগে হীরক ধরা পড়েছিল। এদের দুজনের কারও মতের সঙ্গে যদিও সে সায় দেয় নি কখনও, তবু পর পর এদের দুজনের অন্তর্দ্ধানে তার মনে হ'ল, ঠাস ঠাস ক'রে দু গালে দুটো চড় মেরে গেল যেন কেউ। ক্ষোভে অপমানে যেন দম-বন্ধ হয়ে এল, মনে হ'ল, প্রতিকার কিছু একটা না করতে পারলে আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমন অসহায়ভাবে আর কত মার খাব আমরা। ঘুরে ঘুরে বেড়াল কয়েকদিন অনিশ্চিতভাবে। যে দলে যোগ দিয়েছিল, অবিলম্বে প্রতিকারের কোন উপায় তারাও বলতে পারলে না কিছু। ইন্দু-শুভ্রা বললে, ছটফট ক'রো না, যথাসময়ে

করবার মত কাজ পাবে। ছোটকাকা বা হীরকের কথা তত তীব্রভাবে তাকে চঞ্চল করছিল না, বস্তুত তাদের সম্বন্ধে অনুভূতির তীব্রতাটা ক'মেই আসছিল দিন দিন, তাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল কিছু-একটা করবার আগ্রহ। অলস প্রতীক্ষার নিষ্ক্রিয়তা আর সে সহ্য করতে পারছিল না। হঠাৎ একদিন দাদুর কাছে গিয়ে হাজির হ'ল।

কিছু টাকা চাই।

টাকা! কত টাকা?

হাজার খানেক অন্তত।

কি হবে অত টাকা নিয়ে?

ছোটকাকার খোঁজে বেরুব। তোমরা তো কেউ কিচ্ছু করছ না।

উত্তরটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক এ কথা ভেবে সে যায় নি। সে কোথাও বেরিয়ে পড়তে চাইছিল, যেখানে হোক। হংস-শুভ্র মনে মনে হয়তো খুশি হলেন, কিন্তু মুখে বললেন, তার জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?

মাথা থাকলেই ব্যথা করে মাঝে মাঝে।

হংস-শুভ্রের মুখের ওপর এমন চোটপাট জবাব রজত ছাড়া আর কেউ দিতে সাহস করে না।

তোমাদের যার যা খুশি করবে আর টাকা দিয়ে দিয়ে আমি তা সামলাব, টাকা আমার অত সস্তা নয়।

রজত চ'লে যাচ্ছিল, হংস-শুভ্রকে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠতে হ'ল এবং খোশামোদ ক'রে চেকখানা গুঁজে দিতে হ'ল হাতে।

রজত কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। কারও সঙ্গে দেখা করবার দরকার অনুভব করলে না সে, এমন কি ইন্দু-শুভ্রার সঙ্গে পর্য্যন্ত না। হাওড়ায় দিল্লী এক্সপ্রেস ছাড়ছিল, তারই একখানা টিকিট কিনে উঠে বসল সে তাতে। সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় একা ব'সে ব'সে দু ধারের চলমান দৃশ্য দেখতে

দেখতে খানিকক্ষণ পরে সে যেন সমস্ত ভুলে গেল। দেশের দুঃখ, জাতির অপমান, ছোটকাকা, হীরক—কিছু মনে রইল না তার। দ্রুতগতিতে দ্রুত-পরিবর্ত্তনশীল নানা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে কেমন অনায়াসে ছুটে চলেছে সে! এরই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ব'সে রইল সে অনেকক্ষণ। কিছুক্ষণ পরে কখন যে সে অন্যমনস্ক হয়ে স্যুটকেস থেকে খাতা পেন্সিল বার করেছে, তা তার খেয়াল নেই। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখলে, খাতাটায় ছবির পর ছবি—অনেকগুলো ছবি এঁকে ফেলেছে সে। ইন্দু-শুভ্রার সঙ্গে কথা হবার পর থেকে রঙ আর কেনে নি সে। দেশী পেন্সিলে দেশী ড্রয়িং-কাগজের ওপরই শখ মেটাতে হ'ত তাকে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে উঠত দেশী জিনিসের অযোগ্যতায়। ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত সব। তবু কিন্তু বিলিতী জিনিস কিনতে প্রবৃত্তি হ'ত না আর। মনে হ'ত, বিলিতী জিনিস কিনতে যাওয়া মানে মেকলে আর মাইকেল ওডায়ারদের কৃপাপ্রার্থী হতে যাওয়া। তা সে ম'রে গেলেও হবে না। ছবিগুলো উলটে উলটে দেখলে সে কয়েকবার। একটাও মনের মত হয় নি। কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলে সবগুলো। তারপর মনে হ'ল, কোথায় চলেছে সে? কেন চলেছে? ছোটকাকাকে কোথায় খুঁজে পাবে? তা ছাড়া সত্যিই আর ছোটকাকার জন্যে প্রাণ কাঁদছে না তো! কোন দিনই কাঁদে নি। বরং কাকীমার জন্যে কষ্ট হয় তার। ছোটকাকা দেশের জন্যে অনেক ত্যাগস্বীকার করেছেন তা ঠিক, কিন্তু সমস্তই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। যে গান্ধী স্বরাজ পাবার একটা দিন স্থির ক'রে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করতে পারলেন না, আকারে ইঙ্গিতে ব্যবহারে যিনি ক্রমাগত বামপন্থীদের বিরোধিতাই ক'রে চলেছেন, অথচ নিজে কিছু করতে পারছেন না, তাঁর মধ্যে ছোটকাকা যে কি দেখতে পেয়েছেন, তা তিনিই জানেন। পুলিসের কাছে অহিংসার বাণীর মূল্য কি? যে কন্স্টেব্ল্টার রুলের ঘায়ে তাঁর মাথা ফাটল, সে কি কোনদিন তাঁর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মর্ম্ম বুঝবে? সে যতদিন লাঠি চালাবার জন্যে মাইনে পাবে, ততদিন লাঠি চালিয়ে যাবে। হীরকও

জেলে গেল অত্যন্ত বাজে একটা ব্যাপারে মাথা ঘামাতে গিয়ে। টাইফয়েড-রুগীর পায়ের কড়া সারাবার চেষ্টা করার মত হাস্যকর ব্যাপার ওটা। দেশ স্বাধীন হ'লে কুলি মজুর আপামর ভদ্র সবাই নিস্তার পাবে। বিশেষ ক'রে ওদের নিয়ে অস্থির হয়ে পড়বার কি দরকার ছিল এখন? সর্ব্বপ্রথম দরকার স্বাধীনতা, ইংরেজদের কবল থেকে নিজেদের উদ্ধার করা।···হঠাৎ রজত ঠিক ক'রে ফেললে, দেশের যেখানে যত যুবক-প্রতিষ্ঠান আছে, সব কটার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। এরাই এখন দেশের আশা-ভরসা। দিল্লীতে নেবে সে টিকিট কাটলে লাহোরের। লাহোরে নেমে সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করলে। গাড়োয়ানকে বললে, জেলে নিয়ে চল। জেলে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেবে জেলের গেটের সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে সে। এই জেলে যতীন দাস মারা গেছে, এই জেলে এখনও আছে ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত। জেলের পাহারা-ওয়ালা, গাড়ির গাড়োয়ান দুজনেই বিস্মিত হ'ল। নওজোয়ান ভারতসভার অনেক সভ্যের সঙ্গে আলাপ হ'ল তার লাহোরে। জালিয়ানওয়ালাবাগটাও দেখে এল একদিন। তারপর গেল পুণা। মহারাষ্ট্র জেগে উঠেছে আবার। কিছুদিন আগেই মহারাষ্ট্র যুবক-সঙ্ঘ জওহরলালকে সভাপতি ক'রে বিরাট এক সভা করেছিল। বালগঙ্গাধর তিলকের দেশে গিয়ে রজত যেন নূতন প্রাণ পেল। নূতন ক'রে সে যেন অনুভব করলে আবেদন-নিবেদন আপোস-উপবাস চরকা-রামনামে কিছু হবে না। স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে বাহুবলে, রণক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়ে। বেশি নয়, দেশের এক হাজার যুবক যদি প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, তা হ'লেই হবে। তেত্রিশ কোটি লোক যে দেশে, সে দেশে এক হাজার যুবক পাওয়া যাবে না? তখনই মনে হ'ল, বিবেকানন্দও চেয়েছিলেন, কিন্তু পান নি। কিন্তু বিবেকানন্দ পান নি ব'লে তো হতাশ হয়ে ব'সে থাকলে চলবে না। পুণা থেকে সে গেল নাগপুরে, নাগপুর থেকে বেরার। দু জায়গাতেই সুভাষ বোস সভাপতি হয়েছিলেন ছাত্র-সংঘের অধিবেশনে। সেখান থেকে মাদ্রাজ বোম্বাই বেনারস ঘুরে সে যখন দেশে ফিরলে, তখন সে

পুরোপুরি অগ্নিমন্ত্রের উপাসক। ভারতব্যাপী বিরাট অগ্নিকাণ্ডের একটি আয়োজন ক'রে ফিরেই কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল মহাত্মাজীর কাণ্ড দেখে। লাহোর কংগ্রেসের পর লোকটি অপ্রত্যাশিতভাবে সুর বদলে ফেলেছে। সত্যাগ্রহের আগুন লেগে গেছে সারা দেশে। ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' প'ড়ে তাক লেগে গেল তার। মহাত্মাজী লিখেছেন—None should find himself free or alive at the end of the effort! শুরু হয়ে গেল তাঁর দণ্ডি-অভিযান, বিরাট একটা উন্মাদনা শুরু হয়ে গেল সারা দেশ জুড়ে। শুধু লবণ-আইন নয়, সব রকম আইন অমান্য করতে লাগল সবাই। দেশবন্ধুর স্বরাজ-আন্দোলনের পর এত বড় নাড়া বাংলা দেশকে আর কিছুতে দেয় নি। সবাই মেতে উঠল যেন। যুবকদের নেতা সুভাষ বোসও ঝাঁপিয়ে পড়লেন এতে, জেল হয়ে গেল তাঁর। রজতও হয়তো যোগ দিত, কিন্তু যে দলের সঙ্গে গোপনে যোগ দিয়েছিল সে, তার দলপতির আদেশ না পেলে কিছু করবার উপায় ছিল না তার। সে নিরুপায় হয়ে দেখতে লাগল নিরীহ সত্যাগ্রহীদের ওপর পুলিসের অত্যাচার। লাঠি বন্দুক দিয়ে যতটা সম্ভব, সবই হতে লাগল। মেদিনীপুর শ্মশান হয়ে গেল, বারদোলি থেকে দলে দলে লোক পালাতে লাগল ভিন্ন গ্রামে। ভরতি হয়ে গেল সমস্ত জেল। নতুন জেল তৈরি হ'ল। জেলের বন্দীদের ওপরও লাঠি চলতে লাগল। একদিন খবর পাওয়া গেল, আলিপুর জেলে সুভাষ বোস, যতীন সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, প্রফেসর নৃপেন বাঁড়ুজ্জে, 'লিবার্টি'র সম্পাদক বক্‌শি মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এ খবর পেয়ে রজত যেন ক্ষেপে গেল। ক্ষেপে হয়তো কিছু ক'রে ফেলত একটা, কিন্তু ঠিক সেই সময় এল দলপতির আদেশ—এক বাক্স রিভলভার পৌঁছে দিতে হবে চট্টগ্রামে সূর্য্য সেনের কাছে।...বেরিয়ে পড়ল রজত একদিন অন্ধকার দুর্য্যোগের রাত্রে।

এর পর থেকে রজতের জীবনের রঙ যেন বদলে গেল কিছুদিনের জন্যে। নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে—কখনও হাঁটাপথে, কখনও নৌকো ক'রে,

কখনও ফকির কখনও ফেরিওলা সেজে, কখনও ধর্ম্মশালায় কখনও আস্তাবলে কাটিয়ে রিভলভারের বাক্স সে ঠিক সময় ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু আর বেশি কিছু করবার সুযোগ সে পায় নি। আর্মারি রেডে অংশ নেবার লোভ থাকলেও হুকুম পায় নি সে। যেদিন আর্মারি রেড হয়ে গেল, সেদিন সে পাটনায়। পাটনায় এসে খবর পেল, মিঃ স্লোকম্ব নামক একজন সাহেব জার্নালিস্ট মহাত্মাজীর সঙ্গে জেলে দেখা ক'রে একটা মিটমাট করবার চেষ্টায় আছেন নাকি। এসব নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার অবসরই সে পেল না, অবিলম্বে তাকে ফিরে আসতে হ'ল কলকাতায় রিভলভার সংগ্রহের জন্যে। তার ওপর ভার পড়েছিল, আরও কিছু রিভলভার সংগ্রহ ক'রে মেদিনীপুরে বিতরণ ক'রে আসার। উগ্রতর কোন কর্ত্তব্য পেলে সে সুখী হ'ত। কিন্তু যে পাঞ্জাবী যুবকটি তাদের দলপতি ছিল, সে বললে, রিভলভার ছোঁড়বার লোক অনেক আছে, কিন্তু রিভলভার সংগ্রহ করবার লোক বেশি নেই, তোমাকেই এ ভারটা নিতে হবে। এতে চমকপ্রদ কিছু নেই, কিন্তু এইটেই আসল কাজ। You must play the part of the root to feed the flowers. ...তাই মাটির অন্তরালে শিকড় যেমন থাকে, আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনদের অন্তরালে বাস ক'রে সে তেমনই রসদ সংগ্রহ করতে লাগল বিপ্লবীদের জন্যে। মিশতে হ'ল জাহাজের দেশী বিদেশী খালাসীদের সঙ্গে, তারাই ভিন্ন দেশ থেকে রিভলভার কিনে এনে বিক্রি করে। চোর-ডাকাত-বাটপাড়েরও খোসামোদ ক'রে বেড়াল সে কিছুদিন। তারাও নানা স্থান থেকে চুরি ক'রে আনে রিভলভার। দিনকতক মন্দ লাগল না। গোপনে গোপনে বেপাড়ার অন্ধকার গলিতে ঘুঁজিতে, খিদিরপুর-ডকে, সিনেমা-হলে, গড়ের মাঠে, প'ড়ো বাড়িতে, বহুবিধ বিচিত্র প্রাণীর রহস্যময় সংস্পর্শে এসে রজতের শিল্পীমন যেন লণ্ডন-রহস্যের বিপজ্জনক 'পরিস্থিতি'তে এক অপূর্ব্ব রসে অভিভূত হয়ে রইল দিনকতক। কিছুদিন পরেই কিন্তু এর নোংরামিটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল তার কাছে। কতদিন আর এই ইতর লোকগুলোর খোশামোদ ক'রে বেড়ানো সম্ভব? এর মধ্যে যেটুকু

অভিনবত্ব তা তুদিনেই ফুরিয়ে গেল, অবশিষ্ট রইল এর একঘেয়েমি আর নোংরামি। চোরের মত অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ানো, পুলিস দেখলে শশঙ্কিত হয়ে পড়া, অতিশয় হীনচরিত্রের গুণ্ডাকে প্রচুর টাকা দিয়ে হাতে রাখা, সর্ব্বদাই একটা ছদ্মবেশ ধ'রে অনর্গল মিছে কথা বলা,—কিছুদিন পরে হাঁপিয়ে উঠল রজত-শুভ্র। তার মনে হতে লাগল, না না, এর মধ্যে কোন মহত্ত্ব নেই। ক্লটের পার্ট সে প্লে করতে পারবে না, যদি এর মধ্যে থাকতেই হয়, ফ্লাওয়ারই হবে সে। দলপতি কিন্তু রাজি হলেন না। বললেন, ভাল না লাগলেও ডিসিপ্লিনের খাতিরে তোমার কর্ত্তব্য তোমাকে করতে হবে।

…তবু রজত-শুভ্র একদিন পিছু নিলে এক সাহেবের। তুপুরের একটা চলতি ট্রামে উঠে বসল সে সাহেবটার পাশে। ট্রামে আর কেউ ছিল না। সাহেবটা জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সে ছিল। পাশ থেকে তার মুখটা ভাল ক'রে দেখতে গিয়ে এক কাণ্ড ঘ'টে গেল। হঠাৎ সে মুগ্ধ হয়ে পড়ল। বাঃ, কি চমৎকার প্রোফিল! রেশমের মত চুলগুলো ফুরফুর ক'রে উড়ছে, টকটকে লাল কানটা, কি বলিষ্ঠ চোয়াল, চিবুকের গড়ন কি সুন্দর! রিভলভারের এক গুলিতে এমন সুন্দর সৃষ্টিকে ধ্বংস ক'রে ফেলবে? এ তো কোন অপরাধ করে নি। তার অন্তরাত্মা ব'লে উঠল, না না না। তুমি স্রষ্টা, তুমি শিল্পী, সৃষ্টি করাই তোমার ধর্ম্ম, সুন্দরকে নষ্ট করবে কেন তুমি? টপ ক'রে নেবে পড়ল সে ট্রাম থেকে এবং উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরতে লাগল রাস্তায় রাস্তায় লোডেড রিভলভারটা পকেটে ক'রে।…ঘুরতে ঘুরতে মনে পড়ল দলপতির কথা। তিনি বলেছিলেন, দোষী নির্দ্দোষী বিচার করবার প্রয়োজন নেই আমাদের। আমরা যাকে পাব, তাকেই মারব। এ দেশে ওদের জীবন তুর্ব্বহ ক'রে তুলতে হবে। **Make the soil unsuitable for their growth**…এসব কথা ভেবেও কিন্তু মনে জোর পেল না সে। উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরতেই লাগল।…

…অনেকদিন পরে ঠিক সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে রইল সে চুপ ক'রে। অনেকদিন থেকেই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না

তার বড়। বাইরের সিঁড়ি দিয়ে কখন আসত, কখন যেত, টের পেত না কেউ। শশাঙ্ক বা বাসন্তী ঘাঁটাতে সাহস করতেন না তাকে। জানতেন, প্রতিবাদ করলে সে আরও বেঁকে বসবে। লাহোর-পুণা-বোম্বাই ঘুরে আসবার পর শশাঙ্ক আর একবার পিতার কর্ত্তব্য পালন করবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, বাড়িতে এমন শুয়ে ব'সে কাটানোর চেয়ে একটা কাজ করাই তো ভাল।

রজত উত্তর দিয়েছিল, কাজ তো করছি।

কি কাজ?

বলতে পারি, যদি আপনি ওয়ার্ড অব অনার দেন যে সে কথা কাউকে বলবেন না।

ক্ষণকাল নীরব থেকে বিস্মিত শশাঙ্ক বললেন, বেশ, বল।

আমি টেররিস্ট মুভমেণ্টে কাজ করছি।

চমকে গেলেন শশাঙ্ক। নিজের যৌবনের দিনগুলো মুহূর্ত্তে ভেসে উঠল মনের ওপর, শ্রদ্ধা হচ্ছিল হচ্ছিল, এমন সময় প্রৌঢ় পিতার বিজ্ঞতা অবলুপ্ত ক'রে দিলে সব।

বললেন, এককালে আমিও ওসব হুজুক করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত—। রজতের চোখের দিকে চেয়ে কিন্তু থেমে যেতে হ'ল তাঁকে।

থেমে যেতেই রজত বললে, এ বিষয়ে কোন তর্ক আমি করব না। আপনি যদি জোর ক'রে এ নিয়ে আলোচনা করেন, এই মুহূর্ত্তে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে হবে আমাকে।

ভীতু শশাঙ্ক-শুভ্র চকিতে পুত্রের মুখের দিকে একবার চেয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। এর পর এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা করেন নি তিনি। বাসন্তীকেও করতে দেন নি। সে যে মাঝে মাঝে বাড়িতে আসে, এইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন তাঁরা।...ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সবিস্ময়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল রজত। বিস্ময়ের প্রধান কারণ আত্ম-আবিষ্কার।

হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার ক'রে যেন চমকে গিয়েছিল সে। এতদিন বিপ্লবের যে ধ্বজাটা সে আস্ফালন ক'রে বেড়িয়েছে, তা যে নিতান্তই বাহ্যাড়ম্বর—এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছিল, কিন্তু অস্বীকার করবারও উপায় ছিল না। শত্রুকে নাগালের মধ্যে পেয়ে হঠাৎ তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সত্যিই পেছিয়ে এল সে! অমন একটা সুন্দর জিনিসকে নষ্ট করতে কিছুতেই হাত উঠল না তার! ইন্দু-পিসী শুনলে বলবে কি? ইন্দু-পিসীর শাণিত-হাস্য-দীপ্ত মুখখানা কল্পনায় যেন দেখতে পেল সে। এবং তারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ যেন তড়াক ক'রে উঠে বসল। আমার যা খুশি আমি করব, কার কি বলবার থাকতে পারে তাতে? ইন্দু-শুভ্রার কল্পিত প্রতিবাদের উত্তরে মনে মনে এই কথাগুলো আবৃত্তি ক'রে অনেকদিন পরে নিজের পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনটি জেলে সে ছবি আঁকতে ব'সে গেল।

দুয়ারে টোকা পড়ল।

কে?

আমি, তনিমা।

ও, এস বউদি।

তনিমা ঘরে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গেল ছবিটা দেখে।

বাঃ, কার মুখ এটা?

একটা সাহেবের। চমৎকার নয়?

হ্যাঁ, বেশ সুন্দর। এখন কিন্তু খাবে চল, কাটলেটগুলো ভাজছি, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভাল লাগবে না।

হঠাৎ কাটলেট?

শুক্তি-মুক্তা এসেছে, তাদের খাওয়াচ্ছি ক'রে।

ও।

শুক্তি-মুক্তার ঘন ঘন আসাটা রজত তেমন পছন্দ করত না। অন্য কোন কারণে নয়, তার মনে হ'ত, এখানে বার বার এসে ওরা যেন খুড়ীমাকে অপমান

করছে। খুড়ীমা যখন নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে এত কাণ্ড করেছেন, তখন তাঁর মেয়েরা এমন ভাবে গায়ে-প'ড়ে এখানে আসে কেন? নবনীর নির্লিপ্ততা ভাল লাগত তার। খেতে ব'সে এই শুক্তি-মুক্তাই কিন্তু তাকে নূতন পথের ইঙ্গিত দিলে। রাজনৈতিক আলোচনা উঠল। শুক্তি-মুক্তার কথার ভাবে বোঝা গেল, তারাও বিদ্রোহিনী। মেয়ে দুটোকে যত অপদার্থ ভেবেছিল, ঠিক তত অপদার্থ নয় তারা। দুজনেই সুভাষ বোসের ভক্ত। সুভাষ বোসের চরম পন্থায় তারা আস্থাবান। মহাত্মাজীও শেষকালে যে চরমপন্থী হয়ে উঠে আইন-অমান্য শুরু করেছেন, এতে তারা মহাখুশি। তাদের মতে এখন সকলেরই উচিত মহাত্মাজীর পতাকার তলে এসে দাঁড়ানো। রজত তাদের সামনে কিছু না বললেও—বয়ঃকনিষ্ঠদের সামনে অতিশয় স্বল্পভাষী সে চিরকালই—মনে মনে ভেবে দেখলে যে, বিপ্লব-পন্থা ত্যাগ ক'রে দেশের রাজনীতির সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখতে হয় তা হ'লে সুভাষ-পন্থী হওয়াই উচিত। লুকিয়ে-চুরিয়ে লোক খুন না ক'রে ব্যাপকভাবে আইন-অমান্য আন্দোলনই চালানো উচিত যতক্ষণ না আমরা পূর্ণ-স্বাধীনতা পাচ্ছি। কংগ্রেস যখন এত বড় বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে পেরেছে সারা দেশে, তখন কংগ্রেসে যোগ দেওয়ারও আর কোন সঙ্গত বাধা নেই। বিদ্রোহ ক'রে স্বাধীনতা লাভ করাই তো উদ্দেশ্য।

এর পর কিছুদিন কংগ্রেসের কাজে উৎসাহী হয়ে উঠল সে। যদিও দেশের সব নেতা জেলে, যারা বাইরে আছে তারাও পুলিসের লাঠির চোটে নিস্তেজ হয়ে আসছে ক্রমশ, তবু এখনও থামবার সময় হয় নি, রজতের মনে হ'ল। এখনও দেশে এত লোক আছে যে, দশ বছর এ সত্যাগ্রহ চালানো যায়, এবং তাই চালাতে হবে। ছবি-আঁকা ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত উৎসাহভরে সে ভলান্টিয়ার সংগ্রহ ক'রে বেড়ালো কিছুদিন আবার মহিষ-বাথানে যাবার জন্যে। সতীশ দাশগুপ্ত, সুরেশ বাঁড়ুজ্জে জেলে গেছে তো কি হয়েছে? রজত নিজেই যাবে এবার। ওদের দেখিয়ে দিতে হবে যে, দেশে লোকের অভাব নেই।

হঠাৎ নীল আকাশ থেকে বজ্রপাত হ'ল।—গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট। তার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল যেন। লোকটা আবার আপোস করতে উদ্যত হয়েছে! জওহরলাল নেহেরু পর্য্যন্ত প্রতিবাদ করলেন না! প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকে সহযোগিতা করতে দেশ যে কারণে অস্বীকার করেছিল, সে কারণ কি অন্তর্হিত হয়েছে? দ্বিতীয় বৈঠকে কংগ্রেস যাবে কোন্ মুখ নিয়ে? সদাশয় আরুইন কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিলেন কেবল অহিংস-রাজবন্দীদের জন্যে। রজতের মনে হ'ল, কেন, দেশের জন্যেই কি সবাই কারাবরণ করে নি? এক দলকে ছেড়ে দিয়ে আর এক দলকে আটকে রাখবার মানে? মহাত্মাজী চুপ ক'রে রইলেন। শোনা গেল কেবল, তিনি চেষ্টা করছেন। তাঁর চেষ্টা বিফল হ'ল যখন, তখন তিনি প্যাক্ট ভঙ্গ করলেন না, চুপ ক'রে রইলেন। বিপ্লবপন্থীরা নিজেরাই চেষ্টা করতে লাগল জেল থেকে। গভর্মেণ্টকে আবেদন জানালে তারা যে, গভর্মেণ্ট সত্যিই যদি দেশের শান্তি চান, তা হ'লে কেবল মহাত্মাজীর সঙ্গে প্যাক্ট করলেই হবে না, তাদের সঙ্গেও করতে হবে এবং তা তারা করতে প্রস্তুত আছে গভর্মেণ্ট যদি পুলিসের মারফত কথাবার্ত্তা না চালিয়ে নিজেরা চালান। যতীন সেনগুপ্ত এ সম্পর্কে বক্‌সা জেলে গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে দেখাও করলেন, গভর্মেণ্ট কিন্তু পুলিসের সম্পর্ক ছাড়তে রাজি হলেন না কিছুতে। সব ভেঙে গেল। তাদের কথা কেউ শুনলে না, শোনবার দরকারও মনে করলে না। মাত্র কিছুদিন আগে প্রকাশ্য রাজপথে পুলিস যে মেয়র সুভাষ বোসকে, এডুকেশন-অফিসার মিস্টার চ্যাটার্জিকে, লাইসেন্স-অফিসার মিস্টার ঘোষালকে ধ'রে মার দিলে, আইন-অমান্য-প্রতিরোধ-ওজুহাতে মেদিনীপুরে, যুক্তপ্রদেশে, গুজরাটে পুলিসের যে যথেচ্ছাচার হয়ে গেল, তার কোন অনুসন্ধান পর্য্যন্ত হবে না, মহাত্মাজী বড়লাটের সঙ্গে শর্ত্ত করেছেন। রজত-শুভ্রের সমস্ত বুকটা যেন জ্বলতে লাগল। সে জ্বালা আরও বাড়ল, যখন বিঘোষিত হ'ল, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল আগামী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করবেন। প্রচলিত বিধি অনুসারে সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'ল না, হ'ল ওয়ার্কিং

কমিটির খেয়াল অনুসারে। মহাত্মাজী লাট সাহেবের সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন, তা যাতে করাচী কংগ্রেসের অনুমোদন পায় তার ব্যবস্থা করতে ওয়ার্কিং কমিটি বদ্ধপরিকর। তা না হ'লে মহাত্মাজীর অপমান হবে যে! মতিলাল নেহেরু মারা গেছেন, জওহরলাল 'বাপুজী'র বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। আর কারও কাছ থেকে কোন বিরুদ্ধাচরণ প্রত্যাশা করা যায় না, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার আগেই বিতাড়িত হয়েছেন। আমেদাবাদ-বম্বে-দিল্লীর বড় বড় ব্যবসায়ীরাও শান্তির জন্যে উন্মুখ, কারণ আন্দোলনে তাঁদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে যে! সুতরাং গান্ধী-আরুইন প্যাক্টকে করাচী কংগ্রেসে পাকা করবার জন্যে তাঁরা অজস্র টাকা ঢালতে লাগলেন অর্থাৎ তাঁদের মনোমত ডেলিগেট সংগৃহীত হতে লাগল, তাঁদের যাতায়াতের ভাড়া ইত্যাদির ব্যবস্থাও হয়ে গেল। লেফ্‌ট-উইংগাররা সব জেলে। গভর্মেণ্টের চক্ষে তাঁরা নন-ভায়োলেণ্ট নন ব'লে ছাড়া পান নি কেউ। সুতরাং বিরুদ্ধাচরণ করবে কে? সুভাষবাবু ছাড়া পেয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি একা কি করবেন? তাঁর সপক্ষে বাংলা দেশে যারা জেলের বাইরে আছে, তাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত-ঘরের যুবক, বাংলা দেশ থেকে করাচী পর্য্যন্ত যাবার গাড়িভাড়াই জোটাতে পারবে না অনেকে। এদের ভাড়া দেবার মত দেশ-বন্ধু আর তো দেশে নেই। হঠাৎ রজত-শুভ্র ক্ষেপে উঠল। যেমন ক'রে হোক, একাই এর প্রতিবাদ করবে সে। কংগ্রেস শুরু হবার সাত দিন আগে হঠাৎ সে উধাও হ'ল একদিন বাড়ি থেকে। ঝড়ের মত ছুটে চলেছিল সে দিল্লী এক্‌স্‌প্রেসে করাচীর দিকে। আর কিছু না পারুক, সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে কংগ্রেস-প্যাণ্ডেলে লাফিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে বলবে সে, ভুল করছ, তোমরা ভুল করছ। এরা সব দেশের প্রতিনিধি নয়, ভাড়া-করা লোক এরা, বড়লোকদের সুবিধা করবার জন্যে এসেছে, দেশের নয়। কিন্তু দিল্লীতে নেবেই একটা খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সে। তার দেহের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। ভগৎ সিং আর তার দুজন সঙ্গীর ফাঁসি হয়ে গেছে। যে গভর্মেণ্ট কংগ্রেসের আনুকূল্য চায়, কংগ্রেস বসবার ঠিক চারদিন আগে তার

এ কি ব্যবহার ! এর একটি অর্থ ই হ'তে পারে, রজতের মনে হ'ল। যারা নাম-লেখানো গান্ধী-পন্থী নয়, কংগ্রেস তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবে না এবং গভর্মেণ্ট সে কথা ভালভাবে জানে ব'লেই তাদের নিয়ে যা খুশি করবে। ফাঁসি দেবে, বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটকে রাখবে, তাদের বাপ-মা-ভাই-বোনকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে, তাদের বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখবে না। যদিও তারা ভারতের মুক্তির জন্যেই সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়েছে, কিন্তু ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তাদের হয়ে একটি কথাও বলবে না, যেহেতু তারা খদ্দরের লেংটি প'রে অহিংসার ভণ্ডামি করে নি, দুর্গম পথে নির্ভীক বীরের মত যাত্রা করেছে স্বদেশের স্বাধীনতা-কামনায়। রজতের হঠাৎ মনে হ'ল, এ কংগ্রেসে গিয়ে লাভ কি ? সেখানে কিছু বলতে যাওয়া তো অরণ্যে রোদন করা। দিল্লীর রাস্তায় পাগলের মত ঘুরতে লাগল। একবার ইচ্ছে হ'ল, মামার বাড়িতে যাই, কিন্তু রায়বাহাদুর মাতামহর কথা মনে পড়তেই সে ইচ্ছা অন্তর্হিত হ'ল। খুড়ীমাও এখানে আছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করলে কেমন হয়! কিন্তু কি জানি তিনি কি মনে করবেন, এই ভেবে তাঁর খোঁজ করবার চেষ্টাও করলে না সে। চাঁদনি-চকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরে ঘুরে অবশেষে ঠিক করলে, যাব। সুভাষবাবুর সঙ্গে অন্তত একবার দেখা করা দরকার।

সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে, তাঁর কথা শুনে আরও অবাক হয়ে গেল সে। তিনি ঠিক করেছেন, লেফ্‌টিস্টদের তরফ থেকে একটা লিখিত বিবৃতি দেবেন কেবল যে, গান্ধী-আরুইন-প্যাক্ট তাঁরা সমর্থন করেন না ; কিন্তু প্রকাশ্য সভায় এর বিরুদ্ধাচরণ করবেন না তিনি। হেরে যাবার আশঙ্কা তো ছিলই, আর একটা কারণও তিনি দেখালেন। তিনি বললেন, কংগ্রেস বসবার ঠিক চার দিন আগে, ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি দেওয়ার অর্থ—গভর্মেণ্ট চান, এই নিয়ে একটা বিরোধ হোক কংগ্রেসের মধ্যে। সুতরাং সে বিরোধ সৃষ্টি করা সমীচীন হবে না। তা ছাড়া তিনি বললেন, মহাত্মাজীকে আমরা যখন নেতা ব'লে মেনে নিয়েছি, তখন বিপক্ষের কাছে তাঁর মান-রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। সুভাষবাবুর

ওপর রজতের ভক্তি ছিলই, এ কথা শুনে তা গাঢ়তর হ'ল। তা আরও বাড়ল নওজওয়ান-ভারত-সভায় তাঁর বক্তৃতা শুনে। ভক্তি বাড়ল বটে, কিন্তু বক্তৃতায় তিনি যা বললেন, যুক্তির দিক দিয়ে তা মূল্যবান হ'লেও রজত-শুভ্রের রুচিকর হ'ল না। তিনি বললেন, কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে কংগ্রেস দখল করবার চেষ্টা কর তোমরা। কংগ্রেস দখল করবার চেষ্টা মানে—নিজেদের দলে লোক সংগ্রহ ক'রে নিজেদের ভোট বৃদ্ধি করা, অর্থাৎ টাকা খরচ ক'রে খোশামোদ ক'রে বেড়ানো। কিন্তু দেশের টাকাওয়ালা বণিকেরা স্বার্থের খাতিরে শান্তি-প্রিয় গান্ধী-ভক্ত হয়ে উঠেছে, চাকুরেরা তো বটেই; অধিকাংশ ভদ্রলোকও হয় শান্তি-কামনায়, না হয় মহাত্মা-ভক্তিতে আন্দোলন করতে আর চায় না। এদের খোশামোদ ক'রে বেড়াতে হবে? স্বাধীনতার জন্যে অশান্তির আগুন জ্বালাবে যারা, তাদের সাহায্য করবার মত বোকা লোক কটা আছে? এই সব লোককে খোশামোদ ক'রে ভজানো রজত-শুভ্রের কর্ম্ম নয়। তার চেয়ে বরং··· সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ট্রামে-দেখা সাহেবের মুখটা—বলিষ্ঠ চোয়াল চিবুক—রেশমের মত চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে।

তা হ'লে কি করবে সে? তার পৌরুষ ব্যর্থ হয়ে যাবে কোন পথ না পেয়ে? সুভাষবাবুর দলে লোক-সংগ্রহ ক'রে বেড়ানোই তার জীবনের কাজ হবে নাকি? এ কাজ সে পারবে না। হঠাৎ ঠিক ক'রে ফেললে, ছবি আঁকব আবার। দেশের কথা ভাবলে পাগল হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 'প্রবাসী' না 'ভারতী' কোথায় যেন অবনীবাবুর লেখা একটা প্রবন্ধ পড়েছিল, তার প্রথম লাইন কটা প্রায় মুখস্থই ছিল তার। মনে পড়ল সেই লাইন কটা, ইন্দ্রনীলমণির ঢাকনা দিয়ে ঢাকা এই প্রকাণ্ড রসের পেয়ালা সামনে রয়েছে, এর ঢাকনা খুলতে বাধা কি? কত শক্ত শক্ত কাজে আমরা এগিয়ে যাই, এইটেই কি খুব দুঃসাধ্য হ'ল? দুঃসাধ্য কথাটা উদ্দীপ্ত ক'রে তুলল তার কল্পনাকে। ঠিক ক'রে ফেললে, এই দুঃসাধ্য কাজই সাধ্য করতে হবে তাকে। স্বদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান অপরে করুক, তার দ্বারা হ'ল না ওসব।

রীতিমত 'স্টুডিও'ই গ'ড়ে তুললে আলাদা একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে। কল্পনা-তুরঙ্গম এমন দ্রুতবেগে ছুটল যে, দেশী-বিদেশীর সম্বন্ধে হুঁশ রইল না আর বড়। বিদেশী রঙ তুলি কাগজ ক্যাম্বিস কিনতেও দ্বিধা হ'ল না। টাকা যোগালেন হংস-শুভ্র। বস্তুত হংস-শুভ্র যেন মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। গোঁয়ারটা যা খুশি করুক, কিন্তু চোখের সামনে করুক। আজ বম্বে, কাল মীরাট, পরশু করাচী, তার পরদিন চট্টগ্রাম ক'রে বেড়ানোর চেয়ে কতকগুলো রঙ আর তুলি নিয়ে যদি ভুলে থাকে, থাক্। তা ছাড়া মুখে যদিও তিনি রজতের ছবি নিয়ে ব্যঙ্গই করতেন, কিন্তু মনে মনে তারিফ করতেন খুব। তাই টাকা দিতে কার্পণ্য করলেন না তিনি। শশাঙ্ক-শুভ্র অবশ্য মনে মনে চটছিলেন, বাজে ব্যাপারে এতগুলো টাকা নষ্ট হচ্ছে ব'লে। কিন্তু কিছু বলবার উপায় ছিল না তাঁর, সাহসও ছিল না। এক হিসেবে অবশ্য নিশ্চিন্তও হয়েছিলেন তিনি, যে দলে মিশছিল তা ত্যাগ ক'রে যদি ছবি-আঁকা নিয়ে থাকে, তাও মন্দের ভাল। তাই চুপ ক'রে ছিলেন, তার স্টুডিওতে অবশ্য যান নি একদিনও, ওসব ননসেন্স ভালই লাগত না তাঁর। বাসন্তী কিন্তু খুব মেতে উঠল ছেলের স্টুডিও নিয়ে। পরিচিত-মহলে আস্ফালন করবার নতুন একটা বিষয় পাওয়া গেল, তার যে ছেলেকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না এতদিন, তার গুণপনা এবার দেখুক সবাই। প্রথম প্রথম রজত নিতান্ত অবহেলা-ভরে যে ছবিগুলো এঁকেছিল, এক ঝাঁক প্রজাপতি, একরাশ ফুল, একটা ময়ূর, ছিঁড়ে ফেলার আগেই কাঙালের মত সেগুলো সংগ্রহ করেছিল বাসন্তী এবং আরও সংগ্রহ করবার আশায় প্রায়ই যেত স্টুডিওতে। যা দেখত, যা পেত, এত বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তা নিয়ে যে, রজত বিরক্ত হ'ত।

একদিন সে ব'লেই ফেললে, ছবির তুমি কিছু বোঝ না মা। কতকগুলো বাজে ছবি বাঁধাচ্ছ খালি দামী ফ্রেম দিয়ে। কি হবে ওগুলো রেখে?

আমার ভাল লাগে, তাই রাখি।

কিন্তু ওগুলো যে আমার আঁকা, তা ব'লে বেড়াতে পারবে না সকলকে।

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল বাসন্তী। মনে মনে একটু শঙ্কিতও হ'ল। আস্ফালন করবার জন্যেই সে ছবি সংগ্রহ করছিল না কেবল, উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বেড়াজালে বন্দী করবার চেষ্টাও করছিল তাকে। ধরবার ছোঁবার আগেই হীরক জেলে চ'লে গেল নিঃশব্দে। একে যেতে দেওয়া হবে না, ভুলিয়ে-ভালিয়ে আটকাতেই হবে কোন রকমে। রজতই তার লক্ষ্য, ছবিগুলো উপলক্ষ্য মাত্র।

যেন অসম্ভব কিছু একটা করতে বলছে, মুখের এমনই একটা ভাব ক'রে বাসন্তী বললে, আমি আর কার মুখ চাপা দেব, বল? ননটু, ময়না, মিসেস হালদার, বকৃসীর বউ, যে দেখছে, সেই প্রশংসা করছে। সেদিন আমার সঙ্গে সেই যে মেয়েটি এসেছিল, পূর্ণিমা ব্যানার্জি, সে তো বললে, নামজাদা ইটালিয়ান আর্টিস্টদের আঁকা ছবির চেয়েও তোর ছবি ভাল। 'খুনে' নাম দিয়ে যে ছবিটা এঁকেছিস, সেটা তো সে চেয়েই নিলে আমার কাছ থেকে। আমার দেবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মুখ ফুটে চাইলে যখন—

রজত ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ছবিতে রঙ দিয়ে যেতে লাগল কোন উত্তর না দিয়ে। অনেকক্ষণ উভয়েই চুপ ক'রে রইল। বাসন্তী ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেল। তন্ময় অথচ নির্ব্বিকার কে এ? প্রশংসা দিয়ে কি একে ভোলানো যাবে?

স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে হঠাৎ বললে, পূর্ণিমা মেয়েটিকে কেমন লাগল তোর?

দেখি নি ভাল ক'রে।

তোর যদি আপত্তি না থাকে তো বল্, সম্বন্ধ করি।

খুনে ছবিটা যদি ওর ভাল লেগে থাকে, তা হ'লে ওর সঙ্গে সারা জীবন বাস করা যাবে না।

খুনে ছবির বিষয়ে পূর্ণিমা কোন মন্তব্যই করে নি। বস্তুত কোন বিষয়েই কিছু বলে নি সে। গল্পটা বাসন্তী বানিয়ে বলেছিল। নিজের অস্ত্রে নিজেই আহত হয়ে চুপ ক'রে রইল।

তোর খাবার টিফিন-কেরিয়ারে দিয়ে গেলুম, খাস যেন মনে ক'রে।

অত রকম খাবার আন কেন রোজ রোজ, কে খাবে অত?

আজ বেশি নেই।

বাসন্তী বেরিয়ে চ'লে গেল। কিছুতেই ছেলেটাকে বাগাতে না পেরে সে ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছিল। আর কেউ না বুঝলেও তার মাতৃহৃদয়ের কাছে এ কথা অবিদিত ছিল না যে, এই খেয়ালের খেলাঘরেও বাঁধা পড়ে নি, আর এক খেয়ালের ঝোঁকে এক নিমিষে সমস্ত চুরমার ক'রে দিয়ে চ'লে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না ও।

কিছুদিন নির্ব্বিঘ্নেই কাটল। তার কারণ, রজত নিজেই জেদ ক'রে নিজেকে বন্দী ক'রে রেখেছিল। খবরের কাগজ পড়ত না, পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা করত না, পাছে দেখা হয়ে যায়—এই ভয়ে ট্যাক্সি ছাড়া রাস্তায় বেরুত না সে। স্টুডিওর দরোয়ানের ওপর কড়া হুকুম ছিল, বাড়ির লোক ছাড়া আর কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়। সে যেন চোখ বুজে কানে তুলো দিয়ে বাইরের খবরকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। সে খবর ভয়ঙ্কর, তা জানতে পারলেই শরীরের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠবে, তার হলকায় শিল্পকলার সমস্ত সৌন্দর্য্য পুড়ে কালো হয়ে যাবে এক নিমিষে—এ ধারণা তার ছিল ব'লেই জোর ক'রে সে নিজেকে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল রাজনৈতিক আবর্ত্ত থেকে। বারম্বার বোঝাতে চেষ্টা করছিল মনকে—ছবির জগতেই মূর্ত্ত কর তুমি নিজেকে। নখদন্তের নির্ব্বিচার ব্যবহার করতে সঙ্কুচিত হও যখন, তখন পশুর জগতে তোমার স্থান নেই। নিরন্তর এই মন্ত্র জপ ক'রে সে ক্রমাগত ছবি এঁকে যাচ্ছিল। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে একটা অস্বস্তির তুষানল ধিকিধিকি জ্বলছিল গোপনে গোপনে। নানা রঙের প্রলেপ দিয়েও আহত আত্ম-সম্মানের কুৎসিত কালো রঙটাকে কিছুতেই অবলুপ্ত করতে পারছিল না সে একেবারে।

মনে হ'ত, ভীরু ভীতু নপুংসক আমি, তাই পালিয়ে এসেছি, যতীন

ঘোষের বিধবাকে বাঁচিয়ে তার স্বামীপুত্রকে হত্যা করতে পেরেছিল যে, সে-ই বীর। তুলি থেমে যেত। মনে পড়ত ইন্দুপিসীর কথাগুলো, পুলিস-অফিসাররা মরতে ভয় পায় না, তারা জানে যে তারা ম'রে গেলে তাদের স্ত্রীপুত্রদের গভর্মেণ্ট প্রতিপালন করবে। চাকরি দেবে, জায়গীর দেবে। তাই পুলিস-অফিসারটিকে মেরে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না, তাদের বংশলোপ করতে হবে। বিধবাটা বেঁচে থাকবে শুধু হাহাকার করবার জন্যে।

রজত শিউরে উঠত, প্রাণপণে চেষ্টা করত ছবিতে মন দেবার। লজ্জায় ক্ষোভে আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত সমস্ত অন্তর।

হঠাৎ একদিন স্টুডিওতে এসে দেখলে, তার টেবিলের ওপর মোটা লম্বা খাম রয়েছে একখানা। দরোয়ান বললে, বাইসিক্লে ক'রে এক বাবু এসে চিঠিখানা দিয়ে গেছেন। কোন ঠিকানা নেই—খোলা খাম। তার থেকে বেরুল এক তাড়া কাগজ এবং খবরের কাগজের কাটিং। রজত পড়তে লাগল এবং পড়তে পড়তে নিজের অজ্ঞাতসারেই চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধ'রে গেল তার। করাচী কংগ্রেসের পর থেকে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক খবর লেখা ছিল কাগজগুলোতে। সে এতদিন ইচ্ছে ক'রেই কিছু জানতে চায় নি, জানবার পর কিন্তু পাগল হয়ে উঠল। কংগ্রেস কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী একাই চ'লে গেছেন বিলেতে গোল-টেবিল-বৈঠকে যোগ দেবেন ব'লে। কংগ্রেসের এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভক্তিতে রজতের আপদমস্তক জ্ব'লে উঠল যেন। লর্ড আরুইনও বিদায় নিয়েছেন এবং তার পরিবর্ত্তে এসেছেন লর্ড ওয়েলিংডন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে প্যাক্ট করবার দুর্ব্বলতা দেখিয়ে পাদ্রী-প্রতিম লর্ড আরুইন ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের যে মর্য্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছিলেন, লর্ড ওয়েলিংডন সেই মর্য্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। প্যাক্টের শর্ত্ত যে গভর্মেণ্টের তরফ থেকে পুরোপুরি প্রতিপালিত হচ্ছে না, এ কথা জেনেও মহাত্মাজীর বিলেত যাবার আবেগ কিছুমাত্র কমে নি। গুজরাটের চাষীদের বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দিতে নানা বখেড়া করেছেন

গভর্মেণ্ট, যুক্ত প্রদেশের গরিব চাষীদের খাজনা মাপ করা হয় নি, বাংলা দেশে এখনও দলে দলে লোককে বিনা বিচারে আটক করা হচ্ছে। মহাত্মাজী শেষ মুহূর্ত্তে এসব সম্বন্ধে যা হোক একটা আপোস ক'রে বিলেত চ'লে গেছেন। সবাই কিন্তু চুপ ক'রে থাকে নি। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থীরা ছাড়া বাকি সকলে তারস্বরে প্রতিবাদ করেছে প্যাক্টের। বাংলা দেশ প্রতিবাদ করেছে আরও সক্ষমভাবে। কিছুদিন আগেই ঢাকা-ময়মনসিংহে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার অন্তরালে যে রূঢ় সত্য প্রত্যক্ষ করেছে বাঙালী, তার ফলে মিস্টার লোম্যানকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আসামীকে খোঁজবার জন্যে পুলিশ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যে কাণ্ড করছে···হঠাৎ হাত থেকে কাগজের তাড়াটা কে যেন ছিনিয়ে নিলে। রজত চমকে চেয়ে দেখলে, ইন্দু-শুভ্রা। তার চোখে মুখে যেন ঝঞ্ঝা স্তব্ধ হয়ে আছে।

অতিশয় ধীরকণ্ঠেই সে কিন্তু বললে, এ নিয়ে আর তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন, এগুলো আমার জন্যে এসেছে।

আমি যদি ঘামাই, ক্ষতি কি?

এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার অধিকার নেই তোমার। তুমি ছবি আঁক।

রজতের মনে হ'ল, তার গালে কে যেন চড় মারলে একটা।

ইন্দু-শুভ্রা কাগজের তাড়াটা হাতে ক'রে চ'লে যাচ্ছিল।

ছোট পিসী, যেও না, একটা কথা শোন আমার।

কাগজগুলো পড়বার পর রজতের যে ব্যবহার ইন্দু প্রত্যাশা করেছিল, রজতের কম্পিত কণ্ঠস্বরে তারই আভাস পেয়ে ফিরে দাঁড়াল সে।

তোমার প্রলাপ শোনবার অবসর আমার নেই। সত্যি যদি কাজ করতে চাও, সঙ্গে আসতে পার।

বাধ্য বালকের মত উঠে গেল রজত-শুভ্র।

প'ড়ে রইল স্টুডিও আর চতুর্দ্দিকে ছড়ানো অসংখ্য ছবি।

এর পর কিছুদিন তার যে ভাবে কাটল, তার বর্ণনা সে নিজেও বোধ হয়

করতে পারত না সম্পূর্ণভাবে। সব কথা সম্পূর্ণভাবে জানবার সুযোগই হয় নি তার। অন্ধভাবে যন্ত্রচালিতবৎ যেসব কাজ তাকে করতে হয়েছে, তার কোন অর্থই সে বুঝতে পারে নি অনেক সময়ে। বোঝবার হুকুমও ছিল না। ছবিই আঁকতে হয়েছে নানা রকম। উড়ন্ত পাখীর, ঘুমন্ত শিশুর, ভিখারীর, তরুণীর, মন্দিরের, ঘড়ির, কত রকম যে তার ঠিক নেই। ছবিগুলোর সঙ্কেত যে কি, কার কাছে সেগুলো কবে কেন পাঠানো হচ্ছে, এসব কিছুই জানবার উপায় ছিল না। দিনকতক রিভলভার নিয়ে চাঁদমারি করতে হ'ল এক অচেনা পল্লীগ্রামের জনমানবহীন ধ্বংসোন্মুখ বাগান-বাড়িতে গিয়ে। সেই নিঃসঙ্গ পুরীতে চোরের মতন লুকিয়ে বাস করতে হ'ত শুকনো পাঁউরুটি চিবিয়ে, আর যে কোনও বস্তুর ওপর গুলি চালিয়ে ঠিক করতে হ'ত হাতের লক্ষ্য। ঠিক ছিল, পরীক্ষক আসবেন একদিন। হঠাৎ অচেনা যুবক এলেন একজন কোন খবর না দিয়েই, আবির্ভূত হলেন যেন ঝোপের ভেতর থেকে। পকেট থেকে বার ক'রে দেখালেন তারই আঁকা উড়ন্ত পাখীর ছবি, বোঝা গেল দলেরই লোক। গাছ থেকে একটা ডাব পেড়ে পুকুরের জলে ভাসিয়ে বললেন, মারুন দিকি। রজতের হাতের লক্ষ্য দেখে খুশি হয়ে গেলেন। বললেন, আচ্ছা, আপনি কলকাতায় ফিরে যেতে পারেন। হাওড়া স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে কালো-রঙের-সাহেবী-স্যুট-পরা এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করবেন আপনার জন্যে, কাল ঠিক বেলা বারোটার সময়। তিনি আপনাকে যথাস্থানে নিয়ে যাবেন। কালো-সাহেবী-স্যুট-পরা ভদ্রলোক তাকে নিয়ে গেলেন একটা হোটেলে। সেখানে আরও কয়েকটি যুবক অপেক্ষা করছিল। নাম লটারি করা হ'ল। রজতের নাম উঠল না, উঠল বিনয়ের। মিস্টার সিম্প্‌সনকে গুলি করবার ভার পড়ল তার ওপর। রজতকে বলা হ'ল, পরশু রাত্রে তুমি লুপ লাইনের ঘোঘা আর কহলগাঁয়ের মাঝামাঝি জায়গায় রেল-লাইনের বাঁ ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে টর্চ হাতে ক'রে। লুপ এক্‌স্‌প্রেস যখন যাবে, তখন কয়েকবার টর্চ জ্বালাবে কেবল, আর কিছু করতে হবে না তোমাকে। অন্ধকার রাত্রে একহাঁটু

ঘাসের মধ্যে প্রেতের মতন দাঁড়িয়ে রইল সে। যথাসময়ে টর্চও জ্বালালে, কিন্তু কেন তা জানবার উপায় ছিল না। এই ষড়যন্ত্রের বিরাট ফ্যাক্টরিতে সে যেন একটা 'নাট' কিংবা 'বল্টু', যখন যেখানে দরকার লাগানো হচ্ছে তাকে। রিভলভারও সংগ্রহ ক'রে বেড়াতে হ'ল আবার কিছুদিন। সায়ানাইডও। নানা রকম ছদ্মবেশ ধ'রে একজন সি. আই. ডি. অফিসারের পেছনে ঘুরে ঘুরে তার গতিবিধির ইতিহাসও যোগাড় করতে হ'ল। সুসঙ্গে কুসঙ্গে অনাহারে অনিদ্রায় পদব্রজে ট্রেনে ষ্টীমারে নৌকোয় কত জায়গায় কত দুর্গতির মধ্যে ঘুরে বেড়ালে যে সে, তার আর ইয়ত্তা নেই। কিছুদিন পরে মনে হতে লাগল, তার দেহ-প্রাণ-মন-আত্মা কিছুই যেন তার নিজের নয়। হৃদয়ের নেপথ্যলোকে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের বিদ্যুৎ চিকমিক ক'রে উঠত। মনে হ'ত, নির্ব্বিচারে এমন ভাবে নিজের স্বাধীন সত্তার শ্বাসরোধ করা কি ঠিক হচ্ছে? তখনই মনে পড়ত ছেলেবেলায় পড়া সেই ইংরেজী কবিতাটা, They are not to make reply, They are not to reason why, They are but to do and die····· প্রাণপণে আত্মসম্বরণ ক'রে থাকত সে। বহুদিন আগে ট্রামে সাহেবের সুন্দর মুখশ্রী দেখে তার মনে যে সুকুমার-বৃত্তি জেগে উঠেছিল, সবলে তার টুঁটি চেপে ধরবার চেষ্টা করত সে। বার বার আবৃত্তি করত মনে মনে, ওসব দুর্ব্বলতাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, You are but to do and die। মেরে মরবার জন্যে প্রস্তুতই হয়েছিল সে মনে মনে, লটারিতে নাম উঠলে সে-ই যেত।···হঠাৎ খবর এল, সিম্‌প্‌সন মারা পড়েছে, কিন্তু বিনয়ও পালাতে পারে নি। ধরা প'ড়ে গেছে সে। একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হ'ল, লুকিয়ে পড়ল সবাই। হ্যাঁ, ভয়ে ভয়েই। খবর এল, পুলিস তার বাড়ি সার্চ করেছে। চট্টগ্রামে, ঢাকায়, মেদিনীপুরে প্রতি ঘরে ঘরে পুলিস হানা দিচ্ছে। গ্রেপ্তার করেছে অনেককে। অনেক নিরীহ লোককে, বিপ্লবের 'ব'ও যারা জানে না। তবু চোরের মত আত্মগোপন ক'রে থাকতে হ'ল। পুলিসের ছায়ামাত্র দেখলে পালিয়ে যেতে হ'ত, বেরালের ভয়ে ইঁদুর

যেমন পালায়। পালিয়ে গিয়ে কিন্তু লজ্জায় মাথা কাটা যেত তার। এ কি হীনতা! একদিন সে দলপতিকে বললে, এ রকম পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে, আসুন, আমরা প্রকাশ্যভাবে সবাই মিলে আক্রমণ করি ওদের। যদি কিছু নাও করতে পারি, ওদের গুলি খেয়ে রাস্তায় ম'রে প'ড়ে থাকাও ঢের বেশি গৌরবজনক। তিনি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, ওয়েট, ইওর চান্স উইল কাম। কিন্তু কিছুতেই চান্স এল না তার। আরও তিন তিন বার লটারি হ'ল, কিন্তু কিছুতেই তার নাম উঠল না। পর পর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট মারা গেল মেদিনীপুরে, কিন্তু তার ভাগ্যে এক লুকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার সুযোগ এল না। কি গ্লানিকর এই লুকিয়ে থাকা! ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরের লোমহর্ষণ কাহিনী সব কানে আসছে, তবু লুকিয়ে থাকতে হবে নিজের প্রাণ-ভয়ে নয়, দলের খাতিরে! অসংখ্য নিরীহ লোক নির্য্যাতিত হচ্ছে, কিন্তু মুখ ফুটে সত্য কথা বলবার উপায় নেই। হিজলি ক্যাম্পে রাজবন্দীদের ওপর গুলি চলল—সন্তোষ মিত্তির, তারকেশ্বর সেন ম'রে গেল, তবু স্থির হয়ে থাকতে হবে। শুধু বাংলা দেশ নয়, অন্যত্রও অশান্তির আগুন জ্বলছিল। পশ্চিম-সীমান্তে আবদুল গাফ্ফার খাঁ এবং তাঁর খুদাই-খিদমৎকাররা পুলিসের বেড়াজালে ধরা প'ড়ে জেলে পচছিলেন। খাজনা দিতে অসমর্থ যুক্তপ্রদেশের চাষীরা কিষাণ-সভার নেতৃত্বে আবার নো-রেণ্ট-ক্যাম্পেন শুরু করতে উদ্যত হওয়ায় নিজেদের মান বাঁচাবার জন্যে কংগ্রেস সে ক্যাম্পেন শুরু করেছিলেন, কিন্তু গভর্মেণ্ট নূতন অর্ডিনেন্স ক'রে সব থামিয়ে দিলেন। সেখানেও দলে দলে লোক জেলে যাচ্ছে। হঠাৎ খবর এল, গোল-টেবিল-বৈঠক থেকে মহাত্মা গান্ধী শূন্যহস্তে বম্বেতে অবতরণ করেছেন যদিও, তবু মহাসমারোহ প'ড়ে গেছে সেখানে। জওহরলাল এবং সেরওয়ানি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ট্রেনেই পুলিস গ্রেপ্তার করেছে তাঁদের। দেশে যখন তুমুল ঝড় বইছে, তখনও ভস্ম মেখে দাড়ি-জটা প'রে রজতকে লুকিয়ে থাকতে হবে! খবর এল পুলিস আরও দুবার তার বাড়ি সার্চ করেছে, মাকে বউদিদিকে পর্য্যন্ত অপমান

করেছে নাকি! বাড়ি ফিরে যাবে কি না ভাবছিল, এমন সময় বড়লাটের সঙ্গে টেলিগ্রাম-চিঠিপত্র আদান-প্রদান ক'রে মহাত্মাজী আবার শুরু ক'রে দিলেন সত্যাগ্রহ-আন্দোলন। গভর্মেণ্ট এবার প্রস্তুতই ছিলেন। তাঁরাও কংগ্রেস সম্পর্কিত সব-কিছুকে ঘোষণা করলেন বে-আইনী ব'লে। পুলিসের আইন অমান্য ক'রে তবু কিন্তু শুরু হয়ে গেল পার্কে পার্কে মাঠে মাঠে সভা, বেরুতে লাগল বড় বড় শোভাযাত্রা পথে পথে। জওহরলাল নেহেরুর বৃদ্ধা জননী পুলিসের হাতে মার খেলেন এক শোভাযাত্রার নেত্রীরূপে, থামলেন না তবুও। শুরু হ'ল পিকেটিং, শুরু হ'ল বয়কট, উড়তে লাগল আবার ত্রিবর্ণ-পতাকা হাটে বাটে মাঠে, হর্ম্যে মন্দিরে কুটীরে, গাইতে লাগল সবাই স্বদেশী গান, তৈরি হতে লাগল নুন। কংগ্রেস-অধিবেশন দিল্লীতেই বসল, সভাপতি মদনমোহন মালবীয়কে গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও। চাঁদনি-চকের ক্লক-টাওয়ারের নীচে বসল, আমেদাবাদের রণছোড়দাস অমৃতলাল সভাপতিত্ব করলেন। পুলিস বাধা দিলে অবশ্য, কিন্তু কংগ্রেস-অধিবেশন বসল এবং কংগ্রেস তার পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষণা না ক'রে ছাড়ল না। ভ'রে উঠতে লাগল ভারতবর্ষের সমস্ত জেল। রজত যদিও গান্ধী-ভক্ত নয়, তাঁর গোল-টেবিল-বৈঠকে যাওয়া, তাঁর সমস্ত কার্ড টেবিলের ওপর রাখা, রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অহিংসা-মন্ত্র প্রচার, তাঁর প্রথমে ছলে-বলে-কৌশলে বামপন্থীদের ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা এবং পরে বেগতিক বুঝলেই অপটুভাবে তাদের অনুসরণ করা, তাঁর গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট, কথায় কথায় উপবাস, এর কোনটাই রজতের পছন্দ হ'ত না, তবু কিন্তু সত্যাগ্রহীদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। এক-একবার ইচ্ছে করতে লাগল, ছুটে গিয়ে ওদের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে পুলিসের মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়তে, পারলে না কেবল দলের খাতিরে। স্পোর্ট্‌স্‌ম্যান-লাইক হবে না ব'লে। অসীম কষ্ট সহ্য ক'রে অজ্ঞাত-বাসই সে করতে লাগল।...ম্যালেরিয়া ধরল, ডিসেণ্টি হ'ল, খাবার ঠিক নেই, শোবার জায়গা নেই, তবু কিন্তু আত্মপ্রকাশ করলে না সে। যত কষ্টই হোক, দলের আদেশ মানতে হবে। হঠাৎ একদিন দলের

একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও রজতকে চিনতে পেরেছিল সে। আড়ালে ডেকে বললে, পালাও, পালাও, বনে জঙ্গলে হিমালয়ে বর্ম্মায় যেখানে পার, পালাও শিগগির। আমাদের দলের কয়েকজন অ্যাপ্রুভার হয়েছে, আরও হবে। যে কজনের নাম করলে, তারা সবাই রজতের পরিচিত। এরা অ্যাপ্রুভার হয়েছে?...নির্ব্বাক হয়ে ব'সে রইল সে। মনে হ'ল, পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য আর কিছু নেই যেন...পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে। হঠাৎ ঠিক ক'রে ফেললে, যে দলে অ্যাপ্রুভার থাকে, সে দলের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না সে। সে দলের হুকুম মানবার প্রয়োজন নেই আর, স্পোর্টস্‌ম্যানদের সঙ্গেই স্পোর্টস্‌ম্যান-লাইক ব্যবহার করা চলে, বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে নয়। আর সে অজ্ঞাতবাস করবে না, আত্মপ্রকাশ করবে এবার। পুলিস যদি ধরে, ধরুক। এর মধ্যে বরং খানিকটা বীরত্ব আছে, লুকিয়ে থাকার মধ্যে নেই। জটা-দাড়ি খুলে ফেলে একটা পুকুরে নেবে ভাল ক'রে স্নান করলে সে। স্নান ক'রে উঠে ব্যাগ থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি বার ক'রে পরতে পরতেই কিন্তু কম্প দিয়ে জ্বর এল—ভীষণ কম্প। কিছুদূর গিয়েই আর চলতে পারলে না সে। রাস্তার ধারে একটা বাড়ির সামনে শুয়ে পড়ল চোখ বুজে, ব্যাগটা মাথায় দিয়ে। দিন দশেক পরে যখন চোখ খুললে, তখন দেখলে, রাস্তায় নয়, বিছানায় শুয়ে আছে সে এবং তার দিকে উৎসুক আগ্রহে চেয়ে আছে একজোড়া কালো চোখ। কাজল।

গ

কাজল বড় ভাল মেয়ে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে কেন্দ্র ক'রে যা ঘটল, তার জন্য দায়ী কেবল তার রূপ নয়, সে রূপের টীকাকার শিল্পী রজতও। রজতের মনে হ'ল, কাজলের চোখ শুধু কালো নয়, তার দৃষ্টিও ভাষা-ভরা। মনে হ'ল, ওর দেহ শুধু মাংস-মেদ-মহিমার সাবলীল প্রকাশই নয়, সে দেহের অঙ্গে

প্রত্যঙ্গে লেখা আছে আমন্ত্রণও। কাজল নিজে কিন্তু এ বিষয়ে সচেতন নয়। তার উৎসুখ চোখের দৃষ্টি যখন নীরব ভাষায় রজতকে বললে, এতদিন পরে তুমি এলে!—তখন জ্ঞাতসারে তার মনে এ রকম কোন ভাব জাগে নি। গৌরকান্তি প্রশস্তললাট রজতকে দেখে তার ভাল লেগেছিল অবশ্য, কিন্তু আর কিছু নয়। তার পীবর স্তনযুগল, কম্পিত করপল্লব, সুঠাম শ্রোণী, সন্নত দৃষ্টি, লজ্জারুণ কপোল, রক্তিম বিম্বাধর যখন নীরব ভাষায় আহ্বান করছিল রজতের পারুষ্যকে তখন জ্ঞাতসারে কিন্তু সে সঙ্কুচিত হচ্ছিল মনে মনে। ভাষার দ্বারা তো নয়ই, চিন্তাতেও সে রজতকে প্রণয়ী হিসাবে প্রশ্রয় দেয় নি। রজত কিন্তু মুগ্ধ হচ্ছিল। তার শিল্পী মন কাজলের কালো চোখের দৃষ্টিতে নিত্য নূতন ভাষা আবিষ্কার করছিল ক্ষণে ক্ষণে। কখনও মনে হচ্ছিল, সে দৃষ্টি যেন বলছে—ছি, ছি, কি ভীতু ভালমানুষ তুমি! আবার কখনও বলছে, ভয় কি তোমার? সে যখন মুখ ফিরিয়ে বাতায়ন-পথে চেয়ে থাকত রজতের মনে হ'ত, সে দৃষ্টি থেকে যেন অভিমান ক্ষরিত হচ্ছে; ক্ষণপরেই মৃদু হেসে যখন চাইত তার দিকে, মনে হ'ত, কালো-চোখের তারা থেকে উপচে-পড়া আলোর ঝলক যেন ব'লে গেল কানে কানে, ইস্, ভারি ব'য়ে গেছে আমার! আবদার অনুযোগ বিস্ময় প্রশ্ন অনুরাগ অভিমানের এমন ভাষাময় স্বচ্ছ প্রকাশ আর কারও চোখের দৃষ্টিতে রজত দেখে নি। এই দূর বিদেশে দুর্ব্বল দেহে হতাশ চিত্তে সে যখন লুটিয়ে পড়েছিল পথের ধূলায়, তখন, কি আশ্চর্য, যে রহস্যময়ী তাকে এমন ভাবে সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তুলেছে সে কুৎসিত নয়! তার দৃষ্টির অন্তরালে শিল্পী-কাম্য রহস্য লুকিয়ে আছে! যে আদর্শের জন্য সে জীবনপাত করেছে, বিশ্বাসঘাতকতার আগুনে তা যখন পুড়ে গেল দাউদাউ ক'রে, আত্মপ্রকাশ ক'রে পুলিসের কবলে পড়বার জন্যেই সে যখন প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছিল, তখন এ কি অপরূপ মধুর জগতে উত্তীর্ণ ক'রে দিলেন তাকে বিধাতা? যুবতী নারীর এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ইতিপূর্ব্বে সে আর আসে নি কখনও। যে জীবন সে এতকাল যাপন করেছে, তাতে আদি-রসের কোন স্থান ছিল না।...এখন হঠাৎ যেন অনুভব

করলে, বঞ্চিত হয়ে ছিলাম এতদিন। সে কেবল লক্ষ্যই করছিল, কোন প্রশ্ন করে নি। প্রশ্ন করবার সঙ্গত বিষয় একটা অন্তত ছিল। অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করতে পারত, বাড়িতে এক ঝি ছাড়া অন্য লোক নেই কেন, আর সবাই কোথায় গেল? দু চার জন যারা খোঁজ নিতে আসে, তারা পাড়া পড়শী, আসে আর চ'লে যায়। কিন্তু কিছুই জানবার সাহস হচ্ছিল না তার, মনে হচ্ছিল, জানতে পারলেই স্বপ্ন ভেঙে যাবে বোধ হয়।···

সুস্থ হয়ে উঠল যখন, তখন কাজলই একদিন প্রশ্ন করল তাকে।

আপনার বাড়ি কোথায়?

কলকাতা।

এই কথায় কাজলের চোখের দৃষ্টিতে যে আলো ঝলমল ক'রে উঠল, রজতের মনে হ'ল তার অর্থ—তাই এমন!

আপনার নাম কি?

রজত। শ্রীরজত-শুভ্র মুখোপাধ্যায়।

কাজলের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল আনন্দ। রজতের মনে হ'ল, সে দৃষ্টি যেন ব'লে উঠল, বেশ নামটি তো!

এখানে এসেছিলেন কেন?

তা বলব না।

কাজলের দৃষ্টির স্বচ্ছতায় নামল অভিমানের ছায়া।

রজত কোন প্রশ্নই করল না।

কেবল বললে, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। এইবার যাব ভাবছি।

চোখের দৃষ্টিতে সকরুণ মিনতি যে এমন মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে, তা রজতের কল্পনাতীত ছিল। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল সে।

কাজল মুখে বললে, এর মধ্যেই যাবেন কেন? আর একটু সেরে উঠুন, তারপর যাবেন। এখনও তো দুর্ব্বল আছেন।

রজত থেকে গেল। 'আপনি' 'তুমি'তে পর্য্যবসিত হ'ল ক্রমশ এবং

কয়েকদিন পরে যে কাণ্ড সে ক'রে বসল তা ভদ্র ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তার নিজের কাছে এর একটা সঙ্গত জবাবদিহি ছিল অবশ্য এবং এক কাজল ছাড়া আর কারও কাছে জবাবদিহি করতে সে প্রস্তুতও ছিল না। তার ভরসা ছিল, কাজল তাকে ক্ষমা করবে। প্রথমে কাজল বাধা দিয়েছিল একটু, কিন্তু সেটা খুব প্রবল ব'লে মনে হয় নি রজতের। ঘটনাটা ঘ'টে যাবার পরও কাজলের যে দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিল, তা, রজতের মনে হ'ল, ঘৃণার নয় আনন্দের। কাজল মুখে কিন্তু বললে, এ কি করলেন আপনি ?

তুমি সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ডাকছিলে আমাকে, সাড়া না দিয়ে পারলাম না।

আমি ডাকছিলাম ?

দৃপ্ত কণ্ঠে তর্জ্জন ক'রে উঠল সে। যে চোখ দুটি হাসছিল ব'লে রজতের মনে হয়েছিল, তাতে দপ ক'রে যেন আগুন জ্ব'লে উঠল।

রাগ ক'রো না। আমি তোমাকে চাই, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তোমার জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিতেও প্রস্তুত আছি আমি।

আমি কে কোন্ জাত কিছুই জানেন না, দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছেন ?

আছি।

আমি যদি বিবাহিত হই ?

তোমার মাথায় সিঁদুর তো নেই !

সব জাত সিঁদুর পরে না।

তা হ'লেও ছিনিয়ে নিয়ে যাব, তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

আর আপত্তি থাকে যদি ?

তা হ'লে জোর করব না, আর যা করেছি তার জন্যে যদি শাস্তি দিতে চাও, নিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত।

মৃত্যুদণ্ড চাইলেও দেব কি ক'রে! আপনার গায়ে যা অসুরের মত জোর!

তার ব্যাগটা ঘরের কোণেই রাখা ছিল। উঠে গিয়ে রজত তার থেকে রিভলভারটা বার ক'রে এনে বললে, এই নাও, লোডেড আছে।

বিস্ময় ফুটে উঠল কাজলের চোখে। মুখে বললে, খুব হয়েছে, রেখে দিন।

দু দিন পরেই কাজলের বাবা ফিরে এসে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর মাতৃহারা মেয়েটিকে ঝিয়ের জিম্মায় রেখে তারই পাত্রের সন্ধানে বঙ্গদেশে গিয়েছিলেন ছুটি নিয়ে। পাত্র যোগাড় হয় নি, কারণ গরিব লোক ছিলেন তিনি। আত্মীয়স্বজনও বিশেষ কেউ ছিল না। কাজলই তাঁর একমাত্র সন্তান। নিজেই মানুষ করেছিলেন মা-হারা মেয়েকে। বিয়ে না দিয়ে মেয়েকে বড় বয়স পর্য্যন্ত ঘরে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, এই অপরাধে পাড়ার লোকেরাও কেউ বিশেষ সদয় ছিলেন না তাঁর উপর। তাই তাঁর অবর্ত্তমানে কাজল যখন একটা অজ্ঞাতকুলশীল অজ্ঞান যুবককে ঘরে টেনে তুললে, তখন পাড়ার লোক তাকে মানা তো করলেই না, ভবিষ্যৎ সান্ধ্য-আড্ডার খোরাক-সংগ্রহমানসে ভাবে ভঙ্গীতে উৎসাহই দিতে লাগল বরং।

প্রায় বছর দেড়েক অজ্ঞাতবাসের পর কাজলকে নিয়ে সে যখন কলকাতায় ফিরল, তখন মহাত্মা গান্ধী আবার উপবাস শুরু করেছেন অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যাপার নিয়ে। মালবীয়জীর অনুরোধে হিন্দুনেতারা হৈ-হৈ করছেন তাঁকে ঘিরে পুণা জেলে। সত্যাগ্রহের উত্তেজনা মিইয়ে গেছেঁ, সমস্ত উত্তেজনা মহাত্মাজীকে ঘিরে। গভর্মেণ্ট কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অন্যান্য দলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শুরু করেছেন দেশের ঘাড়ে নূতন কনস্টিট্যুশন চাপাবার জন্যে, নরম-মেজাজের নেতাদের নিয়ে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকও বসবে নাকি আবার! বাংলা দেশের পুলিস নব নব অর্ডিনেন্সের বলে বলীয়ান হয়ে ডগলাস এবং এলিসন হত্যার প্রতিশোধ তুলছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, চব্বিশপরগণার ঘরে ঘরে। বিপ্লবীদের কেউ জেলে, কেউ ফাঁসি গেছে, কেউ অ্যাপ্রুভার হয়েছে।

রজত কাজলকে নিয়ে একটা হোটেলে এসে উঠল। বাড়িতে স্থান পাবে কি না সন্দেহ ছিল। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল একটা চাকরির। হাতে

একটি পয়সা ছিল না। কিন্তু চেষ্টা করলেই চাকরি পাওয়া যায় না। দিনের পর দিন সে ঘুরে বেড়াতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়, কাজলকে হোটেলের ঘরে একা বসিয়ে রেখে। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে পার্কে এসে বিশ্রাম করত। তেষ্টা পেলে জল খেত রাস্তার কল থেকে। হঠাৎ একদিন শঙ্খ-শুভ্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। শঙ্খ দেখতে পায় নি, রজতই ডাকলে তাকে। ডেকেই কিন্তু মনে হ'ল, ভুল করেছি।

কালো-রঙ, খোঁচা-খোঁচা-গোঁফ-দাড়ি, উস্‌কো-খুস্‌কো-চুল এই লোকটাই যে রজত, তা পরিচয় না দিলে শঙ্খ চিনতেই পারত না।

সমস্ত শুনে বললে, কি হয়েছে তাতে? বাড়ি চল্।

বাবা যদি তাড়িয়ে দেন?

রজতের ভীত কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে গেল শঙ্খ। সেই রজত কি হয়ে গেছে!

আচ্ছা, আমি বলব বাবাকে। তোর ঠিকানাটা কি?

সহসা সাবেক রজত আত্মপ্রকাশ করল যেন।

ঠিকানা দিচ্ছি। আমার জন্যে অনুরোধ করতে হবে না কাউকে।

• গর্জ্জন ক'রে উঠল যেন।

শঙ্খ বললে, অনুরোধ করব না। খবরটা দেব খালি।

ঠিকানা নিয়ে শঙ্খ চ'লে গেল। রজত চেয়ে রইল নিখুঁত সাহেবিস্যুট-পরা শঙ্খর দিকে। তারই দাদা!

শঙ্খ খবরটা তনিমাকেই বলেছিল প্রথমে। বাবাকে বলতে তারও সাহস হয় নি। সব শুনে তনিমা খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল, তারপর মুচকি হাসল একটু।

সমস্ত ব্যাপারটা তুমি যদি আমার হাতে ছেড়ে দাও, তা হ'লে আমি সব ঠিক ক'রে দিতে পারি। তুমি কিন্তু কাউকে একটি কথা বলতে পারবে না।

বেশ।

তনিমা বাসন্তীকে গিয়ে বললে, মা, আমার এক বন্ধুর মুখে আজ শুনলাম, ঠাকুরপো নাকি পছন্দ ক'রে বিয়ে করেছে কাজল ব'লে এক মেয়েকে।

উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল বাসন্তী।

কোথায়?

তা সে ঠিক জানে না। খবর নিতে বলেছি।

কে বন্ধু তোমার?

আপনি চেনেন না তাদের। চট্টগ্রাম বাড়ি। ঠাকুরপোর সঙ্গে খুব আলাপ। আমি যখন সকালবেলায় বেরিয়েছিলাম, তখন দেখা হ'ল তার সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায়।

বাসন্তী খবর দিলেন শশাঙ্ক-শুভ্রকে। শশাঙ্ক মুখে যদিও বললেন—মরুকগে, মনে মনে কিন্তু তিনিও কম উৎসুক হলেন না।

দু দিন তনিমা চুপ ক'রে রইল।

তৃতীয় দিন বাসন্তী আবার জিজ্ঞেস করলেন, রজতের কোনও খবর পেলে?

এখনও পাই নি।

ঘণ্টা দুই পরে শশাঙ্ক আবার প্রশ্ন করলেন এবং সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

তুমি ভাল ক'রে খোঁজ কর আজই। গাড়িটা নিয়ে যাও না হয় তাদের বাড়ি।

তনিমা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং ফিরে এসে বললে, শুনলাম, কাল তারা কলকাতায় আসছে। এসে বউবাজারের একটা হোটেলে উঠবে।

হোটেলে?—প্রশ্ন করলেন শশাঙ্ক-শুভ্র।

তাই তো শুনলাম।

ঠিকানা এনেছ?

এনেছি।

সইয়ে সইয়ে খবরটা বলাতে ফল হয়েছিল। তনিমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল শঙ্খ।

তার পরদিন যখন চেনা 'মিনার্ভা'-গাড়িখানা হংস-শুভ্র, শশাঙ্ক-শুভ্র, বাসন্তী এবং তনিমাকে নিয়ে বউবাজারের গলিতে সেই হোটেলের সামনে হর্ন দিয়ে দাঁড়াল, তখন রজতের যেন মাথা কাটা গেল। দয়াপরবশ হয়ে অনুগ্রহ করতে এসেছেন সবাই! আর, কি লজ্জা!

সামনাসামনি হতেই সে ব'লে উঠল, কেন এসেছ তোমরা? আমি যাব না।

যাবি না কেন?—বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলের অবস্থা দেখে চোখ ফেটে জল আসছিল তাঁর।

যে সর্ব্বনাশকে আমি স্বেচ্ছায় জীবনের সাথী করেছি, তার সঙ্গে তোমাদের জড়াব কেন?

প্রদীপ্ত হয়ে উঠল হংস-শুভ্রের চোখ দুটো।

তোমার মত লোকের সঙ্গে বাস করবার ইচ্ছে আমাদেরও নেই। তোমার পূর্ব্বপুরুষ তোমার জন্যে যে সম্পত্তি রেখে গেছেন, তার ভার ব'য়ে বেড়াবার দায়িত্বও আমরা নিতে রাজি নই। এই নাও।

বিশ হাজার টাকার চেকখানা তিনি লিখেই এনেছিলেন।

এই টাকাটা তোমার অংশে জমা আছে। তোমার বাকী সম্পত্তির হিসেব তুমি গিয়ে বুঝে নিও একদিন—ওর হাঙ্গামা পোয়াতে আমি পারব না। আমি চললুম।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর রজতের চোখে পড়ল, মা কাঁদছেন, বাবা অস্বাভাবিক রকম চুপ ক'রে আছেন।

তনিমা বললে, আজ্কের মত চল অন্তত ঠাকুরপো।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রজত বললে, বেশ, চল।

তারপর কাজলের দিকে ফিরে বললে, মাকে, বাবাকে, বউদিকে প্রণাম কর। দাদু সত্যিই চ'লে গেলেন নাকি?

বেরিয়ে গিয়ে দেখে এল, তিনি সত্যিই চ'লে গেছেন। গাড়িটা তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষা করছে।

কাজল কলকাতায় এসে থেকে অসম্ভব রকম নীরব হয়ে গিয়েছিল, তার দৃষ্টির সে মুখরতাও আর ছিল না যেন। দৃষ্টিতে মূর্ত্ত হয়ে ছিল খালি ভয়। তার জীবনে ঝঞ্ঝার মত এসে এই লোকটি কোন্ অনিশ্চিত পরিণামের দিকে যে তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, তার কোনও আভাসই সে পাচ্ছিল না। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ব'লেই নীরব হয়ে ছিল। বিয়ের আগে রজতের সমস্ত ইতিহাস শুনেছিল সে। শ্বশুরকে সব কথা না বললেও তার কাছে রজত কিছুই গোপন রাখে নি। রজতের শেষ কথাগুলো সব সময়েই যেন কানে বাজত তার—আমার মত খামখেয়ালী লোকের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন জড়াবার আগে একটা কথা জেনে রাখা ভাল। নীরবে যদি আমার অনুসরণ করতে না পার, দুঃখ পাবে। অনুসরণ করলেও যে দুঃখ ছাড়া আর কিছু পাবে, তার ভরসা নেই। কিন্তু বাদ-প্রতিবাদ করলে সে দুঃখ আরও গ্লানিকর হয়ে উঠবে। আমি তোমাকে পেলে কৃতার্থ হয়ে যাব, কিন্তু তোমার দিকটা তুমি ভেবে দেখ ভাল ক'রে।

নারীমাত্রেই পুরুষের মধ্যে যে বীরকে পূজা করতে চায়, যে আত্মভোলা সর্ব্বশক্তিমানকে বাঁধতে চায় মায়ার বন্ধনে, রজতের মধ্যে সেই দুর্জ্জয়কে প্রত্যক্ষ ক'রে কাজল মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার সেদিনকার দুষ্কৃতিটাকেও আর দুষ্কৃতি ব'লে মনে হচ্ছিল না তার। বরং এই দুরন্ত পুরুষ যে তার তুচ্ছ দেহটার মোহে ক্ষণিকের জন্যও অভিভূত হয়েছিল, এজন্য একটা সূক্ষ্ম গর্ব্বই জাগছিল তার মনে। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের সেই লাইনটা—"যে পথিক পথের ভুলে, এল মোর প্রাণের কূলে, পাছে তার ভুল ভেঙে যায়—"

মৃদুকণ্ঠে সে উত্তর দিয়েছিল, আমি কোন প্রতিবাদ করব না।

তাই কোন প্রতিবাদ সে করে নি, কেবল অনুসরণ করছিল।

দেখতে দেখতে কয়েক বছর কেটে গেল।

দুই না তিন, তা-ও রজতের খেয়াল রইল না। আলাদা একটা বাড়িতে কাজলকে নিয়ে তন্ময় হয়ে রইল সে। তার কত পোজের যে ছবি আঁকলে, তার আর ইয়ত্তা নেই। উচ্ছ্বসিত বাসন্তী এসে একদিন খবর দিয়ে গেল, শঙ্খর ছেলে হয়েছে। দেখতে যাবার জন্যে পেড়াপিড়ি করল। অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু হয়ে ওঠে নি আজও। কিছুই মনে থাকে না, কিছুই ভাল লাগে না আর। এমন কি কাজলও ফুরিয়ে গেছ যেন। আবার দেশের কাজে নামলে কেমন হয়? মনটা আবার উন্মুখ হয়ে উঠল।…পিওন চিঠি দিয়ে গেল দুখানা। দুটোই অপ্রত্যাশিত। একটা হীরকের, আর একটা সোম-শুভ্রের অ্যাটনির। হীরকের দীর্ঘ চিঠি। ধীরে সুস্থে পরে পড়া যাবে। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অ্যাটনির চিঠিটা পড়তে লাগল রজত। সোম-শুভ্রের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি সোম-শুভ্রের উইলের কপি পাঠিয়েছেন। শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক, শঙ্খ, রজত, হীরক, শক্তি, মুক্তা, নবনী, পরমানন্দ প্রত্যেককে তিনি নগদ এক লাখ টাকা ক'রে দিয়েছেন। এক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা করেছেন শিক্ষিতা অবিবাহিতা দরিদ্র হিন্দু কুমারীদের সৎপথে থেকে অর্থোপার্জ্জনে সহায়তা করবার জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর ।শব-শুভ্রের বংশের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠতম জীবিত থাকবেন, তিনিই ভবিষ্যতে এ বিষয়ে উপযুক্ত পাত্রী নির্ব্বাচন করবেন। এই এক লাখ টাকার সুদ প্রতি বছরে একজন ক'রে পাবেন। এ বছরে পাবেন ইলা দেবী। আর এক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকবে তাঁর 'বৈজ্ঞানিক কল্পনা' নামক পুস্তিকার মুদ্রণ ও প্রচারের জন্য। বাকী আঠারো লক্ষ টাকা তিনি সমানভাবে দান ক'রে গেছেন তাঁর স্থাপিত স্কুল ও হাসপাতালে। তাঁর বিহারের জমি তিনি দান করেছেন তাঁর জনমজুরদের। দীর্ঘ তালিকা রয়েছে তাদের নামের। সোম-শুভ্রের পরিচয় পেয়ে রজত বিস্মিত হ'ল এবং মুগ্ধও হ'ল।…

আবার মনে হ'ল, এই এক লাখ টাকা নিয়ে দেশের কাজে নামলে কেমন হয়! কিন্তু তখনই মনে হ'ল, করবার কি আছে! সুভাষ বোস চিকিৎসার

জন্তে ইউরোপে, বিটলভাই প্যাটেল, যতীন সেনগুপ্ত মারা গেছেন। জ্যাকসনকে মারতে গিয়ে বীণা দাস ধরা পড়েছে। সত্যাগ্রহের শিখা নির্ব্বাপিত। তবু ইচ্ছে করতে লাগল, দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আবার নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে। কিন্তু কাকে নিয়ে কি করবে! পুরানো দল ভেঙে গেছে, নূতন দলের কাউকে চেনে না সে। ইন্দু-শুভ্রা সম্পর্ক ত্যাগ করেছে, একটা কথা পর্য্যন্ত বলে না আজকাল। পুলিস পর্য্যন্ত স্পর্শ করল না তাকে। মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে ভাবে, কেন করল না? হংস-শুভ্র গোপনে গোপনে যে তার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা সে জানত না। হঠাৎ আবার মনে হ'ল, কাজল ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু কাজলের দায়িত্ব তো ফুরোয় নি।

কই, কোথায় আছ তুমি?

এই যে।—পাশের ঘর থেকে কাজল উত্তর দিলে।

তোমার সেই বেদেনীর পোশাকটা প'রে এস তো, আর একটা ছবি আঁকি।

একটু পরেই কাজল হাসিমুখে এসে 'পোজ' দিয়ে দাঁড়াল।...

'পোজ' দিয়ে দাঁড়িয়েই রইল অনেকক্ষণ।

রজত তার দিকে ফিরেও চাইল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতহস্তে তুলি চালিয়ে ছবি আঁকছিল একটা। হঠাৎ কাজলের নজরে পড়ল, তার ছবি নয়। বিরাট একখানা ছোরা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে ক্যান্‌ভাসের উপর, ছোরাটা বিদ্ধ করেছে প্রকাণ্ড একটা হৃদ্‌পিণ্ডকে, ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটছে।...

সাত

হীরক-শুভ্র

হীরক-শুভ্র রজতকে জেল থেকে যে চিঠি লিখেছিল, তা এই—

শ্রীচরণেষু,

মেজদা, অনেকদিন তোমার কোন খবর পাই নি। বাড়ির সবাই আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে, এক তুমি ছাড়া। তুমি অবশ্য কোনকালেই কলমের কারবার কর না, তুলিই তোমার মনের বাহন, একটা ছবি এঁকে পাঠালেও তো পার। সেদিন বউদিদির চিঠিতে জানলাম, তুমি বিয়ে করেছ। খবরটা আনন্দজনক হওয়া উচিত, নতুন বউদিদিকে দেখবার একটা কৌতূহলও যে না হচ্ছে তা নয়, কিন্তু তোমার মতন তেজী লোক যে বিয়ে ক'রে অবশেষে নীড় আশ্রয় করবে, এটা ঠিক আশা করি নি। যদিও তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল না, তবু তোমার কাছে প্রকাণ্ড কিছু একটা আশা করেছিলাম আমি। তুমি বিয়ে করেছ, এ খবর পেয়েও সে আশা ত্যাগ করি নি এখনও। যেসব খবরের কাগজ আমরা পড়তে পাই, প্রতিদিনই সেগুলোর পাতা ওলটাই তোমার নাম কোথাও দেখতে পাব ব'লে। তোমার মতন একটা উদ্দাম প্রকৃতি যে চুপচাপ থাকবে, এ কথা ভাবতেই পারি না। তোমার অসহিষ্ণু স্বভাবের জন্যে আমার কথা তোমাকে ভাল ক'রে বোঝাতেই পারি নি কোন-দিন। তুমি কোনদিনই ধৈর্য্য ধ'রে শেষ পর্য্যন্ত আমার কথা শোন নি। চাষী-মজুরদের নামোচ্চারণ করবামাত্র তুমি ক্ষেপে উঠেছ এবং আমাকে থেমে যেতে হয়েছে। দাদাকে আমি কোনদিন বোঝাবার চেষ্টা করি নি, কারণ তিনি আলাদা জাতের লোক। বোঝালে তিনি বুঝবেন, সায়ও দেবেন হয়তো, কিন্তু কর্ম্মী হিসেবে কিছুতেই ধরা দেবেন না। ওঁরা স্বপ্ন-সম্বল লোক। তোমার ওপর কিন্তু আমার আশা ছিল এবং এখনও আছে। তাই মনে

করেছি, আজ ভাল ক'রে আমার কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলব। চিঠিতে বলার একটা সুবিধে—ধমক দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিতে পারবে না। যে আদর্শকে আঁকড়ে ধ'রে আমি জীবনের আর সব-কিছু বিসর্জ্জন দিয়েছি, সে আদর্শে অনুপ্রাণিত না হও, তার মর্ম্মটা অন্তত বোঝবার চেষ্টা কর, এ দাবিটুকু কি আমি করতে পারি না? বাবা মা দাদু যে ভাষায় আমাকে চিঠি লেখেন, তা অনুকম্পার ভাষা। তাঁরা মনে করেন, নির্ব্বোধ আমি একটা বাজে হুজুগে মেতে বিপন্ন হয়েছি। আমার আদর্শের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা দেখি না তাঁদের চিঠিতে। তাঁদের সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা যেন-তেন-প্রকারেণ আমাকে জেলের পাঁচিলের বাইরে নিয়ে গিয়ে ক্যাপিটালিস্ট সমাজের ভাল ছেলে ক'রে তোলবার। এর জন্যে তাঁদের সুপারিশ-তদ্বিরের অন্ত নেই। দাদু, শুনেছি, এর জন্যে অনেক টাকাও নাকি খরচ করছেন স্থানে-অস্থানে। আমার আদর্শ-নিষ্ঠার এই কি পুরস্কার? আমার সবচেয়ে কষ্ট হয় ছোটপিসীর চিঠি প'ড়ে। আমি ভারতবর্ষের লোক হয়ে রাশিয়া নিয়ে মেতেছি, এ নিয়ে তাঁর শানিত মন্তব্যগুলি ছুঁচের মত বেঁধে। আমি রাশিয়া নিয়ে মাতি নি, আমি একটা আদর্শ নিয়ে মেতেছি—এ কথা কেন যে তিনি বোঝেন না, জানি না। আজ যদি রাশিয়া তার মহৎ আদর্শকে ত্যাগ করে, তা হ'লে রাশিয়ার সঙ্গেও আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। রাশিয়া এই আদর্শকে মূর্ত্ত করেছে ব'লেই রাশিয়ার ওপর আমার ভক্তি। ছোটপিসী আমার মনের কথা বোঝেন না, তার কারণ তিনি ভিন্ন পথের পথিক।

ছোটদাদুর সঙ্গেও ভাব করেছি আমি। ছোটদাদুও আদর্শবাদী লোক। কিন্তু কমিউনিজ্‌মের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা থাকলে, আস্থা নেই। তাঁর বিশ্বাস—বৈষম্যই প্রকৃতির নিয়ম এবং প্রকৃতিই ছলে-বলে-কৌশলে সাম্যবাদ-প্রচেষ্টাকে বিফল ক'রে দেবে বার বার। কিন্তু তাই ব'লে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকব আমরা? আশ্চর্য্য যুক্তি তাঁর! তা ছাড়া তিনি কেমন যেন সন্দেহবাদী হয়ে উঠেছেন। লিখেছেন, "ইংরেজেরা এদেশে যখন আসে,

তখন আমরা সবাই ইংরেজ-গুণ-গানে যেসব কথা বলেছিলাম, তা সেকালের সংবাদপত্রগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে এখনও। মিলিয়ে দেখো তোমাদের কমিউনিজ্‌ম-গুণ-গান সেগুলোর সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যাবে। ইংরেজদের সম্বন্ধে ভুল যখন ভেঙেছে, তখন আবার একটা নতুন ফাঁদে পা দেওয়াটা কি খুব সমীচীন?" এ লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। ওঁদের সকলের সম্বন্ধেই একটা কথা ভেবে আমি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করি। ওঁরা সমস্ত বুঝেও এসব কথা বলছেন আত্মরক্ষার জন্যে। জ্ঞাতসারে না হ'লেও অজ্ঞাতসারে এই প্রকৃতিই ওঁদের মর্ম্মমূলে রয়েছে। পৃথিবীর যে নব-জাগরণ আসন্ন, তার যৌক্তিকতা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করলে যে শোষণ-যন্ত্রের ওঁরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অসম্ভব হয়। নিজেদের স্বার্থের জন্যই মানব-সমাজের বৃহত্তর আদর্শকে মনে মনে স্বীকার করলেও মুখে মানবার সাহস নেই ওঁদের। কিন্তু তোমারও কি নেই? তোমার সাহসের অভাব আমি কল্পনাই করতে পারি না। তোমাকে সুবিধাবাদী ব'লে ভাবতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমার মনে হয়, নিজের খেয়ালে মত্ত আছ ব'লে এ দিকটা ভাল ক'রে ভেবেই দেখ নি তুমি। অভিজাতসুলভ ঔদাসীন্যে ভুলে আছ সব। কিন্তু আজ তোমাকে আমার কথা শুনতেই হবে। একটা কথা জান? শুনলে হয়তো আশ্চর্য্য হয়ে যাবে—আমার মনে এর বীজ তুমিই বপন করেছিলে একদিন। আমাদের ছট্টু ব'লে একটা চাকর ছিল, মনে আছে তোমার? বেচারা দু টাকা মাত্র মাইনে পেত, খেত আমাদের পাতের এঁটো-কাঁটা কুড়িয়ে। সশঙ্কিত হয়ে থাকত বেচারা। কি একটা সামান্য অপরাধে তাকে হাণ্টার দিয়ে খুব মেরেছিলে তুমি। আমি ভাবলাম, আর বুঝি আসবেই না। কিন্তু বিকেলে দেখলাম, ঠিক এসেছে এবং ক্রমাগত চেষ্টা করছে তোমার মন যুগিয়ে চলবার। ধনীর হাতে দরিদ্রের শোচনীয় অপমানের চিত্রটা গভীর রঙে তুমিই এঁকে দিয়েছিলে সেদিন আমার মনে। সেই দিনই আমি ঠিক করেছিলাম যে, যদিও আমি ধনীর ঘরে জন্মেছি, তবু গরিবদের দিকেই থাকতে

হবে আমাকে, আর কিছুর জন্যে না হোক, আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্যে। আমরা বড়লোক ব'লে অপরিসীম লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়েছিল যেন সেদিন আমার। টল্‌স্টয়, মার্ক্‌স, লেনিন, স্টালিন অনেক পরে পড়েছি—মিলের কুলীদের সংস্পর্শে এসেছি তারও অনেক পরে।

কমিউনিজ্‌মের মূল কথাটা নিয়েই আলোচনা করব তোমার সঙ্গে। যারা এর মুখোশ প'রে নিজেদের নানা কাজ হাঁসিল ক'রে বেড়াচ্ছে, তাদের বিষয় আমার আলোচ্য নয়। তাদের উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রে অনেক লোক কমিউনিজ্‌মকে গাল দেয় শুনেছি। কমিউনিজ্‌মকে গাল না দিয়ে তাদের গাল দিলেই ভাল হয়। টিকি-তিলক-নামাবলীধারী ভণ্ডকে দেখে হিন্দুধর্ম্মের বিচার করা ঠিক নয়। কমিউনিজ্‌মের কথা আলোচনা করবার সময় একটা কথা মনে রাখা উচিত। ফলের থেকে বীজ এবং বীজের থেকে অঙ্কুরের আবির্ভাব যেমন অনিবার্য্য, মানবের ইতিহাসে ফিউডালিজ্‌ম থেকে ক্যাপিটালিজ্‌ম এবং ক্যাপিটালিজ্‌ম থেকে কমিউনিজ্‌মও তেমনই অনিবার্য্য। নির্য্যাতিতদের দুঃখে বিচলিত হয়ে জনকতক উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব্যক্তি নিছক বক্তৃতার চোটে এতবড় ব্যাপারটাকে সম্ভবপর ক'রে তুলেছে, এ কথা যারা ভাবে, তারা ভুল ভাবে। রাত্রির পর যেমন দিন আসে, ক্যাপিটালিজ্‌মের পর শ্রমিকদের অভ্যুত্থান তেমনই অতিশয় স্বাভাবিক ব্যাপার একটা। মানব-সভ্যতার যাবতীয় কীর্ত্তির সমস্ত সম্মান যাদের প্রাপ্য, তাদের বঞ্চিত ক'রে জনকতক অলস ধনী কতদিন আর ভোগ করবে এই বসুন্ধরাকে? যারা কর্ম্মী, যারা বীর, তারা এইবার জেগেছে, ভীরু প্রবঞ্চকদের স'রে পড়বার সময় হ'ল এবার। নির্য্যাতিতেরা চিরদিন অত্যাচার সইতে পারে না। অত্যাচারীর চাবুকই মরিয়া ক'রে তোলে তাদের একদিন। সেদিন এসেছে এবং সে কথা প্রসন্ন চিত্তে স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভাল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোহ ত্যাগ করতে হবে এবং যারা ত্যাগ করতে রাজি নয়, তাদের জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে মোহ-মুদ্গরের। তোমাকেই করতে হবে, তুমি যদি এর যৌক্তিকতা স্বীকার কর।

সামাজিক মানুষ হিসেবে তা হ'লে তুমি এর সহযোগিতা না ক'রে পারবে না।

একদল সূক্ষ্ম তার্কিক আছেন, তাঁরা বলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকলে জীবনে আর সুখ কি, সমাজের সঙ্গে প্রাণের নিগূঢ় যোগই বা কোথায়? বারোয়ারিতলায়, ওয়েটিং-রুমে বা ধর্ম্মশালায় বাস ক'রে কি আমরা শান্তি পাব? মানুষ যে কিসে শান্তি পায় আর কিসে পায় না, তা জানি না। একটা কথা কিন্তু জানি। যুগে যুগে মানুষ সমাজের হিতার্থে নূতন নূতন নিয়ম করেছে এবং সে নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে কালক্রমে শান্তিও পেয়েছে। সবাই হয়তো পায় নি, কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে পেয়েছে, তা মানতেই হবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মানব-সমাজে একদিন বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। যে কোনও পুরুষ নিছক গায়ের জোরে যে কোনও নারীর দেহ দাবি করতে পারত। বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হওয়াতে কতকগুলি পুরুষের দুঃখের কারণ ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিবাহ-প্রথাকে মেনে নিয়ে আমরা কি খুব অশান্তিতে আছি? বিবাহ-প্রথারও আবার নানা রকম চেহারা ছিল। Group marriage ছিল, বহু-বিবাহ ছিল। এখন সভ্যসমাজ থেকে সেসব উঠে গেছে। বহুপত্নীর মালিক হবার সাধ যাঁর, তাঁর হয়তো অসুবিধা হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে এক-পত্নীক জীবনে সন্তুষ্ট আছেন, তা অস্বীকার করি কি ক'রে? কমিউনিস্টরা এখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক ভালবাসার বন্ধন ছাড়া অন্য কোন বন্ধন স্বীকার করতে চায় না, বাইরের মিথ্যা আইনের হাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়ে তারা অন্তরের সত্য আইনকে আশ্রয় করেছে। যাঁরা বিবাহ-আইনের নাগপাশে বেঁধে দাম্পত্য-জীবনকে রক্ষা করবার পক্ষপাতী, তাঁদের হয়তো রাগ হবে, কিন্তু যতদূর শুনেছি, অধিকাংশ লোকই সুখে আছে সেখানে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্বন্ধেও ওই কথা। কতকগুলো স্বার্থপর লোকের কষ্ট হবে হয়তো, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে সুখেও থাকবে অনেকে। বিচিত্র মানুষের মন। সবই সে সহ্য ক'রে নেয় কালক্রমে। শুধু তাই নয়, কোন একটা নিয়ম সে বেশিদিন-

মানতেই চায় না। পুরাতন শৃঙ্খল ভেঙে নূতন শৃঙ্খল পরবার জন্যে সে সতত উন্মুখ। এরই নাম হয়তো আধুনিকতা। আধুনিকতার দাবি যদি না মানতে চাও, 'ফসিলে'র দলভুক্ত হতে হবে তোমাকে। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, কমিউনিজ্‌ম সমাজের যে ব্যবস্থা করতে চাইছে, অধিকাংশ লোকের পক্ষে তা ভাল, না মন্দ? রাশিয়ার দিকে চাইলেই এর উত্তর পাবে। সেখানে বেকার লোক নেই, অলস লোকের স্থান নেই, বংশ বা অর্থগত জাতিভেদ নেই। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তারা এই ক বছরের মধ্যে যা করেছে, তা বিস্ময়কর। যেসব সমালোচক আরাম-কেদারায় ব'সে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে তাদের নানারকম ভুলভ্রান্তি প্রদর্শন করেন, একটা কথা ভুলে যান তাঁরা। কাজ করতে গেলেই ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব, অলস লোক ক্বচিৎ ভুল করে, মরা লোকে একেবারেই করে না। ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও তারা যা করেছে, তার কিছু আভাস রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'তে পাবে, অন্য কোন বই যদি হাতের কাছে না-ও পাও।

বর্ত্তমান সভ্যসমাজে 'ডিমক্র্যাসি' নামে যা প্রচলিত, আসলে তা পুরাতন রাজতন্ত্রেরই নব-রূপ। নূতন রাজাটির নাম 'টাকা'। ডিমসের মাথা বিকিয়ে আছে এই টাকার পায়ে। মাথা বিকিয়ে দিয়েও কিন্তু তাদের স্বস্তি নেই। ইংলণ্ডের মত সভ্যদেশেও বেকার-সমস্যা ঘোচে নি, এখনও সেখানে লোকে পেটের দায়ে টেম্‌সের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এখনও সেখানে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি হয়, এখনও সেখানকার ভ্রূণহত্যা শিশুহত্যার তালিকা আতঙ্কজনক। অধিকাংশ লোকের সুখ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের শ্বাসরোধ ক'রে কয়েকজন পুঁজিবাদী যেখানে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, সেইখানেই এই অবস্থা। আমাদের বিদ্রোহ এই ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরুদ্ধে।

তুমি হয়তো বলবে, কেন, ফ্যাসিজ্‌ম তো বেকার-সমস্যা সমাধান করেছে। সেখানেও কি আধুনিক পদ্ধতিতে মানব-সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে না? আপাত-দৃষ্টিতে হচ্ছে হয়তো, এবং যেটুকু হচ্ছে তা সম্ভবত সোশ্যালিজ্‌মের

কল্যাণেই হচ্ছে। কারণ এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ফ্যাসিজ্‌ম সোশ্যালিজ্‌মেরই পরিবর্তিত বক্র-রূপ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ও জিনিস টিকবে না। ওটা ক্যাপিটালিস্টদের আত্মরক্ষার প্রয়াস, এবং আমার মনে হয়, শেষ পর্য্যন্ত তা ব্যর্থ-প্রয়াস হবে। টবে কখনও অশ্বত্থগাছ হয় না। হয় সে ম'রে যাবে, না হয় টবকে বিদীর্ণ ক'রে সনাতন মাটিতে শিকড় চালাবে সে। অশ্বত্থগাছের সম্বন্ধে চিন্তা নেই, কর্ম্মীরা নিজেদের শক্তির সম্বন্ধে একবার যখন সচেতন হয়েছে তখন তাদের থামাতে পারবে না কেউ—ওর ক্যাপিটালিস্টিক খোলসটাই যথাসময়ে খ'সে যাবে আশা করি।

আমার কল্পনায় যতটুকু কুলিয়েছে আমি ভেবে দেখেছি, ভবিষ্যৎ মানবসমাজকে বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত বাস করতে হবে। ক্যাপিটালিস্ট সমাজের ছোটখাট একান্নবর্ত্তী পরিবারের যেসব গলদ থাকে, এতে তা থাকবে না। এ একান্নবর্ত্তী পরিবারে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না আলস্যকে, প্রশ্রয় দেওয়া হবে না নীচতাকে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকেও খর্ব্ব করা হবে না কোন দিক দিয়ে। খাওয়া-পরার জন্য আত্ম-বিক্রয় করতে হবে না, মামলা করতে হবে না সম্পত্তির অংশ নিয়ে। মানুষের অনুরাগ-বিরাগের মাপকাঠি হবে ভাল-লাগা না-লাগা, অন্ন-বস্ত্রের জন্য বাধ্যতামূলক ভণ্ডামি নয়। অর্থাৎ তখনই 'বার্ডস্‌ অব্‌ এ ফেদার'রা 'ফ্লক টোগেদার' করবার প্রকৃষ্ট সুযোগ পাবে। বস্তুতান্ত্রিক সুখ-সুবিধার জন্যে গরিব হাঁসকে বড়লোক কাকের মোসায়েবি ক'রে বেড়াতে হবে না সে সমাজে। যে অন্নবস্ত্র-বাসস্থানের জন্যে লোকে মনুষ্যত্ব বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, তখন কাজের পরিবর্ত্তে—যে কোন কাজের পরিবর্ত্তেই—মানুষ তা পাবে এবং প্রত্যেকেই সুযোগ পাবে নিজের যোগ্যতা এবং রুচি-অনুসারে কাজ করবার। সুতরাং তখনই গ'ড়ে উঠবে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সমাজ নিজের নিজের স্বাভাবিক প্রেরণাবশে। তখন যে জাতি-ভেদ থাকবে, তা স্বাভাবিক জাতি-ভেদ এবং অন্নবস্ত্রের সমস্যা না থাকাতে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকবে না—

প্রকৃতির রাজত্বে মহিষ এবং ময়ূরে যেমন বিরোধ নেই। মানুষ এতদিন যা নিয়ে ঝগড়া করেছে, তা অতি-স্থূল বস্তু-সম্পত্তি, ভবিষ্যৎ মানুষের সে বালাই থাকবে না। একমাত্র 'প্রাইভেট প্রপার্টি' যা নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, তা তার বুদ্ধি এবং মন। নিখিল মানবের কল্যাণের জন্য সে মনেরও উৎকর্ষ সাধন করতে হবে, তার যথেষ্ট সুযোগও দেওয়া হবে তাকে। অর্থাৎ নিজের হিত-চিন্তা করলেই হবে না শুধু, সকলের হিতের কথাই মনে রাখতে হবে। Love thy neighbour—এই উপদেশই পর্য্যাপ্ত হবে না তখন, Love the humanity as a whole—এই হবে তখনকার মনোভাব। তখন আলাদা আলাদা Nation থাকবে না, Frontier থাকবে না, Foreign ambassador থাকবে না—তখনই সফল হবে কবির স্বপ্ন—'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানবজাতি'।

কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, নিজের নিজের যোগ্যতা অনুসারে কাজ ক'রে জেলের কয়েদীরাও তো অন্নবস্ত্র পায়। কমিউনিস্ট সমাজ তা হ'লে বৃহদায়তন একটা জেলখানা হবে নাকি? জেলখানায় জেলের প্রাচীরের বাইরে যাবার হুকুম নেই কারও এবং এই বন্দীত্বই শাস্তি। এ শাস্তিটা না থাকলে সত্যিই তো জেলখানার বন্দোবস্তে নিন্দা করবার বিশেষ কিছু নেই। ক্যাপিটালিস্ট সমাজে গরিব মানুষরা জেলেই তো ভাল থাকে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে বাস করবার অনুমতি পেলে তারা জেল ছেড়ে আসতে চাইত কি না সন্দেহ।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ছে। বম্বের সন্নুর গল্পটা। মার্গারেড রীডের 'Indian Peasant Uprooted' বইটাতেও গল্পটা আছে। তার থেকেই অনুবাদ ক'রে দিচ্ছি আমি।

সন্নুর মাইনে ছাব্বিশ টাকা। কিন্তু কোন মাসেই পুরো মাইনে পায় না বেচারা। মিলের কাপড় নষ্ট করছে—এই ওজুহাতে কোন মাসে ৫৲, কোন মাসে ১০৲, কোন মাসে ১৫৲ পর্য্যন্ত কেটে নেওয়া হয়। সে মাসে সন্নু

সমস্ত মাস খেটে ১৬৲ মাত্র পেলে। মিলের গেট থেকে বেরিয়েই দেখে লাঠি-হাতে কাবুলীওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। কাবুলীকে দেখেই চট ক'রে গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল সে। ভিড় হোক একটু, ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে স'রে পড়া যাবে। ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে সে গেট থেকে নির্ব্বিঘ্নে বেরুল বটে, কিন্তু কাবুলীর শ্যেনদৃষ্টি সে এড়াতে পারলে না। কাবুলী ঠিক তার পিছু নিয়েছিল। যে-ই একটা গলির মধ্যে সন্থ ঢুকতে যাবে, অমনই ক্যাঁক ক'রে ধরলে তার ঘাড়টা এবং এমন জোরে একটা ঝাঁকানি দিলে যে, বেচারার ঘাড়ের কাছের জামাটা ছিঁড়েই গেল।

শালা, বাগ্‌তা কাহে? রূপিয়া দেও—

নিরুপায় সন্থকে কম্পিত হস্তে কাপড়ের খুঁট থেকে বার করতে হ'ল টাকা। ৬৲ কাবুলীর হাতে দিয়ে কাতর চক্ষে চেয়ে রইল সে। কাতর চক্ষের দৃষ্টিতে বিচলিত হবার লোক কাবুলী নয়।

সে বললে, সুদ আট রূপি হ্যায়—আওর দো রূপি দেনে ওগা—তোম্‌হারা পাস্‌ হ্যায়—দে দেও—

নিষ্করুণ কণ্ঠের নিষ্ঠুর আদেশ। সশঙ্কিত সন্থ তখন হাত কচলে কচলে আগা সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে লাগল যে, এ মাসে তার দশ টাকা মাইনে কাটা গেছে, এ মাসে আর বেশি দিতে পারবে না সে। দেওয়া সম্ভব নয় কিছুতেই। পায়ে ধরতে গেল তার।

কাবুলী খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর বললে, ই দো রূপি আসলমে চলা যায় গা তব। বুঝা?

সন্থ ঘাড় নেড়ে বললে, বুঝেছে। কোনক্রমে নিস্তার পেলে বাঁচে সে। কাবুলী নিস্তারই দিলে তাকে অবশেষে দু টাকা সুদ আসলের অন্তর্ভুক্ত ক'রে।

সন্থ চলল বাড়ির দিকে। ইচ্ছে ছিল, মদের দোকানে ঢুকে আজ মাইনে পাবার দিনটা অন্তত এক পাত্র টেনে যাবে, কিন্তু তা আর হ'ল না। কোন রকমে টাকা কটা বাড়ি নিয়ে ফিরতে পারলে বাঁচে সে। বাড়ির দরজায়

কিন্তু আর একজন পাওনাদার দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতি মাসেই মাইনে পাবার দিন কাবুলীওলার মত এ লোকটাও দাঁড়িয়ে থাকে।

বাড়িভাড়া দাও।

সন্থকে আবার গেরো খুলে ৬৵৹ বার ক'রে দিতে হ'ল। একটিমাত্র ঘরের ভাড়া ৬৵৹। বাকি রইল ৬৸৵৹। সমস্ত মাস হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর পরের মাসের বিশে তারিখে এই তার উপার্জ্জন। ঘরের ময়লা দেওয়ালটায় ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মনে হতে লাগল, বাঁচব কি ক'রে আমরা?

খানিকক্ষণ পরে বিড়িটি ধরিয়ে ঘরের দরজাটিতে এসে যে-ই বসল, বউও বসল এসে এবং অনর্গল ব'কে যেতে লাগল।

কি ক'রে চলবে সমস্ত মাস? যে কাপড় মিলে নষ্ট হয়েছে, তা বাজারে বেচে কি ১০৲ উঠবে? ৫৲, বড় জোর ৬৲—তার বেশি কেউ দেবে না, ফি মাসে দেখছি তো। আমি এ মাসে অবশ্য ১৬৲ রোজগার করেছি—কিছু চাল কিনতে পারব। কিন্তু তোমার জামা যে ছিঁড়ে গেছে একেবারেই, তা কি ক'রে হবে? ছেলেটা বাবুদের জুতোয় কালি-বুরুশ ক'রে রোজ দু-তিন আনা রোজগার করতে পারে অবশ্য। কিন্তু সে-ও যদি বাইরে যায়, ছেলেগুলোকে খাওয়াবে কে? আমি তো বাড়িতে থাকি না। কোলের ছেলেটাকে আপিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাই, নেশা ছুটে গেলেই সে উঠে চেঁচাবে খাওয়ার জন্যে। পেট ভ'রে মাই খাইয়ে যেতে পারি না, বুকে দুধই নেই, খাওয়াব কোথা থেকে? ছটা মরেছে, এটাও যাবে। দশজনকে পেটে ধরেছিলাম, চারটি বেঁচে আছে, তাও কোনক্রমে। মায়ের যত্ন না পেলে কি ছেলে বাঁচে? আমি যত্ন করি কখন, রোজকার করতে না বেরুলে যে পেট চলে না। আচ্ছা, আমাদের ঘরে তো জায়গা আছে—আরও দুজন ভাড়াটে নিলে কেমন হয়? দুজন কুলী আজ আমায় বলছিল। দুটো লোক অনায়াসেই নেওয়া যায়। অনেকটা সাহায্য হয় তা হ'লে। সমস্ত দিন ছেলেগুলো খিদেয় কাঁদে, রাত্রে একটু পেট ভ'রে খেতে দিতে পারি তা হ'লে।

দশ ফিট বাই দশ ফিট ঘরের মধ্যে আরও দুজন পুরুষ ভাড়াটে নেবার প্রস্তাবে সন্থু যেন ক্ষেপে উঠল। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে অশ্লীল ভাষায় সে গালাগালি দিতে শুরু করলে। বউকে গাল দিলে, মিলের মালিককে গাল দিলে, ক্যাশিয়ারকে গাল দিলে, কাবুলীকে গাল দিলে, বাড়িওয়ালাকে গাল দিলে, ভগবানকে গাল দিলে। পরিশ্রান্ত হয়ে চুপ ক'রে শুয়ে পড়ল খানিকক্ষণ পরে। মনে পড়ল, চোদ্দ বছর আগে বিয়ে করবার জন্যে কাবুলীর কাছে যে টাকা সে ধার করেছিল, তা রোজই বেড়ে যাচ্ছে। প্রতি মাসে ৬৲।৮৲, কোন মাসে দশ টাকাও সে দিয়েছে, শোধ কিন্তু হচ্ছে না। অতীতের কথা মনে পড়ল।...তার নিজের বয়স যখন সাত-আট বছর, তখন তার মা তাকে নিয়ে বম্বেতে এসেছিল। মা মিলে কাজ করত, সে খেলা ক'রে বেড়াত রাস্তায়। মাঝে মাঝে একটা স্কুলেও যেত।...তার বড় ছেলেটাকে স্কুলে দেবার কথা মাঝে মাঝে মনে হয় তার। কিন্তু ছেলেটা যেতে চায় না। সে বুঝেছে যে, স্কুলে গিয়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে জুতো-বুরুশ ক'রে যদি সে রোজ তিন-চার আনাও রোজকার করতে পারে, বাবা-মার সাহায্য হয়। ছ বছরের মেয়েটা রাস্তায় নালার ধারে খেলা ক'রে বেড়ায় সমস্ত দিন। ছোট শিশু দুটো প'ড়ে থাকে অন্ধকার ঘরটার মধ্যে আপিঙের নেশায় অজ্ঞান হয়ে।...আরও যদি কিছু টাকা থাকত! আর চারটি বেশি ভাত, আর একটু বেশি ডাল দিয়ে মেখে খেতে পারতাম। তাড়ি তো খেতেই পাই না আজকাল। একটা ধুতি একটা জামা আর না কিনলে চলছে না। বউটাকে কতদিন বলেছি, আসছে মাসে ঠিক একখানা নতুন শাড়ি কিনে দেব। কিছুতেই হয়ে উঠছে না। টাকার অভাবে কতদিন যে দেশে যাই নি!...ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সন্থু। বউটা আগেই ঘুমিয়েছিল। ঘুমের জন্যে দাম দিতে হয় না, তাই তারা ওই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরের মেঝেতে শুয়েই প্রাণ ভ'রে ঘুমুতে লাগল।

এ গল্প এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়। এই সন্থু যদি সপরিবারে জেলে একসঙ্গে থাকবার হুকুম পায়, জেলে যাবার জন্য লালায়িত হয়ে উঠবে ও। কিন্তু যিনি

কমিউনিস্ট সমাজকে রূপান্তরিত জেল ব'লে ঠাট্টা করেন, তিনি জানেন না যে, একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজেই সভ্য মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পাবার আশা করতে পারে। কারণ স্বাধীনতার বাধা যে আধিভৌতিক সমস্যা, তার সমাধান সে সমাজ করেছে। একটা কথা অবশ্য মনে রাখা উচিত। যে কোন সমাজে বাস করতে গেলেই অনিবার্য্যভাবে খানিকটা পরাধীনতা স্বীকার করতেই হয়, প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব আইন-কানুন আছে এবং তা না মেনে সে সমাজে বাস করা যায় না। কমিউনিস্ট সমাজেরও নিজেদের আইন আছে এবং সে আইন হয়েছে ওই সন্নদের বাঁচাবার জন্যে। সে সমাজে শুধু সন্নরাই বাঁচবে না, কর্ম্মী মাত্রেই বাঁচবে সেখানে। সেখানে স্থান নেই কেবল অলসের। এই সমাজের বিধি-ব্যবস্থা যাদের কাছে জেলের বিধি-ব্যবস্থা ব'লে মনে হয়, তাঁরা যে কি ক'রে হিন্দু সমাজের হাজার রকম কুপ্রথা মেনে ইংরেজ-শাসনের স্টীল-ফ্রেমের মধ্যে টিকে আছেন জানি না। তাঁরা হয়তো বলবেন, 'এর মধ্যেও আমরা স্বচ্ছন্দে নেই—এ-ও আমরা চাই না, আমরা স্বাধীনতা চাই। কমিউনিস্ট সমাজের স্বাধীনতাও যদি তাঁদের রুচিকর না হয়, তা হ'লে আর কি রকম স্বাধীনতা যে তাঁদের কাম্য হতে পারে, তা তো ভেবে পাই না। নিরঙ্কুশ বর্ব্বরের আত্মসর্ব্বস্ব স্বাধীনতা? সে রকম স্বাধীনতা ছিল অতীতকালে বন্যমানব-সমাজের দলপতিদের, এখন আছে ক্যাপিটালিস্ট সমাজের বিজ্‌নেস-ম্যাগ্‌নেটদের। সেকালের বন্য মানবসমাজ অবলুপ্ত হয়েছে, একালের ক্যাপিটালিস্ট সমাজও হবে। ওদের বিরুদ্ধেই আমাদের যুদ্ধ। সুতরাং সে রকম স্বাধীনতা যদি কারও কাম্য হয়, তার লোভ ছাড়তে হবে তাঁকে। এ ধরনের স্বাধীনতা-কামী ছাড়া আর একদল লোক আছেন, যাঁরা কমিউনিজ্‌মের বিরোধিতা করেন হিন্দুসভ্যতার প্রতি ভক্তির আধিক্যবশত। তাঁরা বলেন, এবং আমিও সে কথা বিশ্বাস করি, হিন্দুসভ্যতার মধ্যে ক্যাপিটালিজ্‌ম ছিল না। পঞ্চায়েৎ-শাসিত গ্রামে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করত সবাই। অশোক হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতির উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রে সেকালকে ফিরিয়ে আনতে চান তাঁরা। ফিরিয়ে

আনতে পারলেও আমরা সুখী হতাম না। কারণ নানা দিক দিয়ে একাল অনেক এগিয়ে গেছে। মানবের মনীষা স্থাণু হয়ে ব'সে নেই এক জায়গায়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে অস্বীকার করবার প্রবৃত্তি আমাদের হবে না আশা করি। হওয়া উচিতও নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর ফলে যে মানব-সমাজের অনেক উন্নতি হয়েছে, তা মানতেই হবে। আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, সময় এবং দূরত্বকে জয় করতে পেরেছি আমরা, বহু ভয়াবহ ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি, যে প্রকৃতিকে একদিন নিয়তির মত ভয় করতাম, তাকে দাসীর মত খাটাচ্ছি আজ। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর সুবিধে নিয়ে একদল চতুর স্বার্থপর লোক নিজেদের বড় ক'রে তুলেছে অধিকাংশ লোককে বঞ্চিত ক'রে। উদ্ভব হয়েছে ক্যাপিটালিজ্‌মের। যে সব যন্ত্র মানব-সমাজের উপকারে লাগত, সেই সব যন্ত্র দিয়েই তারা পেষণ করছে অধিকাংশকে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করবার জন্যে। এরোপ্লেন থেকে বম পড়ছে, রেডিও দিয়ে মিথ্যে প্রচার হচ্ছে, মিলে ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে জীবন-ধারণের উপযোগী বস্তুসম্ভার নয়, যুদ্ধের মাল-মশলা ; এবং তার জন্যে খেটে মরছে যেসব মজুরের দল, তারা মরছেই, বাঁচছে না কেউ। বৃদ্ধি পাচ্ছে কেবল ক্যাপিটালিস্টদের মেদ-ভার। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানব-সমাজের এই যে দুর্গতি হয়েছে, তার থেকে তাকে বাঁচাতেই হবে—এই হচ্ছে কমিউনিজ্‌মের লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমস্ত সুবিধা সবাই সমানভাবে ভোগ করবে। যে সাম্য যে উদারতার জন্যে তোমরা হর্ষবর্দ্ধনের আমলকে ফিরিয়ে আনতে চাও, কমিউনিস্টরা সেই সাম্য সেই উদারতাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন এ যুগে। অর্থাৎ হর্ষবর্দ্ধনের আমলের উদারতার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে সর্ব্বজনহিতকরভাবে মেলাবার চেষ্টার নামই কমিউনিজ্‌ম। সে চেষ্টা যদি সার্থক হয়, তা হ'লে আমরা যতটা খুশি হব, অপরিবর্ত্তিত হর্ষবর্দ্ধনের যুগ ফিরে পেলে ততটা হবে কি না সন্দেহ। তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। হিন্দুসভ্যতায় আর্থিক ক্যাপিটালিজ্‌ম ছিল না

হয়তো, কিন্তু মানসিক ক্যাপিটালিজ্‌ম ছিল। ব্রাহ্মণকে সমাজের শিরোমণি ব'লে মানতে হ'ত সবাইকে। সে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যতদিন বজায় ছিল, ততদিন কোন গোল ছিল না। তাঁর বিদ্যাবত্তা চরিত্রবল স্বতই সকলের শ্রদ্ধা উদ্রেক করত, শ্রদ্ধা আদায় ক'রে বেড়াবার প্রয়োজন হ'ত না তাঁর। কিন্তু তাঁর মূর্খ-বংশধরেরা যখন কেবলমাত্র অর্কফলা ও উপবীত আস্ফালন ক'রে সে সম্মান দাবি করতে লাগলেন এবং নানা ফন্দি-ফিকির ক'রে তা আদায়ের ব্যবস্থা করলেন, তখনই তা ক্যাপিটালিজ্‌মের মত কুৎসিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। টিকি-তিলকধারী আচার-সম্বল ভণ্ডের প্রভুত্ব বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সহায়ক হ'ল। বৌদ্ধধর্ম্মেও এই দোষ দেখা দিয়েছে পরে, এবং এর বারম্বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে ইতিহাসে। হেরিডিটি নিয়ে অনেকে তর্ক করেন। বলেন, ব্রাহ্মণের ছেলেরই তো ব্রাহ্মণ হওয়ার কথা। হেরিডিটি সম্বন্ধে জ্ঞান আর একটু বেশি থাকলে এ কথা বলতেন না। হওয়ার কথা নয়, হওয়ার সম্ভাবনা, পারিপার্শ্বিক এবং আরও বহুবিধ অবস্থা যদি অনুকূল থাকে। তা ছাড়া অত সূক্ষ্ম তর্কেরই বা প্রয়োজন কি! দেশজুড়ে যে সব রাঁধুনি-বামুন, মূর্খ-পুরুত, ভণ্ড-বাবাজী, শিষ্যলোলুপ-গুরুর দল কিলবিল ক'রে বেড়াচ্ছে, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তো বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেও এরা ব্রাহ্মণ হয় নি। এই অযোগ্যদের চরণে মাথা নত করতে বাধ্য ক'রে হিন্দুসমাজ এক হিসেবে ক্যাপিটালিজ্‌মকেই প্রশ্রয় দিয়েছে।

এতক্ষণে তুমি বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠেছ। বিশ্বাস কর, আমি যথাসাধ্য সংক্ষেপ করবার চেষ্টা করেছি। কমিউনিজ্‌মের মূল কথাটা তোমাকে বললাম, এর শাখা-প্রশাখা অনেক আছে, ভয় নেই, সে সম্বন্ধে কিছু বলব না। সেগুলোতে details-এর তফাত খালি। কিন্তু একটা কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারতবর্ষে যে কমিউনিস্ট মুভ্‌মেণ্ট হয়েছে, তার স্বরূপ, উদ্দেশ্য এবং আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কিছু বলা উচিত। সব কথা অবশ্য বলা যাবে না, যেহেতু আমরা এখনও 'বে-আইনী'। এ চিঠি যদি

ধরা পড়ে, তুমি আমি দুজনেই বিপদে পড়ব। লুকিয়ে এ চিঠি পাঠাচ্ছি—জেলের বাইরে লুকিয়ে পোস্ট ক'রে দেবে একজন। সুতরাং এ চিঠিতে সব কথা খোলাখুলি লেখা নিরাপদ নয়। মীরাট মামলার সরকারী উকিলের সওয়ালে আর জজদের রায়ে আমাদের ইতিহাস খানিকটা নিবদ্ধ আছে। খবরের কাগজে কিছু বেরিয়েছিল, তুমি পড়েছ কি না জানি না।

কানপুর কমিউনিস্ট মামলার সময়ই সর্ব্বপ্রথমে লোকে জানতে পারে যে, ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি ব'লে একটা পার্টি আছে। তার আগে এর নামই শোনে নি কেউ। আমার যতদূর মনে পড়ে, বিটলভাই প্যাটেলের আনুকূল্যে মিস্টার ডাংগে প্রথমে সোশ্যালিজ্‌ম-আন্দোলন শুরু করেন বম্বেতে। আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি, চৌরিচৌরা হয়ে গেছে। মহাত্মাজী আইন-অমান্য-আন্দোলন বন্ধ ক'রে দিয়ে জেলে গেছেন। চরকা-চালানো, অস্পৃশ্যতা-পরিহার, মাদকদ্রব্য-বর্জ্জন, বিদেশী বয়কট—এসব ছাড়া দেশে তখন উগ্রতর আর কিছু হচ্ছে না। দেশবন্ধুর দল অধীর হয়ে কাউন্সিলে ঢোকবার আয়োজন করছেন। কমিউনিস্টদের তখন দল ব'লে কিছু নেই, দু-চারজন লোক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছেন দেশের মধ্যে। কিছুদিন পরে বাংলা দেশে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজ্যাণ্ট্‌স পার্টি স্থাপিত হ'ল কলকাতায়। আমি যোগ দিলাম তাতে। প্রথম আমিও যে সকলের মত মহাত্মাজীর স্বদেশী-আন্দোলনে মেতেছিলাম, তার প্রধান কারণ ছিল—তাঁর অভিযান ইংরেজদের বিরুদ্ধে, যে ইংরেজ, ক্যাপিটালিজ্‌মের প্রতীক হিসেবে, আমাদেরও শত্রু। পরে আবিষ্কার করলাম, ভারতের স্বাধীনতা-অপহারক যে ইংরেজ, তারই সঙ্গে বিরোধ তাঁর, ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে তাঁর কোন শত্রুতাই নেই, বরং ভারতের ক্যাপিটালিস্টদের পক্ষপুট দিয়ে ঢেকে রক্ষা করবারই আগ্রহ তাঁর। এ কথা আবিষ্কার করার পর আর কংগ্রেসের ওপর কোন আস্থা রইল না। যদিও তার কিছুদিন আগে লাহোরে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে দেশবন্ধু সভাপতির অভিভাষণে তারস্বরে বলেছিলেন, স্বরাজ আমরা সকলের

জন্যে চাই, একটা বিশেষ শ্রেণীর জন্যে নয়। টাটার লেবার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিও ছিলেন তিনি কিছুদিন, কিন্তু তাঁর উক্তিকে কাজে পরিণত করতে হ'লে জনসাধারণের মনে যে প্রেরণা জাগানো উচিত ছিল, তাদের আত্মচেতনা-কে উদ্বুদ্ধ করবার যে ব্যাপক আয়োজনের প্রয়োজন ছিল, সেসব কিছুই করতে দেখলাম না তাঁকে। ভোট-সংগ্রহ ক'রে স্বরাজ্য-পার্টি গ'ড়ে কাউন্সিলের সৌধমঞ্চে তিনি সেই জাতীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করতে মত্ত হলেন, যা দানীবাবু শিশিরবাবু বহুবার করেছেন রঙ্গমঞ্চে এবং যা আমরা প্রতিদিনই উপভোগ করি খেলার বা ঘোড়-দৌড়ের মাঠে। কাগজে কাগজে তাঁর জয়জয়কার হতে লাগল, কিন্তু যে জনসাধারণের জন্যে তিনি স্বরাজ অর্জ্জন করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল। তাঁর শিষ্য সুভাষ-বাবুরও অনুরূপ ব্যবহার দেখলাম। ইনি যদিও অনেক শ্রমিক-সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু দেশের ধনিকরা এঁকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধেও অস্ত্রের মত ব্যবহার করেছে অনেকবার। এঁরা বড় বক্তা, বিরাট বিদ্বান, অসাধারণ মেধাবী, রাজনৈতিক দাবাখেলায় সুদক্ষ, কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের কেউ নন এঁরা। আমার মনে হ'ল, ইংরেজদের তাড়িয়ে কংগ্রেস সত্যিই যদি স্বরাজ পান, তা হবে বড়লোকদের স্বরাজ, যেসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে কবি ভাষা ফোটাতে চেয়েছিলেন, তারা মূঢ় ম্লান মূকই থেকে যাবে। আর একটা মজার ব্যাপার, এই সময় সকলে তখন বলতে লাগল, মহাত্মা গান্ধীই জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ এনেছেন। ঠিক ভাষা হ'ত 'মত্ততা এনেছেন' বললে। নিজেদের উন্নতি-অবনতি সুখ-দুঃখ বিস্মৃত হয়ে মহাত্মাকে ঘিরে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সবাই। অর্থাৎ যে কর্ত্তা-ভজা মনোবৃত্তির জন্য ভারতের অধঃপতন, সেই অন্ধ-ভক্তির শিখরে দাঁড়িয়েই গান্ধীজী মহাত্মা হলেন এবং অশিক্ষিত লোকের মনে সেই সব আশা-ভরসা জাগিয়ে তুললেন (হয়তো অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও), যা সফল হওয়া কলিকালে অন্তত অসম্ভব। এযুগে যন্ত্র-সভ্যতাকে অস্বীকার ক'রে রাম-রাজত্ব স্থাপনের প্রয়াস থেকে তিনি কিন্তু

নিবৃত্ত হলেন না কিছুতে। দুর্ব্বল অশিক্ষিত লোকদের সবল শিক্ষিত ক'রে তোলবার চেষ্টা না ক'রে তাদের শোনালেন অহিংসা-মন্ত্র, এবং বয়কট করতে বললেন শিক্ষা। শিক্ষা শব্দটার পূর্ব্বে বিদেশী বিশেষণটা থাকাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্জ্জন করাটাই স্বদেশ-ভক্তির অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। মূর্খের মূর্খতাটাই হয়ে উঠল গর্ব্বের বস্তু। শুনেছি নাকি স্বদেশের কাজে নাববার আগে গোখ্‌লের নির্দ্দেশমত ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছিলেন তিনি। ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ ক'রেও তিনি যদি এই তাদের মুক্তির উপায় ঠিক ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমার আর বলবার কিছু নেই। আমি আর একটা কথাও ভেবে পাই না। দরিদ্র জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেলে বড়লোক মিল-ওনারদের সঙ্গে কি ক'রে বন্ধুত্ব রাখা সম্ভব? মোট কথা, মহাত্মাজীর আন্দোলনে আমি আশ্বাস পেলাম না। যাঁরা হিংস্র পথ অবলম্বন ক'রে লাট-বড়লাট মারছিলেন, তাঁদের কার্য্যকলাপও আমার প্রাণ স্পর্শ করল না যেন। কতকগুলো সাহেব মেরে লাভ কি? ফলে নিরপরাধী বহু লোক নির্য্যাতিত হবে শুধু। তা ছাড়া, দেশ বলতে সত্যি সত্যি যা বোঝায়, সেই অশিক্ষিত অসহায় নগ্ন রুগ্ন ক্ষুধার্ত্ত জনমজুর চাষীর দল, তাদের কি কোনও উপকার হবে দু-চারজন সাহেব মেরে? আমার তো তা মনে হয় না। তারা সবল হোক, শিক্ষিত হোক, জাগুক—এই আমি চাই।

সুতরাং এদের জাগরণের জন্যেই শেষে আত্মনিয়োগ করলাম আমি পুরোপুরি। আমার কাজ হ'ল তাদের শিক্ষিত করবার চেষ্টা করা, অন্যান্য দেশের শ্রমিকরা কেমনভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে সে খবর তাদের এনে দেওয়া, তাদের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং স্বার্থরক্ষা করা। চরকা বা পতাকা ঘাড়ে ক'রে অহিংস শোভাযাত্রার শোভা-বর্দ্ধন করলে অথবা দু-একটা সাহেব খুন করলে আমার স্বদেশ-সেবার বাজার-দর বেড়ে যেতে পারত, কিন্তু যাদের ম্লান মুখে শত শতাব্দীর করুণ কাহিনী লেখা রয়েছে, তাদের মুখ চেয়ে ওসব পথে যেতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না।

কাজে নেবে কিন্তু দেখলাম, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করা বড় সহজ কাজ নয়। আমার ভদ্র চেহারা এবং ভদ্র পোশাকই প্রথম বাধা হ'ল। প্রথমে আমার কথা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইলে না। 'নাইট স্কুল' করলাম, নিজে পড়াবার জন্যে রোজ যেতাম, ছাত্রই জুটত না। তা ছাড়া অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর এবং বয়স্ক, অ আ থেকে শুরু ক'রে তাদের শিক্ষিত ক'রে তোলা সহজও ছিল না আমার পক্ষে। বক্তৃতা করতাম, আমার বক্তৃতার ভদ্র ভাষা কেউ বুঝত না। বক্তৃতা দেবার জন্যে শেষে তাদের মধ্যে থেকেই চালাক-চতুর একজন লোককে বেছে নিয়ে বাহাল করলাম মাসিক ত্রিশ টাকা মাইনে দিয়ে। একটা ম্যাজিক-লণ্ঠন এবং স্লাইডও কিনলাম কিছু। অল্পবয়স্কদের অক্ষর-পরিচয় করাবার জন্যেও একজনকে নিযুক্ত করলাম। নিজে রাত জেগে জেগে দেশী-বিদেশী খবরের কাগজ থেকে নানা খবর অনুবাদ করতাম। সেগুলো ছাপাতাম একটা সাইক্লোস্টাইলে। একটা সাইক্লোস্টাইলও কিনেছিলাম সেজন্যে। তোমার মনে আছে কি, একবার একটা নিমন্ত্রণে যাবার সময় শাল আংটি ঘড়ি প'রে যাই নি ব'লে তোমরা রাগ করেছিলে? তখন বলি নি, এখন কিন্তু বলতে বাধা নেই, শাল আংটি ঘড়ি আমার ছিল না, সবই বিক্রি ক'রে দিয়েছিলাম এই কাজের জন্যে। দাদু মাসে মাসে আমাকে যে পকেট-মনি দিতেন, কলেজের বই কেনবার জন্যে যে টাকা পেতাম, সবই এর জন্যে খরচ করেছি। লাইব্রেরিতে ব'সে আর ক্লাসের নোট টুকে পরীক্ষার পড়া করতাম, একটাও বই কিনি নি। নিজের বাহাদুরি করবার জন্যে তোমাকে এসব লিখছি না, যা যা করেছি তাই অকপটে বর্ণনা করছি কেবল। যাদের আমরা বহু যুগ ধ'রে শোষণ করেছি, তাদের জন্যে এই সব সামান্য ত্যাগ খুব যে একটা বড় কিছু তাও আমার মনে হয় না। যাই হোক, এত ক'রেও কিন্তু মন পাই নি ওদের। যে চালাক-চতুর ছোকরাকে বক্তৃতা দেবার জন্যে বাহাল করেছিলাম, সে আমার সামনে যদিও কমিউনিজ্‌মের বক্তৃতা দিত, আড়ালে কিন্তু আমারই নামে লাগাত মক্কিবদের

কাছে গিয়ে। শুধু মনিবদের কাছেই নয়, নিজেদের মধ্যেও গোপনে প্রচার করত যে, আমার মত ধনীর দুলাল ধাওড়ায় যাতায়াত করছে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, মেয়েমানুষের খোঁজে। তার দোষ ছিল না বিশেষ। ইতিপূর্ব্বে দু-একজন ধনীর দুলাল তাদের উপকার করবার ছুতোয় এসে সত্যিই নারী-ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছিলেন। আমার নিঃস্বার্থ পরোপকারের মর্ম্ম তারা বোঝে নি ব'লে প্রথমটা আমি মর্ম্মাহত হয়েছিলাম, কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি, নিঃস্বার্থ পরোপকারের মর্ম্ম খুব কম লোকেই বোঝে। অধিকাংশ লোকই নিজেরা স্বার্থপর মতলববাজ ব'লে প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক কাজের পেছনেই মতলব অনুসন্ধান করে, না পেলেও মনে ভাবে, নিশ্চয়ই আছে কিছু একটা। রঘ্‌ঘুকে এজন্যে অপরাধী করি না আমি। সে মনিবদের কাছে আমার নামে লাগাত, সেখান থেকেও টাকা পেত ব'লে। যে টাকার লোভ বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিরা সামলাতে পারেন না—যার লোভে প'ড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রীধারীরাও মিথ্যে সার্টিফিকেট লিখছেন, মিথ্যে রায় দিচ্ছেন, মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছেন, মিথ্যে মকদ্দমা করছেন, বস্তুত না করছেন হেন অপরাধই নেই—তার লোভে প'ড়ে রঘ্‌ঘুও যদি এ কাজ ক'রে থাকে, খুব বেশি দোষ কি দেওয়া যায় তাকে? অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় অসুখের এপিডেমিক যেমন স্বাভাবিক, ক্যাপিটালিজ্‌মের আওতায় অর্থ-গৃধ্নুতাও তেমনই একটা স্বাভাবিক জিনিস। কারণ নিছক পরিশ্রম বা যোগ্যতার পরিবর্ত্তে এ সমাজে সসম্মানে সৎপথে থেকে সুখে জীবনযাপন করা যায় না, অথচ কিছুমাত্র পরিশ্রম না ক'রে অযোগ্যতম ব্যক্তিও রাজার হালে থাকতে পারে টাকা থাকলে। তাই সবাই টাকা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়। রঘ্‌ঘুও হয়েছিল। পরে এসব কথা ভেবে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি, তখন কিন্তু দুঃখ হয়েছিল খুবই, বিশেষ ক'রে যেদিন আমার ম্যাজিক-লণ্ঠনটা চুরি গেল। এত কষ্ট হয়েছিল যে, পুলিসে খবর পর্য্যন্ত দিয়েছিলাম। পুলিস অবশ্য এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি, তারা তখন মদের দোকানে পিকেটিং বন্ধ করতে

ব্যস্ত ছিল। আর একটা জিনিস আবিষ্কার ক'রেও দুঃখ পেয়েছিলাম। দিস্তা দিস্তা কাগজ কিনে যেসব জিনিস আমি সাইক্লোস্টাইল করতাম, তা সবাই আগ্রহ ক'রে নিত। একদিন আবিষ্কার করলাম, তা তারা নেয় পড়বার জন্যে নয়, জিনিসপত্র মুড়ে নিয়ে যাবার জন্যে। তাদের স্বাস্থ্যোন্নতি করবার চেষ্টাও আমার সফল হয় নি। যেখানে সেখানে থুতু ফেলা অন্যায়, ঘরের আশপাশে জল জমতে দেওয়া উচিত নয়, ঘরদোর বিছানাপত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার না রাখলে নানা রকম অসুখ হয়, মশা-মাছি-ছারপোকা থেকে আত্মরক্ষা মানে যে নানাবিধ রোগ থেকেই আত্মরক্ষা, ঘরের কপাট-জানলা যতদূর সম্ভব খুলে রাখাই উচিত—আমার এই সব বক্তৃতা শুনে তারা হাসত। দু-একজন মাঝে মাঝে আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করবার চেষ্টা করত, কিন্তু তা দু-একদিন। একটি পথ দিয়ে গিয়ে কেবল তাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছিলাম। যখন তাদের বোঝাতে পারলাম যে, দিন-রাত পরিশ্রম ক'রে তারাই মিল চালাচ্ছে, অথচ মোটা মুনাফাটা যাচ্ছে কতকগুলো অকর্ম্মণ্য লোকের পকেটে, তখন যেন তাদের একটু সাড়া পেলাম। ধর্ম্মঘট ক'রে তাদের দাবি জাহির করতে পারলে ওই সব মেকী মালিকরা যে সে দাবি মেটাতে বাধ্য হবে, এ কথা শুনে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল তারা। ক্যাপিটালিস্ট-সমাজে ওই একটিমাত্র জিনিস আছে, যা লোকের প্রাণে সত্যিকার উৎসাহ জাগাতে পারে—বক্তৃতা নয়, আদর্শ নয়, মহত্ত্ব নয়—টাকা। আয় বাড়বার লোভ দেখাতেই ওদের ঘুম ভাঙল যেন। আমাদের পাড়ার 'মিলে' কুলী-স্ট্রাইক আমিই যে করিয়েছিলাম, তা বোধ হয় জান। কিন্তু তার জন্যে কি বেগ যে আমায় পেতে হয়েছে, তা বোধ হয় জান না। আমার কথায় তারা তো স্ট্রাইক করলে, কিন্তু আড়াই শো বুভুক্ষু পরিবারের দিন চলা ভার হয়ে উঠল, যখন মুদীরা ধার দেওয়া বন্ধ ক'রে দিলে। এটা যে সম্ভব, তা আমি কল্পনা করি নি। মুদীরা যে কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে যোগ দেবে, এ কথা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাদের আমি স্বদলভুক্ত মনে করেছিলাম। কর্ত্তৃপক্ষ

নাকি অগ্রিম টাকা দিয়ে তাদের সব জিনিস কিনে নিয়েছিলেন। সাত দিন কাটতে না কাটতে অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। তারা দলে দলে এসে আমাকে বলতে বাধ্য হ'ল, অবিলম্বে খাওয়ার বন্দোবস্ত না করলে কাজে যোগ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তাদের। আমার রোখ চ'ড়ে গিয়েছিল। বললাম, তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা আমিই করব, তোমরা এক মাস অন্তত কাজে যোগ দিও না। ব'লে তো বসলাম, কিন্তু পরে হিসেব ক'রে দেখলাম, আড়াই শো পরিবারের খাওয়ার ব্যবস্থা করা মানে দৈনিক আড়াই শো টাকার ব্যবস্থা করা অন্তত। আমার নিজের হাতে তখন কিছু নেই। মেডেলগুলো পর্য্যন্ত বিক্রি ক'রে দিয়েছি। এক মাস যদি স্ট্রাইক চলে, প্রায় আট হাজার টাকার দরকার। ধার করবার জন্যে বেরুলাম। বড়লোক বন্ধু যারা ছিল, সব হিতৈষী হয়ে উঠল একযোগে। কেউ আমায় পাগল ভেবে চিন্তিত হ'ল, কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করলে, কেউ রাগ করলে, কেউ হাসলে—টাকা কেউ দিলে না। কাবুলীরা বিনা বন্ধকে অত টাকা দিতে রাজি হ'ল না। আমার তখন বন্ধক দেবার মত কিছু নেই। বাবা-মাকে এ কথা বলতেই সাহস হ'ল না আমার। সাহস হ'লেও সফল হতাম কি না সন্দেহ। কারণ বাবা নিজেই তখন চতুর্দ্দিকে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন টাকা ধার করবার জন্যে। মাকে ধ'রে পড়লে তাঁর গয়নাগুলো দিতেন হয়তো, কিন্তু কেঁদে কেটে এমন একটা অনর্থ করতেন যে, মুশকিলে প'ড়ে যেতাম আমি। এই ভয়ে পারতপক্ষে বাড়িতে এসব আলোচনাই আমি করতাম না কারও সঙ্গে। মরিয়া হয়ে শেষে অসমসাহসিক কাজ ক'রে ফেললাম একটা। দমদমে গিয়ে দাদুকে সব কথা খুলে বললাম। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে যে আলাপ হয়েছিল, তার প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট মনে আছে আমার এখনও।

সব শোনবার পর তিনি বললেন, মিলের কুলীদের জন্যে তোমার হঠাৎ এত দুঃখ হ'ল কেন?

বড়লোক মিল-ওনার ওদের ঠকাচ্ছে ব'লে।

ঠকাচ্ছে ? যে মাইনে দেবে বলেছিল, তা দিচ্ছে না ?

যা দিচ্ছে, সেটা অত্যন্ত কম।

অত কমে ওরা রাজি হ'ল কেন ?

রাজি না হয়ে উপায় কি ? স্বেচ্ছায় ওর বেশি কেউ দেবে না।

দেবে কেন, ওই হ'ল ওদের বাজার-দর। কুলী আবার কত মাইনে পাবে ?

বুঝলাম, দাদুর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। যে লোকের সা-রে-গা-মা-র সম্বন্ধেই ধারণা নেই, তাকে বেহাগ-ভৈরবীর তফাত বোঝাতে যাওয়া পণ্ডশ্রম।

চুপ ক'রে রইলাম। দাদুই কথা কইলেন আবার।

কুলীকে তুমি বাবু বানাতে চাও নাকি ?

কুলীকে আমরা কুলী ক'রে রেখেছি ব'লেই সে কুলী। বাবু হতে তার বাধা কি ? সেও তো মানুষ।

ও, বটে।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, অতএব এই মহৎ কর্ম্ম করবার জন্যে তুমি এন্তার টাকা খরচ করতে প্রস্তুত হয়েছ।

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, আমার স্বর্ব্বস্ব, এমন কি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কেটে দিতে আমি প্রস্তুত আছি ওদের বাঁচাবার জন্যে।

কিন্তু সেটা ধীরে-সুস্থে করলে ক্ষতি কি ? এক্ষুনি আট হাজার টাকাই খরচ করতে হবে ?

এক্ষুনি আট হাজার টাকা না পেলে আমার মান থাকবে না। আমার কথায় আড়াই শো লোক স্ট্রাইক ক'রে অনাহারে আছে—আমি কথা দিয়েছি, তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করব।

কথা দিয়ে দিয়েছ ?

হ্যাঁ।

তা হ'লে এ নিয়ে আর আলোচনা করা বৃথা। ভদ্রলোকের কথার দাম আট হাজার টাকার চেয়ে নিশ্চয় বেশি। নিয়ে যাও। কিন্তু তোমার

হিসেবে এটা লেখা থাকবে, মনে থাকে যেন। আর তোমার ওই প্রোলিটারিয়েটদের এত লম্ফঝম্ফ যে একজন ক্যাপিটালিস্টের ফুলিশ উদারতায়, সে কথাও তারা ভুলে যাবে না আশা করি।

দাদু সেদিন টাকাটা না দিলে যে কি করতাম, জানি না। তারপর থেকেই আমাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হ'ল যে, আয় বাড়াবার প্রলোভন না দেখালে শ্রমিক কিষাণ কারও সাড়া পাওয়া যাবে না এবং বার বার আমি একা তার তাল সামলাতে পারব না। সুতরাং পার্টিতে যোগ দিতে হ'ল। প্রথম প্রথম অবশ্য কিছুদিন আমরা একটা ঘরে ব'সে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করি নি, কারণ কাজ করবার মত যথেষ্ট অর্থ আমাদের হাতে ছিল না তখন। শুধু বক্তৃতা ক'রে শ্রমিক বা কৃষকের মন গলানো যায় না, তারা হাতে হাতে ফল দেখতে চায়। তবু কিন্তু আমাদেরই চেষ্টায় এই সময় খড়গপুর রেলওয়ে স্ট্রাইকটা হয়েছিল, যদিও সেটা বিশেষ কিছু নয়। আর এই সময়টা মাঝে মাঝে প্রায়ই জামসেদপুর যেতাম সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার জন্যে। ছোটকাকা সেই সময় জেল থেকে ফিরে এলেন। তাঁকে নিয়ে দিনকতক হৈ-চৈ করলাম। কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়, তিনি ছোটকাকা ব'লে। দেশের জন্যে তাঁর ত্যাগটাকে তো অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া কাকীমা চ'লে যাওয়াতে ব্যাপারটা সত্যিই নিদারুণ হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। তাই তাঁকে ঘিরে একটা উৎসব-কোলাহল সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলাম। কিন্তু সেসব যে তাঁর চিত্ত স্পর্শ করতে পারে নি, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যেত। এ ছাড়া আর কোন দিক দিয়ে কংগ্রেসের ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলাম ব'লে মনে পড়ে না। এমন কি সাইমন কমিশন বয়কট হুজুগে মাতবারও প্রেরণা পাই নি আমি, যদিও আমাদের দলের জনকয়েক খুব মেতেছিল এ নিয়ে। লর্ড বার্কেন্‌হেডকে মুখের মতন জবাব দেবার জন্যেও দিল্লীতে যখন অল পার্টিজ কন্‌ফারেন্স চলছিল এবং কন্‌স্টিটিউশনে শতকরা কতজন হিন্দু, কতজন মুসলমান, কতজন শিখ থাকবে এ নিয়ে যখন

নেতারা মাথা ঘামাতে লাগলেন এবং অবশেষে মতিলাল নেহেরুকে মহাত্মা গান্ধী যখন ভার দিলেন রিপোর্ট তৈরি করবার, তখনও তাতে উল্লসিত হবার কোন হেতু ছিল না আমার দিক দিয়ে। আমার মনে হয়েছিল, সাইমন কমিশন এবং নেহেরু কমিশন একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ, দেশের নাইন্টি-এইট পার্সেন্টদের জন্যে যে সাম্য আমার কাম্য, তার আভাসমাত্র সাইমন বা নেহেরু কেউ দেবেন না। সুতরাং ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই নি।

কিছুদিন পরে সহসা কিন্তু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম বারদোলির খবর পেয়ে। গভর্মেণ্ট খাজনা বাড়িয়েছেন ব'লে সেখানকার চাষীরা খাজনা দিতে অস্বীকার করেছে। বল্লভভাই প্যাটেল তার নেতৃত্ব করেছেন। আমি আর কলকাতায় থাকতে পারলাম না। চ'লে গেলাম বারদোলিতে। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, তা অপূর্ব্ব। বারদোলির কৃষকদের বীরত্ব ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হতে দেখলাম আমার চোখের সামনে। আবালবৃদ্ধবনিতার যে শৌর্য্য, যে আত্মত্যাগ সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা সত্যি সত্যিই যদি সারা ভারতের শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পারত, তা হ'লে ভাবনা ছিল না। বারদোলিতে হয়েছিল বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যে। মহাত্মাজী তাঁকে যে 'সরদার' উপাধি দিয়েছিলেন, সত্যিই সর্ব্বতোভাবে তার উপযুক্ত তিনি। তিনি যদি আর কিছু না ক'রে তাঁর এই সঙ্ঘবদ্ধ করবার শক্তিকে জনসাধারণের কাজে লাগাতেন, মস্ত বড় কাজ হ'ত একটা। এই শক্তিমান পুরুষ তা হ'লে খুব বড় একজন কমিউনিস্ট নেতা হতে পারতেন। কিন্তু জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে, শক্তিমান ক'রে তোলবার আগ্রহ এঁদের ততটা নেই, যতটা আছে ইংরেজকে জব্দ করবার আগ্রহ, এবং সেই উদ্দেশ্যেই এঁরা সঙ্ঘবদ্ধ অন্ধ জনতাকে মাঝে মাঝে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেছেন। অন্ধ জনতা যে অন্ধই থেকে গেছে, তার প্রমাণ—বারদোলি আর দ্বিতীয়বার মাথা তুলতে পারে নি। সরদারজীর স্থান নেবার মত দ্বিতীয় লোক আর দেখা যায় নি সেখানে। ইংরেজকে জব্দ আমরাও করতে চাই, কিন্তু তার চেয়েও, আমরা

বেশি ক'রে চাই জনসাধারণকে নিজের শক্তির সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলতে। তা যদি করতে পারি, ইংরেজ আপনিই জব্দ হয়ে যাবে। একজন গান্ধী, একজন বল্লভভাই, একজন সুভাষ, একজন নেহেরু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাই না আমরা। আমরা ঘরে ঘরে গান্ধী-বল্লভভাই-সুভাষ-নেহেরুকে পেতে চাই এবং তা পাওয়া সম্ভব হবে যদি আমরা প্রত্যেক ভারতবাসীকে সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং শিক্ষা দিতে পারি, যা গান্ধী, বল্লভভাই, সুভাষ, নেহেরু বরাবর পেয়েছেন। বিদ্যাসাগর ফ্যারাডে দীন-দরিদ্রের ঘরে জ'ন্মেও বড়লোক হতে পেরেছিলেন, এ কথা উল্লেখ ক'রে যাঁরা সাম্যবাদের সমালোচনা করেন, নির্মম দারিদ্র্যের পেষণে কত প্রতিভা যে অকালে নষ্ট হয়ে যায়, সে খবর তাঁরা রাখেন না। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ছে। জামালপুরের শ্রমিকদের অবস্থাটা কি রকম দেখতে গিয়ে অপরূপ জিনিস দেখেছিলাম একবার একটা। দেখলাম, ওয়ার্কশপের জিনিসপত্র দিয়ে একটা বারো বছরের ছেলে ছোট্ট একটা এঞ্জিন বানিয়েছে। অল্প কয়লাতে বেশ খানিকক্ষণ চলে সেটা। সেই এঞ্জিনের সাহায্যে ছেলেটা নিজের ঘরে টানা-পাখা লাগিয়ে দিব্যি হাওয়া খায় রোজ। দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। বললাম, তুমি এটা পেটেন্ট কর, যা খরচ লাগে আমি দেব। এ কথা শুনে তার বাপ-মা ভয় পেয়ে গেল। ওয়ার্কশপের জিনিসপত্র চুরি ক'রে জিনিসটা তৈরি হয়েছিল, জানাজানি হয়ে গেলে তাদের চাকরি থাকবে না। পরে খবর পেয়েছি, সে ছেলে বিদ্যাসাগরও হয় নি, ফ্যারাডেও হয় নি। হয়েছিল ওই ওয়ার্কশপেরই একটা নগণ্য মজুর। ওভার-টাইম খেটে, না খেতে পেয়ে, যক্ষ্মা হয়ে মরেছিল শেষকালে। সোভিয়েট দেশে তার এ পরিণতি হ'ত না বোধ হয়। নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ম'রে যাওয়াই স্বাভাবিক, বেঁচে থাকাটা আকস্মিক, বড় হওয়া সুদূর-পরাহত। তা ছাড়া দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ না করতে হ'লে বিদ্যাসাগর ফ্যারাডে যে আরও বড় হতেন না, তাই বা কে বললে তাঁদের ?

বাবুদোলি থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম। এসে পড়লাম অল-বেঙ্গল

স্টুডেণ্টস কন্‌ফারেন্সের হিড়িকে। পণ্ডিত জওহরলাল সভাপতি। তুমি সেই সময়টা তেতলার ঘরে খিল দিয়ে ছবি-আঁকায় মগ্ন থাকতে ব'লে বোধ হয় টের পাও নি যে, তখন ছাত্রমহলে কি উত্তেজনাটা হয়েছিল। জওহরলালের বক্তৃতায় কমিউনিজ্‌মের অনেক খোরাক ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, জওহরলালই কমিউনিজ্‌মের সুরটা ভালভাবে তুলেছিলেন আমাদের মনে। তখন খুব ভাল লেগেছিল, পরে কিন্তু পণ্ডিতজীর ব্যবহারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এখন বুঝেছি, কমিউনিজ্‌ম তাঁর প্রাণের জিনিস নয়, মুখের কথা মাত্র। তিনি তাঁর শিক্ষা এবং চিন্তার মারফৎ—অর্থাৎ অ্যাকাডেমিক্যালি—কমিউনিজ্‌মের যে অনিবার্য্যতা অনুভব করেছিলেন, তাই ওজস্বিনী ভাষায় ব'লে বেড়িয়েছেন সভায় সভায়, কিন্তু আসলে অর্থাৎ মনে-প্রাণে তিনি একজন অ্যারিস্টক্র্যাট, ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত-পালিত মতিলাল নেহেরুর একমাত্র পুত্র, নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর মন যে ছাঁচে ঢালা তা আমীরী ছাঁচ। তাই হেড এবং হার্টের সঙ্গে তাঁর এত বিরোধ এবং তাই তাঁর কমিউনিজ্‌মের এত বক্তৃতা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত বাপুজীর কাছে তাঁকে হার মানতে হয়েছে। সুভাষবাবুর সঙ্গে যদিও আমার মতের পুরোপুরি মিল নেই, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে বাহাদুরি দিই আমি। মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহের ধ্বজাটা তিনি বরাবর উঁচু ক'রেই রাখতে পেরেছেন। আমার নিজেরই অতীত মাঝে মাঝে ভীত ক'রে তোলে আমাকে। যে ক্যাপিটা-লিজ্‌মের বীজ আমার রক্তধারায় সুপ্ত আছে, তা একদিন জেগে উঠে আমার এতদিনকার গড়া আদর্শের অট্টালিকায় ফাটল ধরিয়ে দেবে না কি, কে জানে! সান্ত্বনা পাই টল্‌স্টয় এবং আরও অনেক বড়লোকের কথা ভেবে, যাঁরা টাকার দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড় ছিলেন, তবু কিন্তু যাঁরা মানবজাতির কল্যাণের জন্যে চিত্তকে উন্মুখ রেখে অশেষ কৃচ্ছ্র সাধন করতেও পশ্চাৎপদ হন নি।

স্টুডেণ্ট্‌স কন্‌ফারেন্স শেষ হবার পর আর একটা বড় রকম কাজ নিয়ে

পড়লাম আমরা। এটা প্রত্যাশাই করছিলাম। জামসেদপুর স্ট্রাইক। এর ইন্ধন আগে থেকেই যুগিয়ে রেখেছিলাম আমরা। গর্কির 'মাদার' যদি প'ড়ে থাক, তা হ'লে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতির ধারা অনেকটা বুঝতে পারবে। ঠিক অমনই ক'রে লুকিয়ে প্যাম্‌ফ্লেট বিলি ক'রে আসতাম, ওই রকম লুকিয়েই মীটিং করতে হ'ত। গালাগালি তো বটেই, মারও খেতে হয়েছে একবার। এই সময়েই ভাল ক'রে পুলিসের নজরে পড়ি। আমাদের চেষ্টা কিন্তু সার্থক হয়েছিল। এক কথায় ১৮০০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘট ক'রে বসল। কিন্তু তারপরই মুশকিল হ'ল—সেই চিরন্তন মুশকিল। ধর্ম্মঘট ভাঙবার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষের প্রাণপণ চেষ্টা তো ছিলই, দেশের অনেক নেতাও চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে এটা না টেকে। টাটা স্বদেশী প্রতিষ্ঠান, তাকে ভাঙবার চেষ্টা তো স্বদেশ-দ্রোহিতার সামিল, এই হ'ল অনেকের ধুয়ো। নিজেদের এবং নিজেদের দলের নানা স্বার্থে জড়িত-বিজড়িত হয়ে তথাকথিত নেতারা কখন যে কোন্ কথা বলেন, তার গোপন ইতিহাস বিবৃত করবার এ স্থান নয়। যদি কোনদিন দেখা হয়, বলব। সে বড় কৌতুকজনক ইতিহাস। আর এই খবরের কাগজের কর্ত্তৃপক্ষেরা! এরা কার কাছ থেকে কত ঘুষ খেয়ে কি যে কখন লিখে বসবে, তার ঠিক নেই। বিজ্ঞাপন পাওয়ার লোভেই এরা জনসাধারণের সর্ব্বনাশ করতে পারে। তা ছাড়া ব্ল্যাকশিপ সবদেশেই থাকে, এদের দলেও ছিল, এবং সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছিল, তাদের চিনতে দেরি হচ্ছিল ব'লে। এরাই শ্রমিকদের অধীর ক'রে তুলছিল নানারকম গুজব আর ভাংচি দিয়ে গোপনে গোপনে। শেষটা এমন হ'ল, সব ভেঙে প'ড়ে বুঝি! সুভাষবাবু এলেন মিটমাট করতে। মিটমাট হ'ল, শ্রমিকদের দিক দিয়ে মোটামুটি ভালই হ'ল, অন্ততপক্ষে মন্দের ভাল বলতে হবে। কিন্তু তাও ভেস্তে গেল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে গিয়ে আবার। এই সময় একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে হতাশ হয়েছিলাম। পরে বম্বে টেক্সটাইল স্ট্রাইকেও এ জিনিসটা লক্ষ্য করেছি। নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে বৃহত্তর স্বার্থকে বলি দিতে অনেকে ইতস্তত করে না।

শ্রমিকদের যতক্ষণ পর্য্যন্ত সৈনিকের মত শিক্ষা না হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের মুক্তি নেই। একতাই প্রত্যেক আন্দোলনের শক্তি। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থের কুঠার যদি তার মূলে আঘাত করে, তা হ'লে কতক্ষণ টিকবে? কিন্তু এর উপায় কি? যুক্তি দিয়ে অশিক্ষিত শ্রমিককে বোঝানো যাবে না, লাঠির গুঁতো কিংবা টাকার গুঁতো ছাড়া অন্য কিছুই তাদের ফেরাতে পারে না। কিন্তু ওই দুই বস্তুই বিপক্ষের হাতে। সুতরাং সে হিসেবে আমরা নিরুপায়। বম্বে টেক্সটাইল স্ট্রাইকে এই সত্যটা আরও মর্ম্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করলাম। মিলওয়ালাদের সঙ্গে গভর্মেণ্টও যোগ দিলেন এবং স্ট্রাইক ভাঙবার জন্যে গুণ্ডা পর্য্যন্ত আমদানি করলেন বাইরে থেকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিলুয়াতে স্ট্রাইক হ'ল, জামসেদপুরের টিন্‌প্লেট কম্পানিতে হ'ল, বজবজে হ'ল, কলকাতার জুট-মিলগুলোতে হ'ল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হ'ল না কিছুই। থেমে গেল সব। কারণ শ্রমিকরা এখনও এদেশে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সচেতন হয় নি। এখনও ভদ্রলোকের বেকার ছেলেরাই আলতো আলতো ভাবে কমিউনিজ্‌ম করছে—লাইফ-ইন্সিওরেন্সের এজেন্সি, বইয়ের-দোকান, মাসিক-পত্রের সম্পাদকি অথবা হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস করতে করতে, এবং তারাও সবাই খাঁটি লোক নয় ব'লে শ্রমিকদেরও খাঁটি ক'রে তুলতে পারছে না।

বম্বে থেকে ফেরবার পথেই আমি ধরা পড়লাম। জেলে ব'সে এখন কমিউনিজ্‌ম নয়, ভাষাতত্ত্ব চর্চ্চা করছি। জেলে ব'সে খবরের কাগজের মারফৎ কিছু কিছু খবর অবশ্য পাই এখনও। মনে হয়, না পেলেই ভাল হ'ত। কারণ যা পাই, তা আশ্বাসজনক নয়। কমিউনিজ্‌ম এখন নাকি কংগ্রেসের অঙ্গীভূত হয়েছে, অর্থাৎ সেই দলের অঙ্গীভূত হয়েছে যাদের মূলমন্ত্র ন্যাশনালিজ্‌ম—কমিউনিজ্‌ম নয়। সাইমন কমিশনের উল্টো পিঠ হুইট্‌লে কমিশনে ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের এন. এম. যোশী আর চমনলাল গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে খুব হৈচৈ করলেন। ডাউন উইথ যোশী, ডাউন উইথ চমনলাল পর্য্যন্ত হয়ে গেল। গভর্মেণ্ট এঁদের মত লোককেই চান, আমরা

তাঁদের বিচারে বে-আইনী। গান্ধী-আরুইন প্যাক্টে মহাত্মাজীর বিচারেও আমরা অস্পৃশ্য। তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যাবার আগে মুসলমানদের সঙ্গে আপোস করতে গিয়ে জিন্নার ফোর্টিন পয়েন্ট্স শুনলেন, কিন্তু আমাদের একটা পয়েন্ট শোনাও দরকার মনে হ'ল না তাঁর। দেশের লোকের কাছেও হয় আমরা হেয়, না হয় অজ্ঞাত। যাদের জন্মে আমরা এত দুঃখ বরণ করেছি, সেই সব দরিদ্র কিষাণ-মজুরেরা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবে, মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে হয়। হয়তো তারাও কিছু ভাবে না, ভাববার অবসরই নেই তাদের। নানাবিধ বোঝার ভারে তাদের পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছে রোজ, তারই যন্ত্রণায় তারা কাতর, আমরা কখন তাদের জন্মে কি একটুখানি করেছি, তা তাদের মনে থাকবার কথা নয়। তার জন্মে দুঃখ নেই, কারণ জনপ্রিয় হওয়া কোনকালেই আমাদের (অন্তত আমার) লক্ষ্য ছিল না। আমার লক্ষ্য আমার আদর্শ। সেই আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে এ খবর যখন পাই, তখনই কেবল বড় কষ্ট হয়। যেদিন খবর পেলাম, মানবেন্দ্র রায় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, সেদিন রাত্রে ঘুম হয় নি আমার। সেই মানবেন্দ্র রায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে নানা কেলেঙ্কারির পর বেরিয়ে গিয়ে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস করলেন। গিরি আর শিবরাও গোল টেবিল বৈঠকে গেলেন। এই গিরিই আবার ফিরে এসে মাদ্রাজে গবেষণামূলক বক্তৃতাও করলেন, ভবিষ্যৎ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে লেবারের স্থান কি হবে! দেশ জুড়ে কেবল গবেষণা, খোশামোদ এবং বক্তৃতা! কমিউনিস্ট নেতারাও কাজ করবেন না। অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি মিস্টার জে. এন. মিত্র এক উদাহরণও দিয়েছেন, রেলের কর্ম্মীরা স্ট্রাইক করবার জন্মে উন্মুখ হয়ে আছে, কিন্তু যমুনাদাস মেটা, গিরি আর যোশীর জন্মে তা নাকি হয় নি। কাশ্মীরে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাটা হয়ে গেল, যেটাকে ব্রিটিশভক্ত মুসলমানেরা কমিউনাল আখ্যা দিলেন, সেটার আসল কারণ যে অর্থ-নৈতিক, এ কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে

বলবার মত কমিউনিস্ট নেতা পাওয়া গেল না। অন্তত খবরের কাগজে কোন আভাস পেলাম না তার। জওহরলালের 'হুইদার ইণ্ডিয়া' প'ড়ে এবং নরিম্যানের মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনা শুনে কিছু তৃপ্তি পেয়েছিলাম, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই মনে হ'ল, এ রকম মুখের বাণী তো ক্রমাগত শুনে আসছি স্থরেন বাঁড়ুজ্জের আমল থেকে। সত্যি সত্যি কিছু কাজ হচ্ছে কি? কাগজে অবশ্য খবরের অভাব নেই। আনসারি আর বিধান রায় এই দুই ডাক্তারে মিলে মৃতপ্রায় কংগ্রেসকে আবার চাঙ্গা ক'রে তোলবার চেষ্টা করলেন। প্রেস্‌ক্রিপশন—কংগ্রেসকে আবার কাউন্সিলে ঢুকতে হবে। স্বয়ং মহাত্মাজী সে প্রস্তাব করলেন পাটনায়—মহাত্মাজী, যিনি সি. আর. দাশের স্বরাজ্য-পার্টির বিরোধিতা করেছিলেন! মহাত্মাজীর এবার নতুন শত্রু জুটেছে—কংগ্রেসে সোশ্যালিস্ট পার্টি। কমিউনিজ্‌মের লেবেল কপালে লাগিয়ে এঁরাও ভোট ক্যান্‌ভাস ক'রে বেড়ালেন এবং কাউন্সিলের অর্দ্ধেক আসন দখল ক'রে বসলেন। কিছুদিন পরেই এল হোয়াইট পেপার এবং সভায় সভায় কাগজে কাগজে তার বাচনিক প্রতিবাদ।...কানপুরে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্ট্রাইক ঘোষণা করলেন—একটু আশান্বিত হলাম। কিন্তু যে স্ট্রাইক দেশব্যাপী হবে ভেবেছিলাম, তা শুরু হতে না হতেই থেমে গেল গভর্মেণ্টের লাঠির চোটে। লাঠি আরও অনেককাল থাকবে, কিন্তু নূতন কর্ম্মী তো কই দেখা যাচ্ছে না আর! যে আদর্শকে লক্ষ্য ক'রে আমরা একদিন অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, যার জন্যে কমিউনিস্ট নেতারা কোন বিপদকেই বিপদ ব'লে গণ্য করেন নি, নবনীর চিঠি পেয়ে মনে হ'ল, সে আদর্শ দেশের ছেলেদের মধ্যে আর নেই। তারা সিনিক হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস টেররিজ্‌ম কমিউনিজ্‌ম কোন কিছুরই ওপর আর আস্থা নেই তাদের। মুখে স্বীকার না করলেও, এখনও সকলেরই আস্থা ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের ওপরেই। তু ক'রে যদি ডাকে, লক্ষ লক্ষ ছেলে ছুটে যাবে চাকরি করবার জন্যে, তা সে যে চাকরিই হোক। নবনী আই. সি. এস. হতে চায়। আই. সি. এস. হয়ে মায়ের দুঃখ ঘোচাবে—এই তার

জীবনের আকাঙ্ক্ষা। তার চিঠি পেয়ে হতাশ হয়ে গেছি আমি। তার ওপর আমার অনেক আশা ছিল। তোমাকে আজ জেল থেকে ব'সে এই চিঠি লিখছি অনেক আশা নিয়ে। যে সাম্যের বাণী আমাদের দেশে বুদ্ধ চৈতন্য প্রচার ক'রে গেছেন, যে সাম্যের প্রেরণা আমাদের ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্মমূলে, যে সাম্য-দৃষ্টিতে আমরা প্রতি জীবে শিব প্রত্যক্ষ করি, সেই সাম্যবাদই একদিন মানুষের মুক্তি আনবে—এই বিশ্বাস নিয়ে অতিশয় অন্ধকার দুর্গম পথে আদর্শের মশাল জেলে একদিন যাত্রা করেছিলাম। এসে পৌঁছেছি জেলে। ছাড়া পাবার আশা নেই। হয়তো জেলেই মরতে হবে। কিন্তু ম'রেও যে শান্তি পাব না, মেজদা, যদি মরবার আগে শুনে না যাই যে, আমাদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার ভার নিয়েছে কেউ। মেকী কমিউনিস্টে দেশ ছেয়ে গেছে, অন্তত একজন খাঁটি লোকও জেলের বাইরে কাজ করছে এ খবরটুকু পেলেও আমার কারাবাস সার্থক হবে। এর জন্যে জন্মজন্মান্তর কারাবাস করতেও রাজি আছি আমি।…কয়েকদিন পরেই দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন হবার কথা। সে উৎসবে আমি থাকতে পারব না ব'লে দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আমার সব দুঃখের অবসান হবে, তুমি যদি রাজি হও। কথাটা একটু ভেবে দেখো। তুমি শক্তিমান লোক, ইচ্ছে করলে সবই করতে পার। ভেবে দেখো, বুঝলে ?

প্রণত

হীরক

সমাপ্ত